কথামৃত — দ্বাদশ পর্ব

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on SriSriRamkrishnakathamrita
before the students of RKMVERI - Deemed University, Belur Math
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িমধ্যে

প্রথম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে ফলহারিণী-পূজাদিবসে ভক্তসঙ্গে

আজ ফলহারিণী কালীপূজা, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আছেন, ৪ঠা জুন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ (পৃঃ ১৯৬)। **মাস্টার পূর্বদিন রবিবার আসিয়াছেন। ওই রাত্রে কাত্যায়নীপূজা। ঠাকুর প্রেমাবিষ্ট হইয়া নাটমন্দিরে মার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "মা, তুমিই ব্রজের কাত্যায়নী"**।

মাস্টারমশাই শুরুতেই বলছেন, আজ জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা চতুর্দশী। সাবিত্রী চতুর্দশী। আবার অমাবস্যা ও ফলহারিণী-পূজা। অনেকগুলো কারণে আজ বিশেষ দিন। যাঁরা অনেকদিন আমাদের এই ক্লাশগুলো শুনছেন, আপনারা যাঁরা হিন্দু ধর্মের মর্ম কিছু কিছু বুঝতে শুরু করেছেন, তাঁরা এটা জানবেন যে, যাঁরা বলেন হিন্দুদের অনেক দেবদেবী, তাঁদের পক্ষে এটা ধারণা করা খুব মুশকিল যে –হিন্দুরা শুধু অনন্তের পূজা করেন। এমনকি যখন হিন্দুরা শিব আর শক্তির পূজা করছেন, সেখানেও শিব আর শক্তিকে অনন্তেরই একটা রূপে পূজা করছেন। 'ভারতে বিবেকানন্দ' বইতে সেখানে বিভিন্ন লেকচারে স্বামীজী এটাই বলছেন, হিন্দুরা জানে যিনি অনন্ত, সেই অনন্ত এক-একটি মনের সামনে এক-এক ভাবে আসেন। যারা কাঁচা মনের, বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের বাইরে যারা, তারা মনে করে এনারা আলাদা। আমরা ইমোশানালি এই জিনিসটাকে মানি যে, সব এক। একটা জিনিসকে ইমোশানালি নেওয়া এক রকম, ওটাকে বুদ্ধি দিয়ে বোঝা আর-এক রকম। আর ওটাকে ঠিক ঠিক বোধ, যেটা ঈশ্বরেই বোধ করান, ওটাকে প্রত্যক্ষ করা একেবারে আলাদা জিনিস। ঠাকুর বারবার প্রত্যক্ষ করার কথা বলছেন।

কথামৃতে আমরা ঠাকুরের তিন ধরণের কথা পাই। একটা হল, যে কথাগুলো ঠাকুর নিজের অনুভূতি থেকে বলছেন। দ্বিতীয়, সাধু-সন্ন্যাসীরা যাঁরা দক্ষিণেশ্বরে আসতেন, তাঁদের থেকে ঠাকুর অনেক কথা শুনতেন। ঠাকুর যখন সাধু-সন্ন্যাসীদের থেকে শোনা ওই কথাগুলো বলছেন, তখন বুঝতে হবে যে তিনি ওই কথাতে নিজের শিলমোহর দিয়ে দিচ্ছেন –তার মানে এই কথাগুলো সত্য। তৃতীয় হল – জাগতিক যে কথাগুলো তিনি গ্রামে শুনেছিলেন বা দক্ষিণেশ্বরে থাকতে শুনেছিলেন, সেই কথাগুলোকেও তিনি কখন কখন বিভিন্ন ভাবে বলতেন, এটাকে বলে stamp of approval। ঠাকুর বলছেন, এখান থেকে সমস্ত চেক পাশ করিয়ে নিতে হয়। ঠাকুরের মুখ থেকে যখন যে কথাই বেরিয়েছে –তখন বুঝতে হবে যে, এই কথা সত্য।

কিন্তু এই সত্যের আবার তিনটে স্তর রয়েছে। প্রথমটা হল প্রত্যক্ষ। যেমন ঠাকুর নাটমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, **"মা, তুমিই ব্রজের কাত্যায়নী"**, এই হল প্রত্যক্ষ; মা কালীর সামনে বলছেন। দেখা যায়, সর্বধর্ম সমন্বয় জিনিসটাকে বোঝাতে গিয়ে অনেকেই চেষ্টা করেন শাক্ত, বৈষ্ণবদের মধ্যে যে পুরনো ঝগড়া বিবাদ, এই বিবাদ মেটানোটাই যেন ঠাকুরের সর্বধর্ম সমন্বয়। ঠাকুরের ওসব ভাব নেই, তিনি প্রত্যক্ষ করছেন –আমি জেনেছি। আজকের দিনে এগুলোর এত বেশি দাম নেই ঠিকই, কারণ বিশেষ করে যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত তাঁরা ছোট বয়স থেকেই এই জিনিসটাকে বোধ করে রেখেছেন। কিন্তু তখনকার দিনে এই জিনিসগুলিকে বুঝে নেওয়া কঠিন ছিল। শুধু ব্রজের কাত্যায়নী না, যেখানে ঠাকুরের প্রেমোন্মাদ, রূপদর্শনাদির বর্ণনা আছে, সেখানে দেখবেন, বেদের যে মন্ত্র, *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি*, হে প্রভু তুমিই সেই নারী, তুমিই সেই পুরুষ হয়েছ, তুমিই সব কিছু হয়েছ, এসব বলছেন।

ঠাকুর গান করছেন –**তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্য মা, তুমি সে পাতাল**। মাস্টারমশাই বলছেন, **ঠাকুর গান করিতেছেন ও মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। প্রেমে একেবারে মাতোয়ারা। নিজের ঘরে আসিয়া চৌকির উপর বসিলেন**।

এগুলো আমাদের পক্ষে ধারণা করা মুশকিল, কারণ আমরা এখনও ওই স্তরে যেতে পারিনি। খুব হলে এই জিনিসগুলোকে ইমোশানালি চিন্তা-ভাবনা করি, ইমোশানাল জিনিসগুলো একটু এলেমেলো হবেই। ভাগ্যিস স্বামীজী আর সারদানন্দজী মহারাজ কাঠামোটা এমন বানিয়ে দিয়ে গেলেন যে, যেখানে এগুলোর নকল আদি করার কোন প্রশ্রয় দিলেন না। এগুলোর প্রশ্রয় যদি দিয়ে থাকতেন, তাহলে রামকৃষ্ণ মিশনেও বৈষ্ণবদের মত খোল-করতাল নিয়ে নাচগান হত, সেখান থেকে ডিজেনারেট হয়ে হয়ে নানা রকমের ঢংঢাং হতে শুরু হত। এমনিতেই আমরা চারিদিকে যা শুনি, এত লোকের দর্শন হচ্ছে, কাউকে মা এসে কথা বলে যাচ্ছেন, কাউকে ঠাকুর এসে কিসব বলছেন, কাউকে শিব এসে বলে যাচ্ছেন, শুনে শুনে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে যায়। ভাগ্যিস আমাদের এসব কিছু হয় না। মহারাজদের যে হয় না তা না, হয়েছে; যাদের হয় তাদের মানসিক ডাক্তারদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কারণ যিনি দর্শন দেন, তিনি সেই দর্শনটা যাতে অপরকে না বলেন, সেই ক্ষমতাটাও তাঁকে তিনি দিয়ে দেন। এগুলো এত উচ্চমানের জিনিস যে, আমরা সত্যিই ভাগ্যবান, রামকৃষ্ণ মিশন এসে পুরো জিনিসটাকে এমন সুন্দর করে গুছিয়ে রেখে দিলেন যে, ঢংঢাং দেখাবার কোন সুযোগই নেই। কারণ আমাদের এখানে ঋষি ভাব, শান্ত ভাব।

রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত ওই রাত্রে মার নাম হয়েছে। পরের দিন ভোর হয়েছে। **সোমবার সকালে বলরাম এবং আরও কয়েকটি ভক্ত আসিলেন। ফলহারিণী-পূজা উপলক্ষে ত্রৈলোক্য প্রভৃতি বাগানের বাবুরা সপরিবারে আসিয়াছেন**। ত্রৈলোক্য মথুরনাথ বিশ্বাসের পুত্র। মথুরনাথের শরীর চলে যাওয়ার পর ত্রৈলোক্য আজীবন কর্তা ছিলেন। এটা খুবই আশ্চর্য লাগে যে, ঠাকুরের প্রতি ওনার পিতৃদেবের যে পরিমাণ ভক্তি ছিল, সেই ভক্তির ছিটেফোটাও ছিল না, আদপেই ছিল না। আমরা এখানেই দেখব, কিভাবে ঠাকুর মথুরবাবুর মেয়েকে তার জামাইয়ের কাছে শোওয়াতে নিয়ে যাচ্ছেন। ঠাকুর মথুরবাবুর পাশে শুতেন। যে পরিবারের ঠাকুরের সঙ্গে এত অন্তরঙ্গ ব্যবহার, যে ঠাকুর ভাবের ঘোরে রানী রাসমণিকে চড় মেরেছিলেন, যে ঠাকুরকে রানী রাসমণি, মথুরবাবুরা সবাই এত ভালবাসতেন, কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের সময় থেকে সেই সম্পর্কটা কেমন যেন আলগা হয়ে গেল।

বেলা নয়টা। ঠাকুর সহাস্যবদন –গঙ্গার উপর গোল বারান্দাটিতে বসিয়া আছেন। কাছে মাস্টার। ক্রীড়াচ্ছলে ঠাকুর রাখালের মাথাটি কোলে লইয়াছেন। রাখাল শুইয়া। ঠাকুর কয়েকদিন রাখালকে সাক্ষাৎ গোপাল দেখিতেছেন।

ত্রৈলোক্য সম্মুখ দিয়া মা-কালীকে দর্শন করিতে যাইতেছেন। সঙ্গে অনুচর ছাতি ধরিয়া যাইতেছে। ঠাকুর রাখালকে বললেন, 'ওরে, ওঠ্ ওঠ্'।

আজকাল আমরা এই জিনিসগুলি অতটা বুঝতেও পারব না। ত্রৈলোক্য তখনকার দিনের জমিদার, ঠাকুর তাদের একজন বেতনভোগী পূজারী। এই ত্রৈলোক্যের ঠাকুরমা, বাবা, মা ঠাকুরকে অত ভক্তি ও সম্মান করতেন। কিন্তু ঠাকুর জানেন, যাকে যেমন তাকে তেমন মান দিতে হয়। ত্রৈলোক্য ঠাকুরের থেকে বয়সে কত ছোট, কিন্তু সম্মান দিচ্ছেন, রাখালকে শোওয়া অবস্থা থেকে উঠে বসতে বললেন। ঠাকুর তখন ত্রৈলোক্যকে বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্যের প্রতি) –হ্যাঁগা, কাল যাত্রা হয় নাই? ফলহারিণী-পূজা উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যাত্রা হত, কিন্তু এবার হয় নাই।

ত্রৈলোক্য –হাঁ, যাত্রার তেমন সুবিধা হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ –তা এইবার যা হয়েছে। দেখো যেন অন্যবার এরূপ না হয়! যেমন নিয়ম আছে, সেইরকমই বরাবর হওয়া ভাল।

এখানে দুটো খুব জরুরী কথা আছে। প্রথম কথা হল, অন্যান্য ধর্মের মত হিন্দু ধর্ম গ্রন্থনির্ভর ধর্ম নয়, আমাদের ধর্ম পরম্পরার ধর্ম। এগুলোকে নিয়ে খ্রীশ্চান, ইসলাম ধর্মের লোকেরা, ইংরাজী পড়া লোকেরা আক্রমণ করে, যদিও কোন দিন এই জিনিসগুলোকে নিয়ে তারা বোঝার চেষ্টা করে না। ইসলামে বলে আল-কিতাব, বইতে যা আছে তার বাইরে যাওয়া যাবে না। কিন্তু আমরা হিন্দুরা ও-রকম নই, আমরা হলাম পরম্পরা। আমরা ঋষি-পরম্পরায় চলে আসছি। কোন ঋষি এসে একটা জিনিসকে পাল্টে দিলেন, ব্যস্, ওটা পাল্টে গেল। ঠাকুর, স্বামীজী আসার পর বর্তমান যুগে অনেক কিছু পাল্টে গেছে। আগে হিন্দুরা পেঁয়াজ খেত না, ডিম খেত না, যদিও সবাই খায় না, কিন্তু বেশির ভাগ হিন্দুরা এখন ডিম, পেঁয়াজ খাচ্ছেন। তবে বাংলায় এখনও অনেক জায়গা আছে যেখানে লোকেরা ডিম, পেঁয়াজ এগুলো স্পর্শ পর্যন্ত করবে না। কিন্তু বক্তব্য হল আগের থেকে সমাজ অনেক পাল্টে গেছে।

আমরা হলাম পুরোপুরি পরম্পরা ধর্মের। কোন ঋষি, মহাপুরুষ এসে পাল্টে দেন, পাল্টে গেল; তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু যেগুলো চিরন্তন ধর্ম, শাশ্বত ধর্ম, যে ধর্ম আমরা উপনিষদে পাই, সেটা কখন পাল্টায় না। আবার যদি বলেন, আমরা গ্রন্থের ধর্ম পালন করি না, তাও না। উপনিষদে যেটা আছে, যেটা চিরন্তন সত্য, সেটাকে আমরা সব সময় মেনে চলছি। তার সাথে পরম্পরাকে ভাঙা যাবে না, এটা গেল একটা। কিন্তু তার থেকেও যেটা জরুরী, আমার যেটা মনে হয় –ঠাকুর কালী মন্দিরে ছিলেন, রানী রাসমণি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। রানী রাসমণির ভিতর অনেক কিছুর ভাব ছিল, মা এখানে বিরাজিতা হয় সেবাপূজা গ্রহণ করবেন, অনেক সাধুসেবা হবে। এখন রানী রাসমণির নাতিরা মালিক হয়েছে, এখনও সেভাবে দায়ীত্বশীলতার বোধ আসেনি, ফলে ওসব ব্যাপারে এখনও তারা সজাগ নয়। ঠাকুর তাই যতদিন আছেন, ততদিন ওদের মনে করিয়ে সজাগ করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

বেলুড় মঠেও আমরা সিনিয়রদের মধ্যে এই চেষ্টার ভাব লক্ষ্য করেছি। প্রভু মহারাজ, পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীকেও বলতে দেখা গেছে, আমি যতদিন আছি, ততদিন এভাবে করে যেও। তবে সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছু ধরে রাখা যায় না, বলে পাল্টাতে হয়। তবে যাঁরা পুরনো দিনের মহারাজ, কোন কোন বিশেষ কারণে ওই ভাবে পুরো ডুবে গিয়ে পাল্টাতে চান না। তাতে খারাপ কিছু হয় না, কারণ পরম্পরাটা বজায় থাকছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার সময়ের একটা ধাক্কা আসে। অন্যান্য ধর্ম পাথরের মত, ওরা কোন ভাবেই পাল্টাবে না। দু'শ-আড়াই'শ বছর আগে কি হয়েছিল, সেটাকে এখনও ধরে আছে। হিন্দুরা সে-রকম না, আবার রোজ রোজ সব কিছু পাল্টে যাচ্ছে তাও না। ঠাকুর এখানে নিয়মটাকে ধরে রাখতে বলছেন –যেমন নিয়ম আছে, সেইরকমই বরাবর হওয়া ভাল।

বেলুড় মঠে আমাদের মহারাজরা খুব মজা করে বলেন, ট্রাডিশন; ট্র্যাডিশনকে বাংলার মত উচ্চারণ করে বলবেন, বুঝলে ভাই ট্রাডিশনটা ঠিক রাখতে হবে; বলতে চাইছেন পরম্পরাতে যেন হাত না দেওয়া হয়। তা নাহলে কি হয়, সব কিছুকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করে দেবে। গত বছর যেমনটি হয়েছিল, এই বছরেও তেমনটা হওয়া চাই। আমাদের প্রত্যেক সেন্টারে আর বেলুড় মঠেও বিভিন্ন খাতা থাকে। কোন উৎসব এলে খাতা খুলে দেখা হবে গত বছরর এই উৎসবে কি কি রান্না হয়েছিল। আপনারা গিয়ে খাতা দেখুন, দেখবেন বছরের পর বছর ওটাই চলছে। হঠাৎ কেউ এসে একটু হয়ত পাল্টে দিলেন, তাতে হৈচৈ হবে ঠিকই, কিন্তু নূতন যেটা ঢুকে গেল, সেটাই এবার চলতে থাকবে।

ত্রৈলোক্য যথোচিত উত্তর দিয়া চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিষ্ণুঘরের পুরোহিত শ্রীযুক্ত রাম চাটুজ্যে আসিলেন। ত্রৈলোক্যকে ওই কথা বলার পর ঠাকুরের আবার দুশ্চিন্তা হল, রাম চাটুজ্যেকে ঠাকুর নিজের দুশ্চিন্তার কথা বলছেন।

ঠাকুর –রাম! ত্রৈলোক্যকে বললুম যাত্রা হয় নাই, দেখো যেন এরূপ আর না হয়। তা এ-কথাটা বলা কি ভাল হয়েছে?

এগুলোই ঠাকুরের পার্সোনালিটি। ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব তিনটে স্তরে চলত –বাহ্যদশা, অর্দ্ধবাহ্যদশা ও অন্তর্দশা। অন্তর্দশাতে তিনি সমাধিস্থ। অর্দ্ধবাহ্যদশায় তিনি মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন, নৃত্য করছেন, গান করছেন। আর বাহ্যদশায় তিনি ভক্তদের সঙ্গে কথা বলছেন কিংবা সংসারে চলতে গেলে যতটুকু কথাবার্তা চালাতে হয় ততটুকু চালাচ্ছেন। আমাদের যেমন বাহ্যদশাটাই মূল, অর্দ্ধবাহ্যদশা হয় না আর অন্তর্দশার তো প্রশ্নই নেই। কিন্তু ঠাকুরের মত যাঁরা হন, সত্যিকারের অত্যন্ত উচ্চমানের যাঁরা সাধক; ঠাকুর অবতার কিন্তু এখানে ব্যাখ্যা করার সুবিধার্থে আমরা সাধক হিসাবে দেখছি; তাঁদের যেটা বাহ্যদশা সেটা পুরোপুরি রঙ ধরে থাকে অন্তর্দশা থেকে। যোগের চিত্তবৃত্তি নিরোধের দৃষ্টিতে যদি দেখেন, অন্তর্দশাতে মনের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা শূন্য হয়ে গেছে। তার মানে মন ওখানে পুরো সহজ অবস্থায় চলে গেছে। ফলে কি হয়, যাঁরা ঈশ্বরের ভাবে থাকেন, তাঁদের আচার ব্যবহার শিশুর মত সহজ সরল হয়ে যায়। অন্য দিকে যারা সংসারী মানুষ, বিষয়ী যারা, এদের মাথায় এত প্যাঁচ যে পেরেক ঢুকিয়ে দিলে স্ক্রু হয়ে বেরিয়ে আসবে। আমাদের সাধু-সন্ন্যাসীদের দেখছি, ওনাদের মাথায় প্যাঁচপুঁচ কিছু থাকে না, একেবারে পরিষ্কার। অত হিসাব করে কথা বলতে পারেন না। অত হিসেব করে যদি কথা বলতে পারতেন, তাহলে তিনি সন্ন্যাসী না হয়ে সংসারেই থাকতেন। স্বামীজী একেবারেই পারতেন না, ঠাকুরের তো প্রশ্নই নেই। কিন্তু অন্য দিকে জানা আছে যে, মালিককে এরকম কথা বলতে নেই। হিন্দিতে খুব নামকরা কথা আছে – মালিক কা আগারি ঘোড়া কা পিছারি নেই চলনা চাহিয়ে। মালিকের সামনে সামনে যাবে না, আর ঘোড়ার পিছন পিছন যাবে না; ঘোড়া এমন লাথি মারবে যে হাড়গোর ভেঙে দেবে। আর মালিকের চোখের সামনে পড়ে গেলে শেষ করে দেবে।

রাম চাটুজ্যে –মহাশয়, তা আর কি হয়েছে! বেশই বলেছেন। যেমন নিয়ম আছে, সেইরকমই তো বরাবর হওয়া উচিত। কিন্তু ত্রৈলোক্য কিছুতেই এগুলো পছন্দ করতেন না। আপনারা পড়ে থাকবেন, একটা ব্যাপারে অশান্তি হওয়াতে হৃদয়কে যখন চলে যেতে হচ্ছিল, তখন ত্রৈলোক্যকে কেউ বলেছিলেন যে ঠাকুরও তো বলেছিলেন। তখন ত্রৈলোক্য বলছেন, ঠিক আছে, উনি যদি বলে থাকেন তাহলে ওনাকেও চলে যেতে হবে। ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে যেতে বলছেন; কত কঠোর ভাষা ভাবা যায়!

এদিকে আবার বলরামকে বলছেন –**ওগো আজ তুমি এখানে খেও**। আহারের একটু আগে ঠাকুর নিজের অবস্থা নিয়ে ভক্তদের অনেক কথা বলছেন। সেখানে রাখাল, বলরাম, মাস্টার, রামলাল এবং আরও দু-একটি ভক্ত বসে আছেন। ঠাকুর প্রথমে নরেনাদিকে নিয়ে বলছেন। ঠাকুরের কাছে এই যে নরেন, রাখালাদির মত ছোকড়া ভক্তদের আনাগোনা আর ঠাকুরের যে তাঁদের প্রতি এত ভালবাসা, এটাকে হাজরা প্রভৃতি অনেকে পছন্দ করতেন না। ভাব এই যে, আমাদের নিজেদের বংশের লোকেরা সবাই থাকতে এদের দিকে যাওয়া কেন।

অনেক আগে আমরা বিস্তারে Mystery of three ‘H’ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম; হাজরা, হৃদয়রাম ও হলধারী, তিনটে ‘হ’। শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, এই তিনজনই ওনার সম্বন্ধী। হাজরা জপ করতেন, হলধারী শাস্ত্রে পণ্ডিত আর হৃদয়রাম ঠাকুরের সেবা করতেন। কিন্তু ঠাকুর তিনজনের প্রতিই বিরূপ হয়ে গিয়েছিলেন। হাজরাকে দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে যেতে হল, হৃদয়রামকে তো বহিষ্কার করে দেওয়া হল। হলধারীকে যেতে হয়নি, কিন্তু কথামৃতের জন্যই যতটুকু নাম থাকার ততটুকু আছে। অন্য দিকে নরেন, রাখাল, লাটু কেউই ব্রাহ্মণ নন, অথচ আজকে তাঁদের পূজা হচ্ছে। কেন এমন হল? এটাই

অবতারতত্ত্ব। তার মানে একটা যে ধারণা ব্রাহ্মণদের বিশেষ অধিকার, সেটারও এখানে প্রয়োজন নেই। তার থেকে বেশি ত্রৈলোক্যনাথ, সেও অবশ্য ব্রাহ্মণ না, কেন এমন হল? এটাই ঠাকুর এখানে বলছেন – শুদ্ধ আধারে স্পষ্ট প্রকাশ। শুদ্ধ আধারে ভগবানের স্পষ্ট প্রকাশ –এটারই এখন ব্যাখ্যা চলবে।

এখানে যে যে জাতির সে সেই জাতির জিনিস খোঁজে। আরব্য রজনীতে একটা কাহিনী আছে, যেখানে জিন একটা মেয়েকে ধরে রেখেছে, মেয়েটি আবার পুরুষ জাতির লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছে। রাবণ সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গেল, সীতা রাবণকে বলছেন –আপনি রাক্ষস জাতির আর আমি মানবজাতির, আমাদের মধ্যে সম্পর্ক হতে পারেনা। একটা কাহিনীতে আছে, মা লক্ষ্মী তাঁর বাহন পেঁচাকে একটা মুক্তার হার দিয়ে বলে দিলেন, তুমি এই মুক্তার হার বিশ্বের কোন সুন্দরীর গলায় পরিয়ে দিয়ে এসো। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে পেঁচা কোন সুন্দরী খুঁজে পেল না। হঠাৎ তার নজরে পড়ল গাছের ফোঁকরে একটা পেঁচী বসে আছে, ওকেই তার সবচেয়ে সুন্দরী মনে হল, হারটা তার গলায় পরিয়ে দিল।

অর্থটা হল, সবাই নিজের জাতি খোঁজে। ঠাকুরও নিজের জাতি খুঁজছেন। এই জাতিটা তিনি খুঁজে পাচ্ছেন নরেন, রাখাল, লাটুর মধ্যে। আপনার সঙ্গে যদি কেউ বন্ধুত্ব করে, আর বন্ধুত্বটা যদি টিকে যায়, টেকাটাই জরুরী। বেদান্তে বলে, দুটো অমিল জিনিসের মধ্যে যদি কোন ভাবে কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয়, ওই সম্পর্ক কখনই টিকে থাকতে পারবে না। কিছু একটা সমান থাকতে হবে, সমানতা না হলে মিলন হবে না। দক্ষিণ ভারতে আমি বেশি ছিলাম না, তাই বলতে পারব না, কিন্তু উত্তর ভারতে এই জিনিসটা খুব আছে। অমুকের অমুক, সেই অমুকের তমুক, তার মানে অমুকের দাদার বৌমার পিসতুতু বোনের ননদের দেওরের অমুক এই করে করে একটা সম্পর্ক দাঁড় করিয়ে দেবে। এগুলো বিহার, ইউপি, পাঞ্জাব, হরিয়ানাতে সাংঘাতিক রয়েছে, কোন না কোন ভাবে একটা সম্পর্ক দাঁড় করিয়ে দেবে। পেঁচা পেঁচিতে সমান জাতি দেখছে। মানবী জিনের মধ্যে সমানতা পাচ্ছে না, সেটা পাচ্ছে মানব জাতির মধ্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণের একটাই জাতি –ঈশ্বরের ভক্ত, এছাড়া আর কিছু না। আপনারাও দেখবেন, আপনারা যাদের সঙ্গে অনেকদিন মিলেমিশে আছেন, কোথাও একটা সমানতা আছে। নিজে বিচার করে দেখতে হয়, এই সমান ভাবটা কোন জায়গাতে। বিচার করে দেখতে হয় আমরা কোন জায়গাতে গিয়ে সমান দেখছি। যার জন্য ছেলে আর মেয়ে যখন প্রেম করতে যায় তখন বলবে, আমাদের মধ্যে অনেক কিছুতে মিল আছে তাই না; আর যখন ফাটল ধরে তখন বলবে, আমাদের মধ্যে কোথাও কোন মিল নেই, কি করে যে তোমার সাথে প্রেম হল ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি। এই জিনিসটাকে নিয়েই ঠাকুর এখন বলছেন, কোথায় সমান।

শ্রীরামকৃষ্ণ –হাজরা আবার শিক্ষা দেয়, তুমি কেন ছোকরাদের জন্য অত ভাব? কারণ হাজরা মনে করতেন, আমরাই তো আছি, আমরা তোমার বংশের লোক, আমরা তোমার সঙ্গে থাকছি।

গাড়ি করে বলরামের বাড়ি যাচ্ছি, এমন সময় পথে মহা ভাবনা হল। ঠাকুর যিনি অবতার, যিনি অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর ভাবনা হতে শুরু হল **–'মা, হাজরা বলে, নরেন্দ্র আর সব ছোকরাদের জন্য আমি অত ভাবি কেন, সে বলে, ঈশ্বরচিন্তা ছেড়ে এ-সব ছোকরাদের জন্য কিন্তা করছ কেন'?**

এই যে অন্তর্দশা, অর্দ্ধবাহ্যদশা আর বাহ্যদশার কথা বলা হল, আপনারা যাঁরা বেদান্তচর্চা করেন তাঁরা একটু এটাকে ভেবে দেখবেন। ঠাকুর মায়ের মুর্হুমুর্হু দর্শন পাচ্ছেন, অদ্বৈত সাধনা করেছেন, অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি অবতার। কিন্তু তিনি যখন বাহ্য অবস্থায় থাকছেন, অর্থাৎ যখন সংসারে আছেন তখন সংসারীর মত আছেন। আসল রহস্য এটা। বেদান্তে খুব সহজ, অহং ব্রহ্মস্মি বলে দিয়ে খালাস হয়ে বেরিয়ে চলে গেল, এখানে তা না। জিনিসটা অত সহজ না। যার জন্য বেদান্ত যে বলে অহং ব্রহ্মাস্মি, এটা শুধু একটি অংশ। পুরো ছবি যদি পেতে হয়, তাহলে শঙ্করাচার্য গীতায় যেভাবে বর্ণনা

করছেন, শ্রীকৃষ্ণকে শুধু ভাগবতে না, মহাভারতে আমরা যেভাবে পাই, বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের যেভাবে বর্ণনা আছে আর ঠাকুরের যে বর্ণনা আছে, এটা না নিলে অদ্বৈত ঠিক ধারণা হয় না। প্রচলিত যে অদ্বৈত আমরা দেখি, এটা অত্যন্ত সীমিত এবং ক্ষতিকর।

এগুলোকে যদি লীলা মনে করেন, নাটক মনে করে পার করে দেন, তাহলে আর শাস্ত্র পড়া কেন? এগুলোকে যদি সত্য বলে না বোধ হয় তাহলে শাস্ত্র পড়া কেন? বেদান্তের দিক থেকে এগুলো কি মিথ্যা? একেবারেই মিথ্যা না, বেদান্তের দিক থেকেও সত্য। বেদান্ত মানেই হয়, আত্মা যখন মনের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে রেখেছে। এই জুড়ে রাখাটা বাস্তবিক কখনই হয় না, আপনার ক্ষেত্রে বাস্তবিক না, আমার ক্ষেত্রেও বাস্তবিক হয় না। কিন্তু আমি জানি না যে, এটা অবাস্তবিক। ঠাকুর জানেন এটা অবাস্তবিক। কিন্তু জোড় থাকতেই হবে। আত্মার যদি মনের সঙ্গে যোগ না হয় সংসার হবে না। ঠাকুর জানেন এখানে আত্মার মনের সঙ্গে যোগ রয়েছে, উনি যখন খুশি আত্মাকে সরিয়ে নিতে পারছেন। আমরা সরাতে পারছি না, দুটো ক্ষেত্রে এই জিনিসটা অস্বাভাবিক। কারণ আত্মার যে স্বভাব, মনের স্বভাব তার বিপরীত, এই দুটোর কখন মিলন হতে পারে না। পেঁচা-পেঁচী, মানবী-মানব যেটা বলা হল, এখানে আত্মা আর মন জাতিতে সমান নয়। তার মানে, এই যে জুড়ে যাচ্ছে, এটা অস্বাভাবিক, এটা কৃত্রিম। আত্মজ্ঞানী এটা জানেন, আমরা অজ্ঞানী আমরা তাই জানিনা। কিন্তু দুটো ক্ষেত্রেই কৃত্রিম। উনি জানেন বলে সরিয়ে নিতে পারেন, আমরা জানিনা বলে সরাতে পারিনা।

আমাদের দুঃখ-কষ্ট কেন? আমরা আত্মাকে মন থেকে সরাতে পারছি না। ওনাদের দুঃখ-কষ্ট নেই কেন? ওনারা চাইলেই সরিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু যতক্ষণ জুড়ে আছে, কৃত্রিম হোক, সত্যি হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ তা-নাহলে সংসার চলবে না, যদি আত্মা মনের সঙ্গে জুড়ে না থাকে। মন আত্মারই একটা বিশেষ অবস্থা। সে অবস্থাটা মিথ্যা, তাতে কিছু আসে যায় না। এই সম্পর্কটাও মিথ্যা, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু মনের সঙ্গে যতক্ষণ না জুড়ছে ততক্ষণ সংসার চলবে না। ঠাকুর যতক্ষণ সংসারে আছেন, শ্রীকৃষ্ণ যতক্ষণ সংসারে আছেন, ততক্ষণ এগুলো সত্য। সত্য কোন অর্থে? এই যে আত্মার যোগ মনের সঙ্গে, এটা কৃত্রিম, কিন্তু কাজ চলছে।

ফিজিক্সে কিছু জিনিস আছে যেগুলো উদাহরণ রূপে নিলে আমাদের বুঝতে অনেক সুবিধা হয়। ট্রান্সফরমার সব জায়গায় থাকে, টেলিভিশনেও থাকে। ট্রান্সফরমার ইলেক্ট্রিসিটির ভোল্টেজ বাড়ায়, ভোল্টেজ কমায়। ট্রান্সফরমারের একদিকে বিশেষ ভাবে তার লাগানো থাকে, আর অন্য দিকে অন্য ভাবে তারা লাগানো থাকে –step up step down। মাইথন থেকে যে ইলেক্ট্রিসিটি ট্রান্সফরমারে আসছে, কখন তাকে step up করতে হয়, কখন step down করতে হয়। এক-একটা ট্রান্সফরমারে এগারো হাজার বা তেত্রিশ হাজার ভোল্ট থাকে। ওই ভোল্টকে নামিয়ে নিয়ে আসছে ৪৪০ ভোল্টে, সেখান থেকে নামিয়ে ২২০ ভোল্টে নিয়ে আসছে। এই ২২০ ভোল্টকে কখন ১১০০০ ভোল্টে নিয়ে যাচ্ছে, বা এগারো হাজার থেকে ২২০ ভোল্টে নামিয়ে আসছে। সেখানে তার থেকে তারে দেওয়া হয়, কিন্তু অন্য দিকের তারের সাথে অন্য দিকের তারের কোন সংযোগ থাকে না। এদিককার তার ওখানে একটা এনার্জির ফিল্ড তৈরী করে আর ওই দিককার তার সেটাকে ধরে নেয়।

আত্মা আর মন অনেকটা এই রকম। দুদিকের তারের মত আত্মার আর মনে সরাসরি কোন যোগাযোগ নেই। কিন্তু আত্মা থাকার জন্য মন নিজে থেকেই ধরে নেয়। আসল কারেন্ট আসছে মাইথন থেকে। আমাদের ঘরে যে কারেন্ট আসছে, মাইথন থেকে আসল যে কারেন্ট পাঠানো হয়েছে, সেটা কিন্তু আসছে না। ট্রান্সফরমারের ক্রিয়াকলাপ যাঁরা জানেন, তাঁরা এই জিনিসটা বুঝতে পারবেন। সেইজন্য ঠাকুর যখন নরেন, রাখালের জন্য চিন্তা করছেন, আর এই ঘটনা একবার না, অনেকবার হয়েছে; আর-একবার ঠাকুর বলছেন, এই নাও আমি নরেন রাখালের উপর থেকে মন সরিয়ে নিচ্ছি, বলেই সাথে সাথে তিনি সমাধিস্থ, তাঁর চুল দাঁড়ি, লোম সব দাঁড়িয়ে গেল।

এই কথা বলতে বলতে দেখালে যে, তিনিই মানুষ হয়েছেন, শুদ্ধ আধারে তিনি স্পষ্ট প্রকাশ হন। সূর্যের আলো সমস্ত কিছুতে পড়ছে, কাঠ পাথর সব জায়গায় সূর্যের আলো পড়ে। কিন্তু প্রতিবিম্বিত সবচেয়ে ভাল হয় আয়নাতে। ঠাকুর এই উপমাটা অনেকবার বিভিন্ন ভাবে দিয়েছেন। আমার আপনার সবার মন, প্রত্যেকটি মন হল reflecting surface। যেখানে সব সময় সূর্যের আলোর মত আত্মার আলো প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। ঠাকুর নিজের জাতি খুঁজছেন। যেখানে ঈশ্বরের প্রকাশ, ঈশ্বরের প্রকাশ তো সব কিছুতেই; এখানে বলছেন তিনিই মানুষ হয়েছেন; কেননা ঈশ্বর বই কিছু নেই কিনা। জ্ঞানপথে সাধক দেখেন, আত্মাই আছেন, নাম-রূপ সব মিথ্যা। ভক্তিপথের সাধক দেখেন ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। তবে প্রকাশ নেই।

আমরা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে যাই, আম বাগানের সবটাই আম; ছোট আম, বড় আম, কাঁচা আম, পাকা আম; সবটাই আম। আম যখন পাকে তখন আম পারা হয়, কাঁচা আম সাধারণ ভাবে পারা হয় না, কাঁচা আছে বলে পারে না। সবটাই তো আম, আমগাছও আম, ছোট আম, বড় আম, কাঁচা আম, পাকা আম সবটাই আম। নরেন রাখাল হলেন আম, যে আমটা পেকে গেছে, পাকা আম আর শুদ্ধ আধার একই জিনিস; যে উদাহরণে আপনার স্পষ্ট হয়। এগুলো ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়, আমি আপনি সবাই সেই ঈশ্বর, ঠাকুর নিজে বলছেন –তিনিই মানুষ হয়েছেন। এটা অদ্বৈতের কথা নয়, ভক্তির কথাই বলছেন –ঈশ্বরই সব হয়েছেন। এটা নামরূপের ব্যাখ্যা না। সব যেন মোমের পুতুল, মোমই সব কিছু হয়েছে। পুতুল রূপে সব পুতুলে তফাৎ আছে। এখানে মানুষ রূপে কি তফাৎ? –শুদ্ধ আধার। শুদ্ধ আধার মানে, যার মন থেকে স্বার্থ ভাব যত চলে গেছে, যার মনে চিত্তবৃত্তির যত অভাব, সে তত শুদ্ধ আধার। একটু ভেবে দেখুন, কত জিনিসকে নিয়ে আমাদের মনে চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকে, কত জিনিসকে নিয়ে, ভাবলে অবাক হয়ে যাবেন। আমরা সচরাচর পাপচিন্তার কথা বলি, অমুক চিন্তার কথা বলি। না, তা নয়, মনের কাছে সব চিন্তাই পাপ। একাগ্র চিন্তা, এটাই একমাত্র পূণ্য। ওজন হাল্কা করতে হয়, মনের উপর যে ওজন, এটাই হল পাপ। মনের উপর যে ওজন, এটাই অশুদ্ধ। আপনি কারুর সাথে কথা বলার চেষ্টা করুন, দেখবেন একটু তাকে যদি কথা বলার সুযোগ দিয়ে দেন, সে ভরভর করে বলতেই থাকবে, পুরো ট্যাঙ্কিটা আপনার কাছে খালি করে ছাড়বে, এত কিছু তার ভিতর জমে আছে। এরা করবে ঠাকুরের নাম!

আমাদের এক মহারাজ খুব সুন্দর গল্প বলতেন, যদিও এর সাথে সে-রকম কোন সম্পর্ক নেই। গেঁয়ো গল্প কিন্তু মজার। দুই মহিলা বন্ধুর দেখা হয়েছে। দুজনে মিলে বাড়ি থেকে খাবার-দাবার এনেছে, দুজনে মিলে খাচ্ছে। খাবার বেশি নেই। একজন জিজ্ঞেস করছে, 'হ্যাঁরে, তোর মা কিভাবে মারা গেল'? সেই মহিলা তো বিরাট ইতিহাস বলতে শুরু করে দিলেন। 'আমার মার কি হল জানো? আমার এই হল, তারপর এই হল, তারপর ওই হাসপাতালে ভর্তি করালাম, তারপর এই চিকিৎসা করালাম'। ওই বন্ধুটি তখন টপ্ টপ্ করে সবে খেয়ে চলেছে। শেষের দিকে মনে হল, আমি তো কিছু খেলাম না। তখন সে উল্টে তাকে জিজ্ঞেস করছে, 'আর তোমার মা কিভাবে মারা গেল'? সেই মহিলাটি তখন শেষ যে খাবারটা ছিল সেটা মুখে পুরে দিয়ে বলল, 'আমার মা? পড়ল আর মরে গেল'। যখন সমস্ত জায়গায় এই ভাবটা রাখতে পারবেন –পড়ল আর মরে গেল; তখন বুঝবেন আপনি এগোচ্ছেন। আপনার মন শুদ্ধ হয়েছে। একবার যদি কাউকে ভুলে জিজ্ঞেস করেছেন, 'কেমন আছেন'? 'আর মহারাজ কি বলব, এই সংসারে ভাল কি আর থাকা যায়? এটা কি সংসার, এটা তো নরক'। কাউকে আমার জিজ্ঞেস করতেই আতঙ্ক লাগে, কেমন আছেন? এরপর কোথা থেকে শুরু করবে আর কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে, কোন ঠিক নেই'।

কিন্তু শুদ্ধ আধার যদি হয়, মনের মধ্যে কোন তরঙ্গই বইছে না, কি বলবে! ঠাকুরের ওই গল্পটা মনে করুন –সাপকে ব্রহ্মচারী বলছেন, ফোঁস করবি, বিষ ঢালবি না। সাপটাকে রাখালরা যে মেরেছিল, সেটাও তার মনে নেই, এমনই সে সত্ত্বগুণী হয়ে গেছে যে, কে কি করেছে মনে করতে পারছে না। আর

আমাদের মন এমনই যে, কেউ ভুলে যদি কিছু জিজ্ঞেস করে দিল, তারপরেই সে কবেকার ঘটনা মনে করে বলতে শুরু করবে –জানো আমার দিকে এমন ভাবে তাকাল, আমিও ওরকম ভাবে তাকালাম, সে আমাকে দেখে হাসল, আমিও তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম, চলছে তো চলছেই, আর থামতে চাইছে না।

সেইরূপ দর্শন করে যখন সমাধি একটু ভাঙল, হাজরার উপর রাগ করতে লাগলাম। ঠাকুরেরও এত কিছু পরিষ্কার থাকত না। কথায় কথায় মাকে জিজ্ঞেস করতেন। আমাদের ভক্তরাও মাকে জিজ্ঞেস করেন। আর যখনই কেউ এই ধরণের কথা বলে, তখনই আমার মনে হয় সব ড্রামা করছে। এগুলো কত উচ্চ অবস্থার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারব না।

একটা মজার ঘটনা বললে আপনারা বুঝতে পারবেন। আমি মঠে জয়েন করার কয়েক বছর পরের ঘটনা, তখন আমার বয়স একুশ-বাইশ হবে। অন্য একজন ব্রহ্মচারী মহারাজ, আমার থেকে বয়সে বড়, তাঁর সঙ্গে আমার কোন কারণে ঝগড়া হয়ে গেছে। আমাকে কয়েকটা কটূ কথা বলেছিলেন। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। স্বামী সুহিতানন্দজী যিনি এখন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, উনি তখন দেওঘর বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপাল ছিলেন, আর স্বামী চন্দ্রনাথ মহারাজ সেক্রেটারি ছিলেন। সুহিতানন্দজীর এ্যাসিস্ট্যান্টের কাজটাজ করতাম, ওনাকে আমার দুঃখের কথা বললাম, 'আমাকে ওই মহারাজ এমন এমন কথা বলেছেন'। উনি শুনে অসন্তুষ্ট হলেন –'যাক্ যা হয়ে গেছে, মাথা ঠাণ্ডা রাখ'। আমার সবে দীক্ষা হয়েছিল। ওনাকে খুশি করার জন্য আমি বললাম, 'কিছু না মহারাজ, পাঁচ মিনিট মন্দিরে বসলেই সব ঠিক হয়ে যাবে'। আমি ওনাকে দেখাতে চাইছিলাম যে, এই যে আমি দীক্ষা নিয়েছি, ঠাকুরের নাম নিয়েছি, আমি কত বড় একজন, ঠাকুরের কাছে পাঁচ মিনিট বসব আর আমার সব ঠিক হয়ে যাবে। উনি শুনে খুব রেগে গেলেন, 'এত সাধারণ কথার জন্য ঠাকুরের কাছে কেন যেতে হবে? নিজের মনে জোর রাখতে পারছিস না, ওখানেই সব হজম করে নিতে পারতি'। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত জীবনে আমি কখন বলিনি যে, ঠাকুরের সামনে যাব আর ঠাকুরের ইচ্ছাতে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কথায় কথায় ভক্তরা ঠাকুরকে নামিয়ে দেন, এটাকে বলে ট্রিমেলাইজ করা। ঠাকুরের পায়ে দড়ি বেঁধে যখন খুশি ঠাকুরকে নামিয়ে আনছি –ঠাকুর এই সমস্যা হল, ঠাকুর ঠক্ করে নেমে এলেন, বল কি সমস্যা? আবার ঠাকুর স্প্রিংএর মত উপরে চলে গেলেন, আবার স্প্রিংএর মত নামিয়ে আনলাম। এনারা যে কত উচ্চ অবস্থার বর্ণনা করছেন, আমরা কল্পনাই করতে পারিনা। আর আমরা তো কথায় কথায় বলি, আমার ঠাকুর আছেন, আমার মা আছেন।

হাজরার উপর রাগ করতে লাগলুম –শালা আমার মন খারাপ করে দিচ্ছিল। আবার ভাবলুম, সে বেচারিরই বা দোষ কি? সে জানবে কেমন করে? সত্যিকারের আধ্যাত্মিক পুরুষ যাঁরা, তাঁরা যখন এ-ধরণের লোকেদের সঙ্গে থাকেন –খুব মুশকিল। একজন বিদেশী লেখক ছিলেন, তিনি খুব সরল লোক। ওনার অনেকগুলো কাহিনী আছে। একদিন একজন এসে বললে, 'জানেন, আমার এক ছেলে হয়েছে, তিন মাসের হল'। লেখক শুনে বললেন, 'বাঃ, ওয়াণ্ডারফুল, ও কি কথা বলতে শুরু করেছে'? এত সরল মানুষ যে, তিনি জানেন না যে, তিন মাসের বাচ্চা কথা বলতে পারে না। উনি রোজ রাতে একটা বিশেষ হোটেলে যেতেন, সেখানে তিনি মিটবলস্ অর্ডার দিতেন। পাউরুটি আর মিটবলস্ খেয়ে চলে আসতেন। একবার ওনার এক বন্ধু ওনার সঙ্গে ওই হোটেলে এসেছে। সেদিনও মিটবলস, নিয়েছেন। বন্ধুটি বলছে, 'কি করে তুমি খাচ্ছ, এত বাজে মিটবলস্'? যেমনি বললেন, বাজে মিটবলস্, উনিও সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, 'আরে তাই তো ঠিকই বলেছেন তো'। সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারাকে ডেকে পাঠালেন, বেয়ারা এলে তাকে গালমন্দ করতে শুরু করে দিলেন, 'কি বাজে জিনিস, আমি খাব না, নিয়ে যাও'। বন্ধুটি তখন হেসে বলছে, 'মিটবলসে কোন দোষ নেই, একদম ঠিক আছে। আমি শুধু তোমাকে দেখাচ্ছিলাম, তোমার মন কোন কিছুতে থাকে না'। 'হ্যাঁ তাই তো কোন দোষ নেই; জীবনে আমি কোন দিন আপনার কথা আর বিশ্বাস করব না। আপনার কথাকে বিশ্বাস করে বেয়ারাকে মিছিমিছি অপমান করলাম'। এনারা এতই সরল যে, যে যা বলে সেটাকেই এনারা বিশ্বাস করে নেন। আমাদের

বিষয়বুদ্ধি রয়েছে, আমরা লাভ-লোকসানের বিচার করি। আমরা এই ধরণের আচরণ বিশ্বাস করব না, আমাদের পক্ষে বোঝাও সম্ভব না, কারণ আমাদের মন অত্যন্ত কুটিল।

নরেনের নামে ঠাকুর বলছেন, **আমি এদের জানি, সাক্ষাৎ নারায়ণ। নরেন্দ্রের সঙ্গে প্রথম দেখা হল। দেখলুম, দেহবুদ্ধি নেই। একটু বুকে হাত দিতেই বাহ্যশূন্য হয়ে গেল। হুঁশ হলে বলে উঠল, 'ওগো, তুমি আমার কি করলে? আমার যে মা-বাপ আছে'**। এটা খুব নামকরা ঘটনা, আপনারা সবাই জানেন। মূল কথা হল, যেটা এখানে বললেন –শুদ্ধ আধারে স্পষ্ট প্রকাশ। আমি শ্রীরামকৃষ্ণ না, আমি স্বামী বিবেকানন্দ না, কিন্তু আমি সেই নারায়ণ। কারণ যখনই আমরা ঠাকুর বলছি, নরেন বলছি, তখনই একটা উপাধি এসে যাচ্ছে কিন্তু নারায়ণ হলেন উপাধিরহিত। ভাবলে গায়ে কেমন কাঁটা দেয়। আমি যে নারায়ণ, এই জিনিসটা আমরা জানিনা। স্বামীজী যখন বলছেন –সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত শক্তি তোমার ভিতরে; তুমি সর্বশক্তিমান। ঠাকুরও একই কথা বলছেন। শুধু আপনার মনটা যত শুদ্ধ হবে, তত আপনার মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাব প্রকাশ হবে।

ঈশ্বরীয় ভাব প্রকাশ হলে কি হয়? প্রথম, কেউ আপনাকে দাবাতে পারবে না। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, জগতে নিজের স্ত্রীকে অধীনে রাখা সবচেয়ে কঠিন কাজ, ঈশ্বরীয় ভাব প্রকাশ হলে নিজের স্ত্রীও তখন বশে আসে। মাস্টারমশাইর স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা ছিল, ঠাকুর তাই এই রকম বলছেন। এই যে ঠাকুর বলছেন, একটু বুকে হাত দিতেই বাহ্যশূন্য হয়ে গেল; এই হল ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য। নরেনের এই ঘটনাটা ১৮৭৯ কি ১৮৮০র ওই সময়কার; তিন বছর পর ঠাকুর বলছেন। তিন-চার বছর আগেই ঠাকুরের মধ্যে এমন শক্তি যে, নরেনের বুকে হাত দিতেই নরেন সংজ্ঞাহীন হয়ে যাচ্ছে, কল্পনা করা যায়! সংজ্ঞাহীন কি অর্থে হচ্ছে? সাইকলজিতে এটাকে alter state of consciousness বলে। অন্য স্তরে চলে যাচ্ছেন, যে স্তরে গিয়ে এই স্থূল জগতের পিছনে যে সূক্ষ্ম জগৎ, ওই সূক্ষ্ম জগতের পিছনে আরও সূক্ষ্ম যে জগৎ, যাকে কারণ জগৎ বলে, কারণ জগতের পিছনে কোন জগৎ থাকে না, ওটা মহাকারণ; ছুঁয়ে দিতেই ওই কারণ জগতে নিয়ে চলে গেলেন। যেখানে মানুষ অনেক সাধ্য-সাধনা করে, অনেক কষ্ট করে, অনেক মন্ত্রজপ করে, অনেক ধ্যান করে পৌঁছায়; ঠাকুর শুধু ছুঁয়ে দিচ্ছেন আর সেখানে চলে যাচ্ছেন। শুধু নরেনকেই যে করেছেন ঠাকুর তা না, অনেককেই করেছেন। হৃদয়রামকে করেছেন, মথুরবাবুকে করেছেন, আরও অনেককে করেছেন। ১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারীতে তো ঠাকুর কল্পতরু হয়ে এক সঙ্গে অনেককে ছুঁয়ে দিয়ে যার যিনি ইষ্ট তাকে তাঁর ইষ্টদর্শন করিয়ে দিচ্ছেন।

কিন্তু এই দর্শন বা অনুভূতির সব কটাই অস্থায়ী। নরেন সেখান থেকে নেমে এসেছেন, কল্পতরুর দিনে যাঁদের ঠাকুর ছুঁয়ে দিয়েছিলেন, সবাই আবার নেমে এসেছেন। কারণ এটা স্থায়ী হয় না। আপনারা যাঁরা বলেন, মহারাজ একটু কৃপা করুন; আমি তো কৃপা করে দেব, কিন্তু থাকতে পারবেন না, ওখান থেকে আবার পড়ে যাবেন। ঠাকুর এতজনকে কৃপা করলেন, তাতে কি হল, সবাইকে পড়ে যেতে হল। যতজনকে ঠাকুর এইভাবে কৃপা করলেন, পরে সবাইকে নিজের চেষ্টা, সাধনা, তপস্যা করে উপরে উঠে আসতে হয়েছে। কৃপা একটাই হয় –আত্মকৃপা। গুরু যখন কৃপা করেন, ঈশ্বর যখন কৃপা করেন, সেটাও আত্মকৃপা রূপে কৃপা করেন, অন্য কোন কৃপা হয় না। কারণ এমনিতে আপনি যদি পেয়েও যান, ওই পাওয়াটা টিকবে না। কিছু দিন থেকে পরে ধুয়েমুছে বেরিয়ে চলে যাবে।

যদু মল্লিকের বাড়িতেও ঠিক ওইরকম হয়েছিল। ঠাকুর দেখে নিচ্ছেন, আমার জাতের কিনা, বাজিয়ে নিচ্ছেন। **ক্রমে তাকে দেখবার জন্য ব্যাকুলতা বাড়তে লাগল, প্রাণ আটু-পাটু করতে লাগল। তখন ভোলানাথকে বললুম, হ্যাঁগা, আমার মন এমন হচ্ছে কেন? নরেন্দ্র বলে একটি কায়েতের ছেলে, তার জন্য এমন হচ্ছে কেন?** তখনকার দিনে জাতিপ্রথার মারাত্মক প্রভাব ছিল। নরেন কায়স্থ বাড়ির ছেলে। তার জন্য এমন হচ্ছে কেন? সমাজ তখন ওই রকমই ছিল, এতে হাসাহাসি করার কিছু নেই।

তখন ভোলানাথ মহাভারতের রেফারেন্স টেনে বলছেন, **এর মানে ভারতে আছে**। ভারত মানে মহাভারত। **সমাধিস্থ লোকের মন যখন নিচে আসে, সত্ত্বগুণী লোকের সঙ্গে বিলাস করে। সত্ত্বগুণী লোক দেখলে তবে তার মন ঠাণ্ডা হয়**। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মুহুরী ছিলেন, পরে খাজাঞ্চী হয়েছিলেন। একবার ভেবে দেখুন, ভারতবর্ষে ধর্ম কি উচ্চ অবস্থায় ছিল যে, ঠাকুরকে মন্দিরের একজন খাজাঞ্চী বোঝাচ্ছেন, আর একেবারে খাঁটি কথা, ঠাকুরের ওই অবস্থায় যেটা সঠিক কথা, সেটাই বলে তিনি ঠাকুরকে বোঝাচ্ছেন, আস্বস্থ করছেন। আমরা যদি কথামৃত না পড়তাম, এই জিনিসগুলো জানতেও পারতাম না যে সমাধিস্থ পুরুষরা মনকে সংসারে নামিয়ে এনে কিভাবে থাকেন। রাজা মহারাজের ওই রকম ঘটনা আছে। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ধ্যান করেছেন। ধ্যান করে উঠে আসছেন, কিন্তু কারুর দিকে তাকাতে পারছেন না। হঠাৎ লাটু মহারাজকে দেখে বলছেন, তোকে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। জীবনের উদ্দেশ্য সত্ত্বগুণী হওয়া, জীবনের উদ্দেশ্য শুদ্ধ আধার হওয়া, যাতে ঈশ্বরের স্পষ্ট প্রকাশ হতে পারে। তবেই সাধুরা আপনাকে ঠিক ঠিক ভালবাসবে। যাঁরা এই স্তরের তাঁরাও নিজের জাত খোঁজেন, যাঁর সঙ্গে তিনি কথা বলতে পারবেন।

এই কথা শুনে তবে আমার মনের শান্তি হল। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখব বলে বসে বসে কাঁদতুম। ঠাকুরের এই জিনিসগুলিকে লোকেরা অনেক সময় বুঝতে পারে না। এখানে নিজের মত দেখছেন। বাচ্চারা হাসপাতালে থাকলে যেমন মা-বাবার জন্য কাঁদে। আবার দূর দেশে গেলে লোকে যেমন মা-বাবার জন্য কাঁদে; এই কান্না আপনজনের জন্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্বকথা –শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমোন্মাদ ও রূপদর্শন

সমাধিস্থ লোকের মন যখন নিচে আসে, সত্ত্বগুণী লোকের সঙ্গে বিলাস করে –এই জিনিসটার উপর আমরা বিস্তারে ব্যাখ্যা করলাম। এরপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ঠাকুর নিজের অবস্থার বর্ণনা করছেন। যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করতে চাইছেন, যাঁরা ধর্মজীবনে এগোতে চাইছেন, তাঁদের জন্য এই অধ্যায়টা খুব প্রয়োজনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ –উঃ, কি অবস্থাই গেছে। প্রথম যখন এই অবস্থা হল দিনরাত কোথা দিয়ে যেত, বলতে পারি না।

ধর্মজীবন মানে চব্বিশ ঘন্টা আপনি এটাই করবেন। ঠাকুর এখানে যে বলছেন –দিনরাত কোথা দিয়ে যেত; যিনি যেটা পছন্দ করেন, ঠিক ঠিক আপনার যেটা way of life, সেটাতে যখন থাকবেন, তখন সময়ের জ্ঞান থাকে না। বাচ্চারা খেলাধুলো খুব ভালবাসে, খেলার মধ্যে থাকলে সময়ের জ্ঞান থাকে না। পড়াশোনার জন্য ডাকলে যাবে না, মা খাওয়ার জন্য ডাকছে, তাও যায় না, ঘুমোবার জন্য ডাকছে, তাও আসে না। যাকে আমি ভালবাসি, তার সঙ্গে আছি, কথা বলে যাচ্ছি তখনও সময়ের জ্ঞান থাকে না। জপধ্যান একই জিনিস। আপনি বলবেন, আধঘন্টা জপ করার পরে হাত-পা, দেহ, মন সব নিসপিস করতে শুরু করে। সেটা হল আপনার বসার অভ্যাস তৈরী হয়নি বলে। শুধু জপধ্যানটাই আধ্যাত্মিক জীবন না। আধ্যাত্মিক জীবন মানে একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি। লোকেরা এসে জিজ্ঞেস করে, কিভাবে ধ্যান করব, জপ কিভাবে করব। এর আরও দশটা জিনিস করছে, এর মধ্যে জপও আছে, ধ্যানও আছে। যারা করে, তাদের জন্য ঠিক আছে, এগুলো আপনাদের জন্য নয়।

আপনারা হলেন ধর্মজীবনের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা মহিলা। আপনাদের জন্য এটা গঙ্গায় গিয়ে স্নান করার মত না, আপনাদের জন্য হল গঙ্গার মাছ হওয়া। নিত্য সর্বক্ষণ গঙ্গাতেই বাস, গঙ্গাতেই ডুবে থাকা। এ-রকম যদি একবার হয়ে যায়, মন যদি একবার ঠাকুরের সঙ্গে জুড়ে যায় –এটাকেই বলে ভালবাসা। যে যেটাকে ভালবাসে, সে সেটাকে নিয়ে যখন আছে তখন তার সময়ের হুঁশ থাকে না।

আপনারও তখন সময়ের হুঁশ থাকবে না। এই যে ঠাকুর নিজের অবস্থা বর্ণনা করছেন, এটা করছেন আসলে আমাদের জন্য। এখানে ঠাকুর যে নিজের মাহাত্ম্য দেখাচ্ছেন, তা নয়। এগুলো তো একদিনে হয় না। একদিনে একগাদা খেয়ে নিলে বা জিমে গিয়ে একদিন একাগাদা এ্যক্সারসাইজ করে নিলে বডি বিল্ডিং হয় না। অনেকদিন ধরে যেমন এ্যক্সারসাইজ্ করতে হয়, জপধ্যানও অনেকদিন ধরে করতে হয়। কিন্তু জপধ্যান হল আধ্যাত্মিক জীবনের, ধর্মজীবনের একটা ছোট্ট অঙ্গ। চব্বিশ ঘন্টা আধ্যাত্মিক ভাব বা ধর্ম ভাবে থাকলে তবে ওটা হয়। আর জপধ্যানে যেটা হয় তা হল অভ্যাস।

আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একজন মহারাজ আছেন, প্রত্যেক রবিবার সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত একটানা এক আসনে না খেয়ে জপ করতে থাকেন। আমি মজা করে বলি, 'আপনার যা ত্যাগ-তপস্যা, আপনার পাশে বসলে আমাদের এমনিই হয়ে যাবে, আমাদের আর কিছু করতে হবে না'। উনিও আমার কথা শুনে হাসেন, অত্যন্ত মিষ্ট মানুষ। কারণ তিনিও জানেন, আমিও জানি, তিনি খেলে আমার পেট ভরবে না। আমার আশীর্বাদে যদি আপনার ভাল হত, সারা জগৎকে আমি আশীর্বাদ দিয়ে বেড়াতাম। যা হয় নিজের আত্মকৃপাতেই হয়। এগুলো পুরোপুরি অভ্যাসের জিনিস। আর যত কম বয়সে শুরু করা যায় তত সহজ হয়। চেয়ারে বসে করবেন, বিছানায় বসে করবেন, বিছানায় শুয়ে করবেন। কিন্তু চব্বিশ ঘন্টার ভাব, এটা আপনাকে আনতেই হবে; এখানে দুই রকম হয় না। জগৎকে ভালবাসব, জগতের পিছনে দৌড়াব, তার সঙ্গে ধর্মজীবন পালন করব, এভাবে হয় না; ওটা পার্টটাইম, যারা করে তাদের জন্য।

সকলে বললে, পাগল হল। তাই তো এরা বিবাহ দিলে। একজন ডাক্তার ছিল, যে শুধু মাথা ব্যাথার ওষুধ দিতে জানত। একজন রোগী হাঁটুর ব্যাথা নিয়ে ডাক্তারের কাছে এসেছে। ডাক্তার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, 'মাথা ব্যাথা হয়'? সে বলছে, 'না, হয় না'। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একবার, দু-বার, তিন-বার যত বার জিজ্ঞেস করছে মাথা ব্যাথা হয় কিনা, ততবার বলছে, 'হয় না'। শেষে ডাক্তার বিরক্ত হয়ে বলছে, 'হয় হয় বুঝতে পার না'। ডাক্তার ওটাই জানে, আর কি করবে, কিছু করার নেই কিনা। যাঁরা ঠাকুরের জীবনী পড়েছেন, তাঁরা জানবেন; ঠাকুরের আশেপাশে যারা ছিল, সব লোকেদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, ঠাকুর পাগল হয়ে গেছেন। কি করে এই পাগলামি সারানো যাবে? সমস্ত সমস্যার একটাই সমাধান –বিয়ে দিয়ে দাও। বাড়ির ছেলে বা মেয়ে বেশি লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে, বিয়ে দিয়ে দাও। ইদানিং কালে আর করা যাবে না, তখনকার দিনে এটাই ছিল সমাধান। এমনকি আমরা যখন ছোট ছিলাম তখনও এই রকম ছিল। ছেলে বা মেয়ে একটু ডানদিক বামদিক করছে, বিয়ে দিয়ে দাও। আমরা এখন যে কথাগুলো আলোচনা করছি, সত্যিকারের যাঁরা ধর্মজীবনে ঢুকতে চান, তাঁদের জন্য। আর তা যদি না হয়, তাহলে এগুলোকে খোশগল্প হিসাবে যদি নিতে চান, খোশগল্প বলেই নিন। সেটার জন্য আর কথামৃত পাঠ কেন, তার জন্য অন্য ধরণের অনেক উপকরণ আছে।

উন্মাদ অবস্থা; –প্রথম চিন্তা হল, পরিবারও এইরূপ থাকবে, খাবে-দাবে। এটাকে নিয়ে খুব বেশি বর্ণনা নেই। ঠাকুরকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঠাকুর জানতেন তিনি সংসার করবেন না। কিন্তু বিয়ে যখন হয়ে গেল, তখন একজনের দায়ীত্ব তাঁর কাছে এসে গেল। এই দায়ীত্ব কিভাবে তিনি পালন করবেন, ঠাকুরেরও দুশ্চিন্তা হচ্ছে। তিনি চিন্তা করলেন –পরিবারও এইরূপ থাকবে, খাবে-দাবে। এই ব্যাপারটা আমাদের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়, যিনি নিজের ধুতি সামলাতে পারছেন না, তাঁর বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল। এখন কি হবে? ঠিক আছে, পরিবারও এইরূপ থাকবে, খাবে-দাবে।

শ্বশুরবাড়ি গেলুম, সেখানে খুব সংকীর্তন। নফর, দিগম্বর বাঁড়ুজ্যের বাপ এরা এল! খুব সংকীর্তন। এক-একবার ভাবতুম, কি হবে। দেখুন, যাঁরা ওই উচ্চ সমাধির স্তরে আছেন, তাঁদেরও দুশ্চিন্তা হয়, কারণ একজনের দায়ীত্ব নিতে হয়েছে কিনা। অন্য দিকে ঠাকুর নিজেও তো বুঝতে পারছেন, জিনিসটা কি হতে চলেছে। **আবার বলতুম, মা, দেশের জমিদার যদি আদর করে, তাহলে**

বুঝব সত্য। তারাও সেধে এসে কথা কইত। এটাও খুব ইন্টারেস্টিং কথা। আধ্যাত্মিক জীবনে যাঁরা এগোন, আপনাদের মধ্যেও যাঁরা নিয়মিত জপধ্যান করেন, দেখবেন, মনে আপনার একটা কোন চিন্তা-ভাবনা এলো, সেটা মিলে যাবে। এটা যে সব সময় হবে তা না, মাঝে মাঝে একটা ফেজ্ আসে। মহারাজদের ব্যাপারে এই রকম অনেক কাহিনী আমার জানা আছে।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীতে বর্ণনা আছে, কিভাবে মা কিছু একটা ভাবছেন, সেটা হয়ে যাচ্ছে। এগুলো আহামরি এমন কিছু নয়। যদি বিচার করে দেখেন, আপনাদের জীবনেও এ-রকম অনেক কিছু দেখতে পাবেন। এগুলো আসে আবার চলেও যায়। জপধ্যান করলে এগুলো আসে, এটাকে মনের একটা বিশেষ ক্ষমতা বলতে পারেন, সিদ্ধাই বলতে পারেন, লক্ষণ বলতে পারেন। তবে যাদের মনে হয় দর্শন হচ্ছে, এটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে, এটা হল একটা টেস্ট। আপনার যদি মনে হয় আপনি অনেক এগিয়ে গেছেন, এরজন্য মাঝে মাঝে পরীক্ষা করতে হয়। প্রথম কথা নিজেকে প্রশ্ন করা, ঠাকুর নিজেকে প্রশ্ন করছেন, আমার এগুলো কি সত্য? বিচার করতে হয় আর তার সঙ্গে হল টেস্ট। এটা তার মধ্যে একটা টেস্ট, কারণ সত্যিকারের যাঁদের মন ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়ে গেছে, ওনারা যদি চিন্তা করেন 'এই রকমটি হবে', ওটা কিন্তু হয়।

আর-একটা হয়, মনে কিছু উঠল। সেটা অনেক সময় হয়, অনেক সময় হয় না। কিন্তু মনে মনে ঠিক করেছেন এটা হবে, সেটা হবে। স্বামীজীও বলছেন, সে যদি বলে পাহাড় চূর্ণ হয়ে যাক, পাহাড় চূর্ণ হয়ে যাবে। সত্যিকারের যে কোন সাধুপুরুষ যদি বলেন, 'এটা হবে', ওটা হবেই। ওনারা বাক্‌সিদ্ধ হয়ে যান, ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়ে আছেন কিনা। সেইজন্য আপনাদের যদি মনে হয়, আমার এই দর্শন, সেই দর্শন হচ্ছে; তখন কাউকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। আপনি শুধু মনে একটা চিন্তা-ভাবনা এনে দেখুন এটা হয় কিনা। যদি দেখেন হচ্ছে না, তাহলে বুঝবেন আপনার দর্শন যা কিছু হচ্ছে, মনের ভুল। তাই বলে একটা দুটো কাকতালীয় ভেবে লেগে গেল, সেই রকম হলে বোঝা যাবে না, রীতিমত সব কটাই হবে। ঠাকুরের এই ধরণের অনেক ঘটনা আমরা পাই।

এরপর ঠাকুরের যে অনেকগুলো দর্শন হয়েছিল, তার বর্ণনা দিচ্ছেন। আসল সত্য হলেন সচ্চিদানন্দ, আত্মা বা ব্রহ্ম যাই বলুন, কিন্তু এই জগতে এসে তিনি স্ত্রী হয়েছেন, পুরুষ হয়েছেন, যুবক হয়েছেন, যুবতী হয়েছেন, বৃদ্ধ হয়েছেন –*ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি*। কাঁধে করে যাকে ঘাটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেটাও তিনি। রাস্তায় যে কাঙালী ভিখারী বসে আছে, সেটাও তিনি। এই অভেদ জ্ঞান তখনই হয় সমাধিতে যখন আপনার আত্মজ্ঞান হবে এবং সেখান থেকে আপনি নেমে ফেরৎ আসছেন। কিন্তু, অনুশীলন সব সময় করতে পারেন। তিনিই এই জগতে এসে সব কিছু হয়েছেন, এটাকেই জীবনে অভ্যাস করা। দিনে মাত্র পাঁচ মিনিট আপনি বার করে নিন, এই পাঁচ মিনিট আমি যতজনকে দেখছি, যতজনকে জানি, যা কিছু সামনে দেখছি, সবাইকে এবং সব কিছুকে আমি ঈশ্বর রূপে দেখব। কিছু দিন করে দেখুন দেখবেন খুব ভাল লাগবে, আনন্দ পাবেন। যেদিন আপনার জ্ঞানলাভ হবে, ঈশ্বরদর্শন হবে, তখন আপনি এটাই দেখবেন। জীবনে ওটাই দেখা যখন উদ্দেশ্য, তাহলে এখন থেকেই দিনে পাঁচ মিনিট দেখার অভ্যাস করলে ক্ষতি কি! হে প্রভু তুমি নারী হয়েছ, তুমিই পুরুষ হয়েছ। বেদের মন্ত্রগুলো কোন কাব্য নয়, সাহিত্য নয়, ঋষিরা বাস্তব এগুলো দেখেছেন, কিছু দিন আগে ঠাকুরও দেখেছেন।

কি অবস্থাই গেছে। একটু সামান্যতেই একেবারে উদ্দীপন হয়ে যেত। আপনাদেরও হয়, হয় না তা নয়। যাঁরা এই প্রবচনগুলি এক ঘন্টা শুনে নিচ্ছেন, মনটা তাঁদের একটা উচ্চ অবস্থায় তো যাচ্ছে। তখন ইচ্ছে তো করে, এতে একটু ডুবে থাকি; এটাই উদ্দীপন। ঠাকুরের একটুতেই হয়ে যেত, এটাই শুধু তফাৎ। **সুন্দরীপূজা করলুম! চৌদ্দ বছরের মেয়ে। দেখলুম, সাক্ষাৎ মা। টাকা দিয়ে প্রণাম করলুম**। ঠাকুর দেবতা, সাধু, সন্ন্যাসীদের প্রণাম করলে টাকা দিয়ে প্রণাম করতে হয়। এমনকি বড়দেরও যখন প্রণাম করা হয়, সেখানেও এমন করা হয়। আগেকার দিনের লোকেরা এগুলো করত, এখন উঠে যাচ্ছে।

আমাদের এক সন্ন্যাসী বন্ধু খুব সুন্দর গল্প বলছিলেন। মহারাজ দক্ষিণ ভারতের, বলছেন, দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করে তামিলনাড়ুতে, একদিকে যেমন হিন্দু ধর্মের বিরোধী কথা হয়; অন্য দিকে প্রচণ্ড গোঁড়া হিন্দু সব। যারা হিন্দু বিরোধী কথা বলে, তাদেরও বিবাহ আদিতে যখন দরকার পড়ে, তখন ওই গোঁড়া হিন্দুদের কাছেই আসতে হয়। নূতন যে প্রজন্ম এসেছে, তারা এগুলো মানে না। মহারাজ একজনের কথা বলছিলেন, যাঁকে উনি জানেন, প্রচণ্ড গোঁড়া হিন্দু; কিন্তু তাঁর ছেলে পুরো ধর্মের বিরোধী হয়ে গেল। তারপর যখন ছেলেটির বিবাহের সময় হল, মেয়ে বলে দিয়েছে ব্রাহ্মণ ছাড়া বিয়ে করব না। তড়িঘড়ি করে ছেলেটির গলায় একটা পৈতে ঝোলাতে হল। ছোটবেলায় পৈতে হয়েছিল, কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্র কোন দিন জপ করেনি। বিয়ের পর তাদের সন্তান হয়েছে। এখন ছেলেটির মনে হয়েছে তার ছেলে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করুক, সন্ধ্যাবন্দনাদি করুক। ছেলে বাবাকে তখন বলছেন, 'বাবা, তোমাকে তো কোনদিন দেখলাম না সন্ধ্যাবন্দনা করতে, আমাকে করতে বলছ কেন'? ভদ্রলোক এখন হা-হুতাশ করছে। পরম্পরাকে ছেড়ে দিলে এই সমস্যা হয়; হাজার হাজার বছর ধরে ঋষিরা যে একটা সুন্দর ব্যবস্থা তৈরী করে দিয়ে গেছেন, আস্তে আস্তে সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

রামলীলা দেখতে গেলুম। একেবারে দেখলুম, সাক্ষাৎ সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, বিভীষণ। তখন যারা সেজেছিল, তাদের সব পূজা করতে লাগলুম। এই প্রথা অনেক জায়গায় আছে। এই যে আপনি রামলীলা দেখছেন, এটা আপনি মনোরঞ্জনের জন্য দেখছেন না, রামে মগ্ন হওয়ার জন্য দেখছেন। মনোরঞ্জনের জন্য দেখা বাচ্চাদের জন্য ঠিক আছে। কিন্তু আপনি বড় হয়ে গেছেন।

কুমারীদের এনে তখন পূজা করতুম। দেখতুম, সাক্ষাৎ মা। আমাদের ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। চিন্তা-ভাবনা করে ওই ভাবটা আরোপ করতে হয়। সাধনা জিনিসটা কি? তার উত্তরে বলছেন, সিদ্ধপুরুষরা বাস্তবিক যা দেখেন, সিদ্ধপুরুষদের যেটা সিদ্ধি হয়েছে, সেটাকেই যখন আমরা চেষ্টা করে করছি, এটাকে বলে সাধনা। ঠাকুরের কাছে যেটা স্বাভাবিক, আমাদের কাছে সেটাই কষ্টসাধ্য। কষ্ট করে করে ওখানে যাওয়া, এটাই সাধনা। কুমারীদের আমাদের পূজা করতে হবে না, অন্ততঃ এটা তো আরোপ করতে পারি, এরা সেই জগজ্জননীরই এক-একটি রূপ।

একদিন বকুলতলায় দেখলুম, নীল বসন পরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, বেশ্যা। দপ্ করে একেবারে সীতার উদ্দীপন। মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, উদ্দেশ্য তার অন্য রকম হতে পারে, কিন্তু ঠাকুর দেখছেন সাক্ষাৎ সীতা। **ও মেয়েকে ভুলে গেলুম; কিন্তু দেখলুম, সাক্ষাৎ সীতা লঙ্কা থেকে উদ্ধার হয়ে রামের কাছে যাচ্ছেন। অনেকক্ষণ বাহ্যশূন্য হয়ে সমাধি অবস্থা হয়ে রইল**।

আমাদের পক্ষে এতটা হয়ত সম্ভবপর হয়ে উঠবে না, কিন্তু আরোপ করতে হয়। আমাদের সমাজে যে নিজের মেয়েকে মা বলে ডাকা হয়, ছেলেকে যে গোপাল, নাড়ু, কানু নামে ডাকে, এর পিছনে একটাই উদ্দেশ্য; জগজ্জননী বা শ্রীকৃষ্ণের শিশু রূপ আরোপ করা। আর এই নিয়ে কত গান; এখনও যদি গ্রামগঞ্জের দিকে যান, কৃষ্ণকে নিয়ে কি মধুর গান সব। বিশেষ করে সুরদাসের জন্য হিন্দি বেল্টে বাচ্চা কোন ছেলেকে দেখলেই লোকেদের কৃষ্ণের কথা মনে পড়ে। বাচ্চা হয়ত কোন দুষ্টুমি করছে, সেই দুষ্টুমি দেখে কৃষ্ণের ছোটবেলার কথাতে মন চলে গেল। ঠাকুর এখানে কল্পনা করছেন না, দপ্ করে উদ্দীপন্, সেখান থেকে সমাধিতে ডুবে গেলেন।

আর-একদিন গড়ের মাঠে বেড়াতে গিছলুম। বেলুন উঠবে –অনেক লোকের ভিড়। হঠাৎ নজরে পড়ল, একটি সাহেবের ছেলে গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ত্রিভঙ্গ হয়ে। যাই দেখা, অমনি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন। সমাধি হয়ে গেল। ঠাকুর তখন আর ছেলে দেখছেন, দেখছেন শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সিওড়ে রাখাল-ভোজন করালুম। তাদের হাতে হাতে সব জলপান দিলুম। দেখলুম, সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল। তাদের জলপান থেকে আবার খেতে লাগলুম। ঠাকুর যিনি কারুর এঁটো খেতেন না, তিনি গ্রামের রাখালদের থেকে খাচ্ছেন, কারণ তিনি তাদের দেখছেন সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল।

প্রায় হুঁশ থাকত না। সেজোবাবু জানবাজারের বাড়িতে নিয়ে দিন কতক রাখলে। দেখতে লাগলুম, সাক্ষাৎ মার দাসী হয়েছি। ঠাকুরের এক-এক সময় এক-এক রকম ভাব হত। **বাড়ির মেয়েরা আদপেই লজ্জা করত না। যেমন ছোট ছেলেকে বা মেয়েকে দেখলে কেউ লজ্জা করে না**।

আপনি যদি আধ্যাত্মিক পুরুষ হন, সত্যিকারের সাধন-ভজন যদি করে থাকেন, তাহলে একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন, আপনাকে নিয়ে কেউ লজ্জা করবে না। পুরুষরাও লজ্জা করবে না, মেয়েরাও লজ্জা করবে না। লজ্জা জিনিসটা কি, লজ্জা হল কুণ্ঠিত হয়ে যাওয়া। যে কোন বাচ্চা ছেলে অজানা অপরিচিত কাউকে দেখলে কুণ্ঠিত হয়ে যায়। লজ্জাবতী গাছের পাতায় একটু স্পর্শ করলে পুরো ডালটাই কুঁকড়ে নুয়ে যায়, তার মানে তার কাছে এটা অজানা অচেনা। একজন বিবাহিতা স্ত্রী নিজের স্বামীর কাছে প্রথমের দিকে লজ্জা পান। কিন্তু ধীরে ধীরে যত পরিচিত হতে থাকে তখন পুরুষের স্ত্রীর কাছে, স্ত্রীর পুরুষের কাছে সেই লজ্জাটা আর থাকে না। কারণ তখন সেখানে এক বোধ হয়ে গেছে। ছেলেমেয়ে যখন খুব ছোট থাকে তখন মা-বাবার সঙ্গে একাত্ববোধ হয়ে থাকে, তাই লজ্জা পায় না। কিন্তু বড় হতে হতে ওদের মধ্যে যখন একটা ব্যক্তিত্ব তৈরী হয়ে যায়, তখন আলাদা হয়ে যায়।

সাধুসন্ন্যাসীদের যদি কেউ ঠিক ঠিক ঈশ্বরে ডুবে থাকেন, সেখানে পর বোধ হয় না। ওনারা সামনে এসে দুটো কথা বললেই তা সে পুরুষ হোক, নারী হোক, ছেলে হোক, বুড়ো হোক, সবারই মন খুলে যায়। যাদের খোলে না, বুঝতে হবে তাদের মনে অনেক এলেমেলো আছে। স্বামীজীর সঙ্গেও সবাই মন খুলে কথা বলতেন। আমরা অনেক মহারাজদের জানি, যাঁদের সামনে এসে সবাই মন খুলে কথা বলতেন। কুণ্ঠা বোধ, লজ্জা বোধটা থাকে না, একেবারে ফ্রী হয়ে যায়। সাধুসন্ন্যাসীর কাছে আপনি যদি ফ্রী মনে না করেন, তাহলে বুঝতে হবে সাধুর কিছু গোলমাল আছে আর তা নাহলে আপনার কোন সিরিয়াস গোলমাল আছে। ঠাকুর বলছেন, **আন্দির সঙ্গে –বাবুর মেয়েকে জামাইয়ের কাছে শোয়াতে যেতুম**। পবিত্রতা কোন স্তরে ভাবা যায়! কারুর লজ্জা করছে না।

এখনও একটু তাতেই উদ্দীপন হয়ে যায়। রাখাল জপ করতে করতে বিড় বিড় করত। আমি দেখে স্থির থাকতে পারতুম না। একেবারে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়ে, বিহ্বল হয়ে যেতুম। এই জিনিসটা আপনাদের মধ্যেও লক্ষ্য করবেন। বেলুড় মঠে এলেন, দেখছেন মন্দিরে অনেকে জপ করছেন, আপনারও ইচ্ছে হবে, আচ্ছা পাঁচ মিনিট বসে একটু জপ করি। এটাও উদ্দীপন, ঠাকুরের উদ্দীপনটা অনেক উঁচু স্তরের, কিন্তু জিনিসটা এক। ঠাকুর নিজের সব প্রকৃতিভাবের কথা বলছেন।

ঠাকুর প্রকৃতিভাবের কথা আরও বলিতে লাগিলেন। আর বললেন, "আমি একজন কীর্তনীয়াকে মেয়ে-কীর্তনীর ঢঙ সব দেখিয়েছিলুম। সে বললে, 'আপনার এ-সব ঠিক ঠিক। আপনি এ-সব জানলেন কেমন করে'।" ঠাকুর খুব সুন্দর নকল করতে পারতেন, বুদ্ধিটা পরিষ্কার কিনা, যাকে যেভাবে দেখতেন, সেটাকে মনের মধ্যে ধরে নিতেন।

এই বলিয়া ঠাকুর ভক্তদের মেয়ে-কীর্তনীয়ার ঢঙ দেখাইতেছেন। কেহই হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। ঠাকুরের সেই নিজের অবস্থার কথা ভাবুন, কিভাবে তিনি সমাধিতে চলে যাচ্ছেন। আবার সেখান থেকে নেমে এসে মজা তামাসা করছেন।

আমাদের চারটে জগৎ –স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎ আর মহাকারণ। মহাকারণ নির্বিকল্প সমাধির; কারণ জগৎ –যেখানে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করেন, সূক্ষ্ম জগৎ –মন যেখানে আধ্যাত্মিক

ভাবে বিচরণ করে আর স্থূল জগৎ –যেখানে আমরা আছি। ঠাকুর এটাকেই অন্য ভাবে বলছেন – বাহ্যদশা, অর্দ্ধবাহ্যদশা আর অন্তর্দশা। অন্তর্দশাতে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ দুটো চলে যায়, কারণ জগৎ আর মহাকারণে বাচ খেলেন। অর্দ্ধবাহ্যদশায় সূক্ষ্মজগৎএ বিচরণ করেন। চৈতন্য মহাপ্রভুকে নিয়ে কথা বলছেন। যাঁরা সাধারণ সাধক, তাঁরা এই স্থূল জগৎ থেকে উঠে সূক্ষ্ম জগতে চলে যান। কারণ জগতে যাওয়া মানে সাংঘাতিক ব্যাপার, ওখানে সবাই যেতে পারেন না। কিন্তু যাঁরা সত্যিকারের মহাপুরুষ, তাঁরা বাচ খেলেন। এই স্থূল জগতে বিচরণ করছেন, এই সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ, সেখান থেকে এই কারণ জগতে বিচরণ করছেন, আবার এই মহাকারণে চলে যাচ্ছেন। এরজন্য তাঁদের কোন চেষ্টা করতে হয় না। ইংরাজীতে বল effortlessly। অনায়াস, কোন পরিশ্রম নেই। আমাদের তো এ জিনিস কোন দিন হবে না, সম্ভবই না, অবতার পুরুষরাই পারেন। কিন্তু দেখুন ঠাকুর নিজের অবস্থার কি সব বর্ণনা করছেন, সেখান থেকে দুম্ করে, চোখের পলকে তিনি দেখাচ্ছেন মেয়ে-কীর্তনী কেমন ঢঙ করে।

এখানে যা কিছু বর্ণনা করা হল, এর সব কিছুর মূল হল, *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি*, সেই সচ্চিদানন্দই, সেই আত্মাই সব কিছু হয়েছেন, এটাকে অভ্যাস করতে হয়। দিনে পাঁচ মিনিটও যদি কেউ অভ্যাস করেন, ভাল লাগবে, মনটা খুলে যাবে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান তো বাইরে থেকে আসে না, ভিতর থেকে আসে। মাঝে মাঝে গিয়ে ছুঁয়ে নেওয়া। আমরা যা কিছু পড়াশোনা করি, যা কিছু শুনি, যা কিছু অনুভব করি; সবটাই সেই জ্ঞানেরই রূপ। কোন জ্ঞান? সেই আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান সেই অনন্ত জ্ঞান, যেটা আপনার ভিতর আছে। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, এটা একটা জ্ঞান। এই জ্ঞানটাও ওই আত্মজ্ঞানেরই একটা রূপ। কেমেস্ট্রিতে যে এইচ-টু-ও মানে জল পড়ছেন, এটাও সেই জ্ঞানেরই আর-একটা রূপ। জ্ঞানের যত গভীরে যাওয়া যাবে, জ্ঞানের যত কাছে যাওয়া যাবে, মনে তত আনন্দ আসবে, তত শক্তি আসবে। একেবারেই যদি না যাওয়া যায়, একটু অভ্যাস তো করে নিতেই পারা যায়। পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও সেই আনন্দটা একটু বোধ করব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে – ঠাকুর "অহেতুক কৃপাসিন্ধু"

দুপুর হয়েছে, ঠাকুরের আহারাদি করা হয়ে গেছে। আহারের পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করছেন। শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক, যিনি একজন পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি এসে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন ও আসন গ্রহণ করলেন। মণিলাল একটা দুটো কথা বলছেন। গতকাল সারারাত ঠাকুর জেগে ছিলেন। **ঠাকুর অর্ধনিদ্রা অর্ধজাগরণ অবস্থা। এক-একবার উত্তর দিতেছেন।**

মণিলাল –শিবনাথ নিত্যগোপালকে সুখ্যাতি করেন।

ঠাকুর তখনও শুইয়া –চক্ষে যেন নিদ্র আছে। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হাজরাকে ওরা কি বলে"? ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন। মণিলালকে ভবনাথের ভক্তির কথা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –আহা, তার কি ভাব! গান না করতে করতে চক্ষে জল আসে। হরিশকে দেখে একেবারে ভাব। বলে, এরা বেশ আছে। হরিশ বাড়ি ছেড়ে এখানে মাঝে মাঝে থাকে কিনা।

মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আচ্ছা ভক্তির কারণ কি? ভবনাথ এ-সব ছোকরার কেন উদ্দীপন হয়"? ঠাকুরই জিজ্ঞেস করছেন, ভক্তির কারণ কি। মাস্টার কিছু বলছেন না, কিছু বলার দরকার নেই। মাস্টার চুপ করে আছেন। ঠাকুর নিজেই বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –কি জানো? মানুষ সব দেখতে একরকম, কিন্তু কারুর ভিতর ক্ষীরের পোর! যেমন পুলির ভিতর কলাইয়ের ডালের পোরও থাকতে পারে, ক্ষীরের পোরও থাকতে পারে, কিন্তু দেখতে একরকম। ঈশ্বর জানবার ইচ্ছা, তাঁর উপর প্রেমভক্তি –এরই নাম ক্ষীরের পোর।

সমস্ত মানুষ সেই শুদ্ধ আত্মা, সেখানে ‘কু’ বলে কিছু নেই, একেবারে শুদ্ধ বিশুদ্ধ আত্মা। এই শুদ্ধ বিশুদ্ধ আত্মার উপর অজ্ঞানের আবরণ। সাংসারিক যে কোন জ্ঞান, সাংসারিক যে কোন কর্ম, এটাও অজ্ঞান, ধর্মটাও অজ্ঞান। যে কোন কিছুর জন্য চেষ্টা করা এটাও অজ্ঞানের মধ্যেই পড়ে। ঠাকুর যেমন বারবার বলছেন, পাপ-পূণ্য, ধর্ম-অধর্ম, সবটাই আবরণ। যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তিনি এর সব কিছুর পারে। ঠাকুর যে পোরের কথা বলছেন, এটা তিনি আবরণকে নিয়ে বলছেন, শুদ্ধ আত্মাকে নিয়ে বলছেন না। ঠাকুর যখন বলছেন, কলাইয়ের ডালের পোর, তখন এটা বলতে চাইছেন না যে, সে গোল্লায় গেছে। আমাদের একটি মন আছে, যেটা দিয়ে আমরা সংসার চালাচ্ছি। আমাদের কাজকর্ম যা কিছু হয়, পুরোটাই বাইরের স্থুল শরীর দিয়ে হয়। এই স্থূল শরীরের পিছনে যে সূক্ষ্ম ভাব, এটাকে পোর বলছেন। এই পোরকে দিনরাত পাল্টানো যায়। বাইরে থেকে যেমন যেমন কর্ম করবেন, তেমন তেমন এই পোর পাল্টাবে। কিন্তু এর আরও পিছনে যেটা, কারণ ও মহাকারণ, ওখানে কোন প্রশ্ন ওঠে না। যত গোলমাল সূক্ষ্মকে নিয়ে। মহাকারণ হল শুদ্ধ আত্মা, সেখানে সবাই সমান। সেখানে অজ্ঞানের প্রথম আবরণ হল কারণ, যেটা দিয়ে ঈশ্বরকে দেখে, ওখান থেকেই অজ্ঞানের প্রথম আবরণ শুরু হল। কিন্তু যেমনি সূক্ষ্ম আসে, যেটা দ্বিতীয় আবরণ, এটা সাংঘাতিক। মানুষ মানুষের মধ্যে আসল তফাৎটা এখানে।

একটা খোলা মাঠ, খোলা মাঠে আপনি যা খুশি করতে পারেন। এবার ওখানে একটা কাঠামো এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল, মানে সীমিত করে দিলেন। এরপর খড়ের একটা পুতুল বেঁধে দেওয়া হল। মোটামুটি এবার বোঝা যাচ্ছে, এটা হয় মা সরস্বতী হবেন, নয়তো মা দুর্গা হবেন। মাটি যখন দিয়ে দেওয়া হল, এবার ওটাকে আরও বেঁধে দেওয়া হল। এরপর রঙ দেওয়া হল, শাড়ি পরানো হল, এবার পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ইনি মা দুর্গা। ইনি এখন মা দুর্গাই থাকবেন, মা কালী করা যাবে না। যদি মা দুর্গাকে মা কালীতে পাল্টাতে হয়; আগে মাটি সরাতে হবে, তারপর খড় খুলতে হবে। এরপর খড় এনে কাঠামোকে অন্য ভাবে বাঁধতে হবে। পোরের কথা যখন ঠাকুর বলছেন, এই যে খড়, এটাকে নিয়ে বলছেন। কিন্তু তারও পিছনে যেটা, সেটাকে নিয়ে প্রশ্ন নেই। এই প্রশ্নকে নিয়ে যে সমস্যা, এই সমস্যা অন্যান্য ধর্মে আছে। কিছু কিছু ধর্ম আছে, যারা বলে, আমার ধর্মকে যারা মানে না, তারা নরকে যাবে। এদের মতে শ্রেষ্ঠ হল এটা, হিন্দুরা এ-ধরণের কথা কখনই বলবে না। আমরা এই ধরণের কথা কল্পনাও করতে পারি না। ঠাকুর এবার ভক্তদের অভয় দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) –কেউ কেউ মনে করে, আমার বুঝি জ্ঞানভক্তি হবে না, আমি বুঝি বদ্ধজীব।

এই যে ঠাকুর এক্ষুণি পোরের কথা বললেন, এই কথা শুনে আমাদের ধরে নেওয়া উচিত যে আমাদের আর কিছু হবে না। ঠাকুর বদ্ধজীবদের নিয়ে বলছেন, অনেকে মনে করেন আমি বদ্ধজীব। কিন্তু গুরুর কৃপা হলে কোন কিছুরই ভয় নেই। গুরুকৃপা, আত্মকৃপা যাই বলুন, সব এক। মাটির মুর্তির যে কথা বলা হল, আপনি তা নন। পিছনে যে খড়ের পুতুল, আপনি তাও নন। তারও পিছনে যে কাঠামো, আপনি তাও না। তারও পিছনে যে শুদ্ধ মাঠ, আপনি সেটা। যার জন্য এই জিনিসগুলিকে বোঝানর জন্য আমাদের শাস্ত্রে অনেক কাহিনী নিয়ে আসা হয়েছে। যেমন বাল্মীকি, তিনি নাকি রত্নাকর নামে ডাকাত ছিলেন। নারদ মুনি এসে বললেন, তোমার পাপ কে নেবে? কাহিনী আমরা সবাই জানি, তাঁর জ্ঞান হয়ে গেল; সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে গেল। এগুলো বোঝানর জন্য যে, জগতে খারাপ কেউ নেই। জগতে কেউ খারাপ হতে পারে না, একেবারেই অসম্ভব; তবে পোরটা খারাপ হতে পারে, তার আবরণটা খারাপ হতে পারে। আবরণটা তো একটা আবরণ বই আর কিছু না, প্যাকিং মাত্র, ওটাকে ফেলে দিতে বা ছেড়ে দিতে কতক্ষণ আর লাগবে! ঠাকুর যখন পোরের কথা বলছেন, আপনারা দয়া করে মনে রাখবেন, পোর বলতে এখানে আসলটা না, আসলের উপরে যে আবরণটা সেটাকে পোর বলছেন।

এরপর ঠাকুর ছাগল আর বাঘের গল্পটা বলছেন, খুব নামকরা গল্প। স্বামীজীও এই গল্প অনেক জায়গায় বলছেন, কিভাবে একটা সিংহ শাবক ভেড়াদের মধ্যে থেকে বড় হচ্ছিল, একটু বড় হতেই ভেড়ার মত ভ্যা ভ্যা করছে, সিংহের চালচলন, স্বভাব সব ভেড়ার মত হয়ে গেছে। আমরা সবাই আসলে সিংহ, কিন্তু ভেড়ার দলে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ঘাস খেয়ে আনন্দ পাচ্ছি আর ভ্যা ভ্যা করছি। আর-একটা বড় সিংহ এসে তাকে টেনে হিঁচড়ে একটা জলের কাছে নিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলল, দ্যাখ্, 'আমিও যা তুইও তাই'। আপনি বলবেন, কই আমাদের তো মহারাজ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে দেখাচ্ছেন না? দেখাচ্ছেন না মানে? শাস্ত্র তো সেটাই করছেন। শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যতে এক জায়গায় বলছেন, কি আশ্চর্য! কেউ তোমাকে বলেনি তুমি দেহ, কেউ তোমাকে বলেনি তুমি মন, তুমি সংসার; কিন্তু সবাই নিজেকে মনে করে, আমি দেহ, আমি মন। সমস্ত শাস্ত্র বারবার বলছেন, তুমি সেই শুদ্ধ আত্মা, তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক –অথচ লোকেরা এটা মানতে চায় না। এটাই মায়া।

এই যে গুরুকৃপা; আপনারা জিজ্ঞেস করবেন গুরুকৃপা কিভাবে হবে, আপনার নিজের কৃপা হলেই হবে। ভগবান কৃপা করে অবতার হয়ে এসে গেলেন, এসে কথামৃত দিলেন। আমাদের পূজনীয় স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ, এখন যিনি প্রো ভাইস-চ্যান্সলার, ভাইস-চ্যান্সলার থাকাকালীন তিনি আমাদের শাস্ত্রের ক্লাশগুলো শুরু করেছিলেন, যাতে সাধারণ লোকেরা শাস্ত্রের কথা জানতে পারে। শাস্ত্রের কথা এখন মহারাজরা সুন্দর ভাবে পরিষ্কার করে ধর্মজিজ্ঞাসুদের কাছে প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। সত্যিই আজকে ওনার জন্যই এই আধ্যাত্মিক ক্লাশগুলো চালানো সম্ভব হয়েছে। এত কিছু তো আপনাকে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু আপনি মানতেই চাইছেন না যে, আপনি দেহ নন, আপনি মন নন।

একটা বাচ্চাকে পড়ানোর জন্য একজন ম্যাডাম রাখা হল। ম্যাডাম বাচ্চাকে কিছুতেই পড়াতে পারছেন না। বাচ্চার মা ম্যাডামকে বলল, 'আপনার নিজের উইল পাওয়ারটা একটু লাগান'। ম্যাডাম খুব সুন্দর বললেন, 'আমি তো আমার উইল পাওয়ার লাগাচ্ছি, কিন্তু ওর যে 'আমি করব না' ওটাকে আমার উইল পাওয়ার ভাঙতে পারছে না'। বুঝুন আপনার ক্ষমতা কি সাংঘাতিক, শুধু আপনার 'না', আমি নিজেও তাতে আছি। শাস্ত্র ভগবানের কথা, সেটাকেও আমরা ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছি না, বাইরে থেকেই আটকে দিচ্ছি। গীতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা, উপনিষদ ঋষিদের কথা, কথামৃত অবতারের কথা। এনারা সবাই এক বাক্যে বলছেন, তুমি সেই শুদ্ধ আত্মা। আমরা বাইরে থেকেই সব কথাকে আটকে দিচ্ছি, এটাই তো প্রমাণ করে আপনার কি সাংঘাতিক ক্ষমতা, অবতারকেও আটকে দিচ্ছেন। রাবণ, কংস আপনার সামনে কিছুই না। যে ঈশ্বরের শক্তির সামনে সর্বকালের দুই বিশাল ক্ষমতাশালী ব্যক্তি রাবণ ও কংসের শরীরটাই উল্টে পড়ে গেল; অথচ সেই ঈশ্বরীয় শক্তিই আমাদের সামনে এসে উল্টে যায়। ঈশ্বরের কথা, ঋষিদের কথা, অবতারের কথা আমাদের কিছুই করতে পারে না; এই হল আমাদের ক্ষমতা, এই হল আমাদের শক্তি। তাহলে উপায় কি? খুব সুন্দর কথা বলছেন।

তাই গুরুর কৃপা হলে আর কোন ভয় নাই! তিনি জানিয়ে দেবেন, তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি?

একটু সাধন করলেই গুরু বুঝিয়ে দেন, এই এই। তখন সে নিজেই বুঝতে পারবে, কোন্‌টা সৎ, কোন্‌টা অসৎ। ঈশ্বরই সত্য, এ-সংসার অনিত্য।

'একটু সাধন' এই কথাটি খুব সুন্দর লাগে। একটু সাধন যদি করেন, গুরুই বুঝিয়ে দেবেন। সচ্চিদানন্দই আপনার গুরু, তিনিই বুঝিয়ে দেন তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি? তখন পরিষ্কার বুঝতে পারবেন কোনটা সৎ, আর কোন্‌টা অসৎ। ঈশ্বরই সত্য, এ-সংসার অনিত্য। কি করতে হবে? একটু সাধন। ঠাকুরের উপমা আছে, বড় গাছ যখন কাটা হয়, অনেকটা কাটার পর কাঠুরে ছেড়ে দেয় আর গাছ থেকে তফাতে সরে আসে। গাছটা নিজে থেকেই উল্টে পড়ে যায়। খাল কাটার সময়ও একই

জিনিস করা হয়, পুরোটা প্রায় কাটা হয়ে এলে শেষের দিকটা ছেড়ে দেয়। ভগবান আগে থেকেই সব কিছু করে রেখেছেন। আমার ছোটবেলায় গ্রামে দুটো জিনিসই দেখেছিলাম। খাল কাটায় একটু মাটি ছেড়ে রাখছে। আমার তখন ছয়-সাত বছর, তখনই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এতটা মাটি ছেড়ে রাখলে যে'? 'ওটা আর কাটতে হবে না, নিজে থেকেই মাটি সরে যাবে'। সংসাবৃক্ষ, এটাকে যে উপড়ে ফেলতে হবে, আমরা পারব না। সেইজন্য ঠাকুর পুরোটা করে একটু ছেড়ে দেন। ওই একটুকে একটু ধাক্কা দিলেই সংসারবৃক্ষ পুরোটাই খসে পড়ে যাবে। আমি, আপনি একটু সাধন করলেই সংসারবৃক্ষ উপড়ে যাবে। ঠাকুর খুব সুন্দর একটা গল্প দিয়ে উদাহরণ দিচ্ছেন।

এক জেলে মাছ চুরি করবার জন্য এক বাগানে জাল ফেলে মাছ চুরি করছিল। বাগানের গৃহস্থ টের পেয়ে গেছে যে ওর পুকুর থেকে কেউ মাছ চুরি করছে। চোরকে ধরার জন্য মশাল জ্বেলে লোকজন নিয়ে গিয়ে পুকুরটা ঘিরে ফেলল। চোর দেখলে আমি যদি ধরা পড়ে যাই, মারের চোটে আমি মরেই যাব। চোরটি সঙ্গে সঙ্গে তার জামা-কাপড়, মাছ ধরার সরঞ্জাম সব জলে ফেলে দিয়ে, মাটি মেখে একটা গাছের তলায় নকল সাধু সেজে ধ্যানে বসে গেল। যারা চোরকে খুজতে এসেছিল, তারা দেখছে গাছতলায় একজন সাধু ধ্যান করছেন। সবাই সাধুকে খুব সম্মান ও খাতির করতে লাগল। **এই যত লোক ফল ফুল সন্দেশ মিষ্টান্ন দিয়ে সাধুকে প্রণাম করতে এল। অনেক টাকা-পয়সাও সাধুর সামনে পড়তে লাগল। জেলেটা ভাবল, কি আশ্চর্য, আমি সত্যিকার সাধু নই, তবুও আমার প্রতি এত লোকের এত ভক্তি। তবে সত্যকার সাধু হলে নিশ্চয়ই ভগবানকে পাব, সন্দেহ নাই।** বোধ হয় ওর অল্প একটু বাকি ছিল।

স্বামীজী তাঁর কর্মযোগ বইতে প্রথমেই বলছেন, আমরা ভাল কাজ করি, মন্দ কাজ করি, সব কাজই আমাদের মনের উপর একটা ছাপ ফেলে, ওই ছাপ বা সংস্কার থেকে আমাদের চরিত্র তৈরী হয়। এই চরিত্রই আমাদের ধীরে ধীরে জ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়। এই যে জেলে, সে জ্ঞানের জন্য প্রস্তুত। আগের আগের জন্মে তার অনেক সাধনা করা আছে। এখন চোর হয়ে মাছ চুরি করতে গেছে। ধরা পড়ার ভয়ে সে নকল সাধু সেজে গাছতলায় ধ্যানে বসে গেল, আর তাতেই এত সম্মান, এত সৎকার। তাঁর এই হুঁশটা এসে গেল যে, আসল সাধু হলে তো আমি ভগবানের কাছে পৌঁছে যাব।

কপট সাধনাতেই এতদূর চৈতন্য হল। সত্য সাধন হলে তো কথাই নাই। একটু করলেই হয়, একটু করলেই গুরুর কৃপা এসে যায়। তখন ফল, ফুল, সন্দেশ, টাকা-পয়সা সব আসতে শুরু করে। **কোন্‌টা সৎ কোন্‌টা অসৎ বুঝতে পারবে। ঈশ্বরই সত্য, সংসার অনিত্য**।

একজন ভক্ত ভাবিতেছেন, সংসার অনিত্য? জেলেটি সংসারত্যাগ করে গেল। তবে যারা সংসারে আছে, তাদের কি হবে? তাদের কি ত্যাগ করতে হবে? 'একজন ভক্ত' মানে মাস্টারমশাই নিজের মনের কথাই হয়ত বলতে চাইছেন। ওনার মনে সব সময় নিজের অবস্থাটা ঘুরত। **ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন –যদি কেরানিকে জেলে দেয়, সে জেল খাটে বটে, কিন্তু যখন জেল থেকে তাকে ছেড়ে দেয়, তখন সে কি রাস্তায় এসে ধেই ধেই করে নেচে নেচে বেড়াবে? সে আবার কেরানিগিরি জুটিয়ে লেয়, সেই আগেকার কাজই করে। গুরুর কৃপায় জ্ঞানলাভের পরেও সংসারে জীবনমুক্ত হয়ে থাকা যায়।**

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী লোকেদের অভয় দিলেন।

সংসারে থাকা মানেই এই না যে আপনি একজন নিকৃষ্ট মানুষ। ঠাকুর কেরানির উদাহরণ দিচ্ছেন, কেরানিগিরি করছিল, কোন বদমাইশি করেছিল নিশ্চয়; জেল হল, জেল খাটল, জেল থেকে ছাড়া পেল। এখন জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর হয়ত সে আনন্দ নৃত্য করেছিল। কিন্তু কতদিন আর নৃত্য করে বেড়াবে; আবার সে একটা কেরানির চাকরি খুঁজে নিয়ে কেরানিগিরিই করবে। সংসারে যিনি থাকবেন তাঁকে সংসারের মত থাকতে হবে। অবতার যদি আসেন, তাঁকেও সংসারে এসে সংসারীদেরই

মত থাকতে হয়। শ্রীরামচন্দ্র রাজা হয়ে রাজ্য চালিয়ে ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কি না করতেন। রাজা জনক ছিলেন জ্ঞানীপুরুষ, তিনি রাজ্যপাট চালিয়েছেন। যিনিই সংসারে আসেন, সবাইকে সংসারে কিছু না কিছু একটা নিয়ে থাকতে হয়; সেইজন্য যে সংসার ত্যাগ করতে হবে, তা নয়।

বলছেন, **গুরুর কৃপায় জ্ঞানলাভের পরেও সংসারে জীবনমুক্ত হয়ে থাকা যায়**। আমাদের অতও দরকার নেই, সাধারণ একটু হলেই হল। সেটা কি? একটু সাধন করলেই হবে। গুরুই সব বুঝিয়ে দেবেন, গুরুকৃপা হলে আর কোন ভয় নাই। বাঘ ছাগলের মধ্যে, সিংহ ভেড়ার মধ্যে; ছাগল বা ভেড়াকে যতই বলা হোক সেই নিজেকে কখন বাঘ সিংহ মনে করবে না। 'জঙ্গলজেন শেরু' ইংলিশে আমার বই আছে, এই ভাবটাকে নিয়েই আমি লিখেছিলাম। দেখানো হয়েছে, কিভাবে আমরা নিজেদের নিচের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। শেরু সিংহ শাবক। জঙ্গলে তার কত গুরু রয়েছে, কিন্তু কেউ কিছু করতে পারছে না। শেষে সিংহের বাচ্চা একটা কাপুরুষ হয়ে শেষ হয়ে গেল। সেখানে মুক্তাক আর কূর্মের চরিত্র আছে, মুক্তাক হল হাতি আর কূর্ম হল কচ্ছপ। কূর্ম হাতিকে বলছে, এক সিংহই শেরুকে সিংহ বানাতে পারবে, আমি তুমি যত চেষ্টাই করি না কেন, সিংহ কোন দিন বানাতে পারব না। আপনার আশেপাশে যঁরা আছেন, এনারা কেউই আপনার ভিতরের সিংহত্বকে জাগাতে পারবেন না, জাগাতে পারে একমাত্র শাস্ত্র। শুধু আপনার 'আমি করব না' এই মনোভাবকে যদি ছেড়ে দেন। একটু যদি চেষ্টা করা হয় তাতেই অনেক কিছু হয়ে যাবে। এই চেষ্টা আনন্দ পাওয়ার জন্য না, নিয়ম রক্ষার জন্য চেষ্টা না, করতে বলেছেন, তাই করছি, সেটার জন্য চেষ্টা না। এই চেষ্টা ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দেওয়ার জন্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও নিরাকারবাদ

মণিলাল (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) –আহ্নিক করবার সময় তাঁকে কোন্‌খানে ধ্যান করব?

আহ্নিক হল নিত্যকর্ম, সন্ধ্যাবন্দনাদি। সন্ধ্যাবন্দনাদি হল হিন্দুদের পরম্পরাগত নিত্যকর্মের সাধনা। বৈদিক কালে এটাকেই অগ্নিহোত্র বলা হত। যাঁরা দ্বিজ, তাঁরা গুরুর কাছে গিয়ে শিক্ষা নিতেন। সেখানে ওনারা গুরুর কাছে গায়ত্রীমন্ত্রাদি পেতেন। বাড়িতে পবিত্র অগ্নি থাকত, সেখানে নিত্য আহুতি দিতেন, এটাকেই অগ্নিহোত্র বলা হত। ধীরে ধীরে অগ্নিহোত্রাদি অর্থাৎ অগ্নিকর্ম প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়ে সন্ধ্যাবন্দনাতে চলে এল। এরপর হিন্দু ধর্ম যখন আরও বিস্তার হয়ে গেল, সবাইকে যখন এক সঙ্গে টেনে আনা হল, তখন অগ্নিহোত্র জিনিসটা উঠেই গেল। সন্ধ্যাবন্দনা ব্রাহ্মণরা তো করতেনই এবং আরও অনেকেই করতেন, কিন্তু ইষ্টমন্ত্রের জপ করতেন। যদিও ইষ্টমন্ত্রের বর্ণনা আমরা ভাগবত আদি গ্রন্থেও পাই। এখন সন্ধ্যাবন্দনা জিনিসটা পুরো ইষ্টমন্ত্র জপে চলে গেছে।

পৈতার অধিকার সবারই। এটাকে নিয়ে আমরা আগেও অনেক জায়গায় আলোচনা করেছি। ঋষিরাও পৈতার এমন কোন সীমা নির্ধারণ করে দেননি যে শুধু ব্রাহ্মণরাই উপবীত ধারণ করবেন। শুধু এটাই ছিল –পৈতা হল গায়ত্রী, গায়ত্রী হল বেদ অধ্যয়নের অধিকার। বেদ অধ্যয়ন করার অধিকার সবারই ছিল। তবে আগেকার দিনে বেদ অধ্যয়ন সবার জন্য সম্ভব হয়ে উঠত না, বিদ্যার যে একটা সংস্কৃতি সেটা সেভাবে ছিল না, সমাজে তখন অভাব ছিল বলেই সবাই পেরে উঠতেন না। যা হয়, সব কিছু খোলামেলা যদি না থাকে ধীরে ধীরে মন সঙ্কুচিত হয়ে যায়। যেভাবেই হোক ভারত এখন সব দিক খুলে গেছে, কিছুটা বিদেশীদের অবদানের জন্য, কিছুটা বিদ্যার প্রচার প্রসারের জন্য। আর সমাজের একটা স্বাভাবিক গতি আছে, যার জন্য আমাদের নিজেদের সংবিধান হয়েছে। সমাজ সবাইকার জন্য বিদ্যার দরজা খুলে দিয়েছে। আম্বেদকরজী, নেহরুজী এনাদের সবারই এতে অবদান আছে।

আমার এক বন্ধুর খুব ইচ্ছে হয়েছিল নিজের মেয়েকে পৈতে দেবে। আমাকে জিজ্ঞেস করে ছিল, আমি বললাম আরামসে দিয়ে দিন। পূজারীর কাছে গেলেন। পূজারী করালেন, মেয়েকে পৈতে

দিলেন। তবে বললেন, আমাদের সমাজ এই জিনিস গ্রহণ করবে না, একবার পৈতাটা পরে নিয়ে ছেড়ে দেবেন, গায়ত্রীমন্ত্র যেমন জপ করার করবে। ভদ্রলোক একটু বেশি খোলামেলা, মেনে নিলেন। আহ্নিক, সন্ধ্যাবন্দনা সেই পরম্পরা থেকে এসেছে। হিন্দুদের কাছে এখন দু-বেলা জপধ্যান, কুলদেবতার পূজা, ইষ্টদেবতার পূজা এগুলো আবশ্যক নিত্যকর্মের মধ্যে এসে গেছে। আমাদের সন্ন্যাসীদে উদ্দেশ্য করে অনেকে ইউটিউবে কমেন্ট করেন –এগুলো আপনারা করতে পারেন, কারণ আপনাদের তো কোন কাজ নেই, মঠের খাউছি খট্টর শোইছি। কিছু না জেনে, না বুঝে সব কমেন্ট করে। আমাদের যিনি প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যের যিনি মুখ্যমন্ত্রী, এনারাও রোজ স্নান করেন, রোজ দাঁত মাজেন। আমাদের রাষ্ট্রপতি ছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে তিনি অনেক দপ্তরের মন্ত্রীত্বের দায়ীত্বে ছিলেন। কত ব্যস্ত জীবন, কিন্তু তার মধ্যেও তিনি চণ্ডীপাঠ না করে কোন দিন ঘুমোতেন না। কি করে তিনি এই ব্যস্ততার মধ্যে সময় বার করতেন ভাবলে অবাক হতে হয়। আর অভ্যাস না থাকলে ওই বৃদ্ধ বয়সে কি ওইভাবে দিনের পর দিন চণ্ডীপাঠ করতে পারতেন? কোন অজুহাত দিতে নেই, সবাইকেই এগুলো নিত্য করতে হয়, করার জন্য আপনাকেই সময় বার করে নিতে হবে। ট্রেনে বা বাসে যাচ্ছেন, ওখানেই ওপেনলি করতে করতে যান না, কোন অসুবিধা নেই। অন্যান্য ধর্মের লোকেরা তো রাস্তাতেই ধর্মাচরণ করছে, আপনিও করুন। এগুলো করতে হয়, দৈনন্দিন অনেক অসুবিধা থাকবে ঠিকই, তাও করতে হয়।

আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট পূজ্যপাদ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ মজা করে একটা ঘটনা বলতেন। একবার ট্রেনে কোথা থেকেও আসছিলেন, থ্রী-টায়ার স্লীপার কোচ। ভোর হয়েছে। পাশের বার্থ থেকে একজন সহযাত্রী বলছে –'আরে বাবাজী, শোতেই রহোগী? জপধ্যান কব্ করোগে'? মহারাজ রাস্তাঘাটে লোক দেখানো কোন কিছু করেন না। উনি একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বসব তো ঠিকই, কিন্তু এখানে বসার জায়গা কোথায়'? সন্ধ্যাবন্দনা করার সময় হলে অবশ্যই যেখানে থাকবেন সেখানেই করবেন, লোকেরা দেখুক। কিছু লোক হয়ত টিটকারি মারবে, প্যাঁক দেবে; সেতো আমাদের সন্ন্যাসীদের রাস্তাঘাটে কত কথাই শুনতে হয়। একটা মজার ব্যাপার হল, কোন খ্রীশ্চান ফাদার যদি ট্রেনে বা বাসে বা কোথাও বাইবেল পড়তে শুরু করে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা বলি, আহা কি ভক্তি। কোন মুসলমান যদি রাস্তায় বা ট্রেনে তোয়ালে বিছিয়ে নমাজ পড়তে শুরু করে, আমরা বলি আহা কত ভক্তি। হিন্দুরা কিছু করতে শুরু করলে বলবে, ব্যাটা ঢং করছে। আমাদের ধর্মকে আমরা কোথায় নিয়ে চলে গেছি। এখানে প্রশ্ন হল, আহ্নিক করার সময় তাঁকে কোন জায়গায় ধ্যান করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ –হৃদয় তো বেশ ডঙ্কামারা জায়গা, সেইখানে ধ্যান করো।

আগেকার দিনে বেশির ভাগ সাধক হয় হৃদয়ে আর না হলে ভ্রু-মধ্যে বা কপালে ধ্যান করতেন। তবে ভ্রু-মধ্যে বা কপালে ধ্যান করতে নেই। শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজীর একটা সময় জপ করতে বসলেই খুব মাথা ব্যাথা করত। মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বলতে গেছেন, 'মা, আমার মাথাটা......'। বলার আগেই মা বলতে শুরু করেছেন, 'বাবা, মাথায় ধ্যান করো না, সব সময় হৃদয়ে ধ্যান করবে'। এর বেশি কিছু বললেন না। এই হলেন গুরু, সমস্যা বলার আগেই মা বুঝে গেছেন সন্তানের কোথায় সমস্যা। গীতাতে কয়েক জায়গায় নাসিকাগ্রে, ভ্রু-মধ্যে ধ্যানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হৃদয় খুব নিরাপদ স্থান। সেইজন্য রামকৃষ্ণ মিশন থেকে যে দীক্ষা দেওয়া হয় সেখানে হৃদয়েই ধ্যান করার কথা বলা হয়। আধ্যাত্মিক যাত্রা এখান থেকেই শুরু হয়, কুণ্ডলিনী এখান থেকে জাগেন।

এরপর থেকে যে ঠাকুরের কথাগুলো শুরু হচ্ছে, সেই কথাগুলো আলোচনা করার আগে দর্শন নিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা দরকার মনে করি। যে কোন দার্শনিকের যে দর্শনের উপর তাঁর কাজ, সেই দর্শনকে ঠিক ঠিক একমাত্র সেই দার্শনিকই বুঝতে পারেন। সক্রেটিস হন, এ্যরিস্টটল হন, যে কোন দার্শনিকের দর্শনের উপর যে কাজ, ওটাকে একমাত্র তিনিই ঠিক ঠিক বোঝেন। আর যাঁরা মনে করেন 'আমি বুঝে নিয়েছি', তাঁরা মুর্খ। এটা অনেক কারণেই হয়। প্রথম একটা কারণ, যিনি একজন

দার্শনিক, তিনি যা যা ভাবছেন তার সব কথা তো তিনি লেখেন না। ঠাকুর বলছেন, আমি ফরাস করা মেজে, নিচে কত কি আছে কেউ জানে না। আপনি কাউকে চিঠি লিখছেন, আপনার মনে যা যা ভাবনা আছে, সব কথা তো আপনি চিঠিতে লিখছেন না। চিঠিতে যেটা প্রকাশ পাচ্ছে, সেটা হল মেজে করা ফরাস। আপনার ভিতরে কি আছে, নিচে কত কি জমা আছে কেউ জানতে পারবে না। যিনি ফিলজফার, তিনি চিন্তার জগতে এত উপরে চলে গেছেন যে, যতটা অপরে বুঝতে পারে, ঠিক ততটাই তিনি সেখান থেকে অপরের জন্য ছাড়েন। কিন্তু তার পিছনে যে তাঁর চিন্তা-ভাবনা, এটা একমাত্র তিনিই জানেন। সেইজন্য কোন ফিলজফারকে বোঝা যায় না।

আধ্যাত্মিক জগতে একজন আধ্যাত্মিক পুরুষকে জানা আরও কঠিন। স্বামীজী বলছেন – আর-এক বিবেকানন্দ জন্ম নিলে বুঝতে পারবে আমি কি কাজ করেছি। ঠাকুরও বলছেন –কাকেই বা বলব, কেই বা বুঝবে। কারণ আধ্যাত্মিক পুরুষের কাছ থেকে আমরা যে শব্দগুলো পাচ্ছি, এটা অনেকটা সেই হাতির সামনের দিকের যে দুটি দাঁত বেরিয়ে আছে, তার মত, আসলটা ভিতরে। এখানে আমি যে জিনিসগুলো ব্যাখ্যা করছি, এই কথাগুলো আমার বুদ্ধিতে বলছি। যে কেউ যখন কথামৃত ব্যাখ্যা করেন, সেই ব্যাখ্যাটা তিনি তাঁর বুদ্ধি থেকে বলছেন। ঠিক ঠিক ঠাকুরের স্তরে গিয়ে বোঝা খুব কঠিন। আর-একটা হল, স্কুলের যে ছাত্র পড়াশোনা করছে, তার বুদ্ধিকে তার শিক্ষক বুঝতে পারেন। কিন্তু যিনি দার্শনিক হন, তাঁর কেউ শিক্ষক হন না। কারণ দার্শনিক নিজের এলাকাতে অনেক উপরে চলে গেছেন; তাঁর থেকে বড় কেউ হতে পারেন না। ধর্ম জগতে ঠিক একই জিনিস হয়, আমাদের পক্ষে অবতারের বা সন্ত-মহাত্মাদের সমস্ত কথা বোঝা সম্ভব না। এই যে আমরা শাস্ত্রের ক্লাশ নিচ্ছি, এটা একটা ধর্মচিন্তন, একটা ধর্মপ্রসঙ্গ। গীতায় ভগবান বলছেন, *কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ* –আমার ভক্তরা আমারই কথা শোনে, আমারই কথা বলে। সেই ঠাকুর কথামৃতে এত উপদেশ দিচ্ছেন, সেই কৃষ্ণ, সেই ঠাকুর। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই জিনিসগুলো জীবনে নামানো কঠিন। তবে এর মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কটা বজায় থাকে, তাঁর সঙ্গে জুড়ে থাকা যায়।

মণিলাল ব্রহ্মজ্ঞানী, নিরাকারবাদী। ঠাকুর তাঁহাকে লক্ষ করিয়া বলিতেছেন, "কুবীর বলত, সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ। কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী"।

কেশবচন্দ্র সেন যতই হোক, ঠাকুরের তুলনায়, স্বামীজীর তুলনায় আসবেন না। হাভাতে কি রকম হয়? হাওয়া মিঠাই-এর মত, একটু চিনি দিয়ে দেয় আর হাওয়া মিঠাই হয়ে যায়। বাচ্চারা ওই দেখে খুব খুশি হয়। হাভাতে হল হাওয়া মিঠাই। এনারা নিজের সময় খুব বিখ্যাত হন। যেমন যেমন সময় এগিয়ে চলে যায়, তাঁরা আর দাঁড়াতে পারেন না। ভেবে দেখুন সেই সময় এই ব্রাহ্ম সমাজ কলকাতার বুকে একেবারে ঝড় বইয়ে দিচ্ছে। সেই সময়কার যত লেখাপড়া জানা লোক, সংস্কৃতিবান মানুষ সবাই ব্রাহ্ম সমাজে গিয়ে নাম লেখাচ্ছে। তাদের মধ্য থেকে মুষ্টিমাত্র কয়েকজন ঠাকুরের কাছে আসছেন। ঠাকুর তাদেরও ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলো বোঝাতে পারছেন না, সময় লাগছে। আজকে আমরা খুব সহজে বলে দিতে পারছি নিরাকারও যা, সাকারও তাই। কিন্তু তখনকার সময় লোকেদের এই কথা বোঝান খুব শক্ত কাজ ছিল, ঠাকুর চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

হলধারী দিনে সাকারে, আর রাতে নিরাকারে থাকত। তা যে ভাবই আশ্রয় কর, ঠিক বিশ্বাস হলেই হল। সাকারেতেই বিশ্বাস কর, আর নিরাকারেই বিশ্বাস কর, কিন্তু ঠিক ঠিক হওয়া চাই।

আমাদের সব মুখের কথা। আমি স্বামীজীর রচনাবলী পড়ি, আমি অমুক সেন্টারে যাই, কেদারনাথ ঘুরে এসেছি; এগুলো সব স্ট্যাটাস সিম্বল। একটা অবস্থার পর নিজের জন্য শুধু একটা নুডুন হলেই হয়ে যায়। আমাদের যে চারটে আশ্রমের কথা বলা হয় –ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস; এই চারটে আশ্রম সবার জীবনেই প্রযোজ্য। ছেলেবেলা তো পেরিয়ে গেছে; আমার তো মনে হয় না কোন বাচ্চা ছেলে আমাদের এই ক্লাশগুলো শোনে। ওরা এখন ধ্যান, একাগ্রতার দিকে জোর দিতে চাইছে;

ঠিক আছে বাচ্চা ছেলে জগৎকে জয় করতে চাইছে। আপনাদের অনেকে আছেন সংসার চালাচ্ছেন, শুধু নিজের সংসার না, পুরো সংসার আপনার উপর নির্ভর করে আছে। এই যে বড় বড় আশ্রম, ছোট ছোট আশ্রম, সাধু, সন্ন্যাসী, কাঙালী, ভিখারী সব আপনার উপর নির্ভর করে আছে।

যেই পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলেন, এবার সোসালাইজিং কম করতে থাকুন, যতটা কমাতে পারেন সোসালাইজিং কমিয়ে দিন। কারণ পয়ষট্টি হতে না হতে সব কিছু থেকে যদি গুটিয়ে না নিতে পারেন, বাণপ্রস্থী যদি না হতে পারেন, আপনাকে যে কি কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে কল্পনা করতে পারবেন না। আপনার আশেপাশে তাকিয়ে দেখুন, পয়ষট্টি হয়ে গেছে কিন্তু মন এখনও ঘোড়ার মত দৌড়াচ্ছে, কিন্তু শরীরটা চলছে শামুকের মত। শরীর এখন শামুকের মত, মন ঘোড়ার মত; কিন্তু কুড়ি বছরে শরীরটাও ঘোড়ার মত চলে, মনটাও ঘোড়ার মত চলে। যখন শরীর আর টেক্কা দিতে পারবে না, তখন মনে হবে জগতের সব সুখ অপরেই ভোগ করে যাচ্ছে। এই মানসিকতা নিয়ে চললে প্রচুর সমস্যা আসবে, এখন সব কিছু থেকে গুটিয়ে নিয়ে আসুন। আমরা অনেক মহারাজদের দেখেছি, প্রথম জীবনে কাজেকর্মে কি প্রচণ্ড ভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন, কিন্তু একটা বয়সের পর থেকে সব কিছু থেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। এখন তিনি জানেনও না আশপাশে কি হচ্ছে। এরপরে একটা প্রসঙ্গ আসবে, সেখানে দেখাবেন এই শরীরের কোন দাম নেই।

ফলে কি হয়, যে জিনিসটা করছেন সেই জিনিসটার প্রতি বিশ্বাস। যাকে আপনি কোনদিন দেখেননি, যাকে স্বপ্নেও কোনদিন দর্শন করেননি, কি করে তাকে বিশ্বাস করবেন। ঠাকুরকে কি করে আপনি বিশ্বাস করবেন, এটা কি সম্ভব? আমাকে অনেক ইয়ং ছেলেমেয়েরা এসে জিজ্ঞেস করে, 'মহারাজ আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন'? আমার সোজা-সাপ্টা উত্তর, 'না ভাই, কি করে বিশ্বাস করব? তাঁকে কোন দিন দেখিনি, তাঁর সঙ্গে কথা হয়নি, তাঁকে স্পর্শ করিনি, কি করে বিশ্বাস করব তাঁকে'? তাহলে কিসে বিশ্বাস করতে হবে? গুরুবাক্যে। আপনি গুরুকে তো দেখেছেন, গুরুকে তো সম্মান করেন। যাঁরা রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা কিছু না হোক দুজন সন্ন্যাসীকে তো সম্মান করেন, বিশ্বাস করেন। তাঁর কথাকে কি বিশ্বাস করেন? জগতে এত লোককে বিশ্বাস করছেন, দুজন ভাল মানুষকে বিশ্বাস করতে আপনার সমস্যা কোথায়?

গুরুবাক্যে যখন বিশ্বাস হয়, এই বিশ্বাসকে নিয়ে যখন এগোতে শুরু করলেন, তখন মনের জগতে আপনি ঠাকুরকে আপনার মত করে দাঁড় করিয়ে নিন। তখন ঠাকুর বাস্তব হয়ে সেখানে চলে আসেন। তখন ঠিক ঠিক বিশ্বাস হবে ঠাকুর আছেন। তার আগে পর্যন্ত দুজন মহারাজকে জানেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস; যাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন, তাঁর কথায় বিশ্বাস, কথামৃতে বিশ্বাস, স্বামীজীর বাণীতে বিশ্বাস; এই বিশ্বাসকে অবলম্বন করে একটা মনের জগৎ দাঁড় করিয়ে দেওয়া। এই মনের জগৎ যেমনি দাঁড়িয়ে গেল, তেমনি ওই মনের জগৎকে আশ্রয় করে মনটা একেবারে টগবগ করতে আরম্ভ করবে, তখন সেখানে ঠাকুর বাস্তবে আসেন।

তাতেও প্রশ্ন উঠতে পারে; ঠিক আছে, প্রশ্ন উঠলেও তাতে কোন অসুবিধা নেই। ঠাকুর বলছেন, সাকারেতেই বিশ্বাস কর, আর নিরাকারেই বিশ্বাস কর, তাতে কোন দোষ নাই –এখানে 'বিশ্বাস' বলতে ঠাকুর ওই কথাগুলোকে বিশ্বাস করতে বলছেন। আপনি বেদ পড়েছেন, উপনিষদ পড়েছেন, গীতা পড়েছেন, পাঁচজন সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ করেছেন, ওই কথায় বিশ্বাস করা। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাস তখনই হয় যখন সাক্ষাৎ দর্শন হয়, দর্শন না হওয়া পর্যন্ত এই বিশ্বাস হতে পারে না। তার আগে এই বিশ্বাসের জগৎ দাঁড় করানোটা প্রথম পদপেক্ষ। একবার দাঁড়িয়ে গেলে সংশয়, অবিশ্বাস এগুলো বেশি আসবে না। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে, এটা কল্পনার জগৎ, এখানে শুধু শ্রদ্ধা নিয়ে চলা। এরপর ঠাকুর শম্ভু মল্লিকের কথা বলছেন। খুব সুন্দর ঘটনা।

শম্ভু মল্লিক বাগবাজার থেকে হেঁটে নিজের বাগানে আসত। কেউ বলেছিল, 'অত রাস্থা, কেন গাড়ি করে আস না, বিপদ হতে পারে'। তখন শম্ভু মুখ লাল করে বলে উঠেছিল, 'কি, তাঁর নাম করে বেরিয়েছি আবার বিপদ'।

এখানে দুটো কথা। প্রথম, এই যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র নিয়ে কত কথা বলা হয়; শম্ভু মল্লিক কিন্তু ব্রাহ্মণ নন, কিন্তু ভক্তিতে কোন ঘাটতি নেই। তাঁদেরও পয়সা-কড়ি ছিল, তাও নিষ্ঠা ছিল। দ্বিতীয়, এনাদের যে ধরণের বিশ্বাসের কথা ঠাকুর বলছেন, কোন বিপদ যদি হয়েও যায়, এনারা মেনে নেবেন। সবই ঠাকুর করছেন, ঠাকুর সবই দেখছেন, এই প্রকার যে বিশ্বাস, যাঁরা খুব উচ্চমানের, এই ধরণের বিশ্বাস তাঁদেরই হয়। যিনি দেখে নিয়েছেন, যেমন গীতায় ভগবান কি সুন্দর বলছেন, *যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে। হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তিন নিবধ্যতে।।* যখন জেনে নিয়েছেন আত্মাই সব, কে কাকে মারবে? যখন দেখে নিয়েছেন ঈশ্বরই কর্তা, আমি তো কর্তা নই, তখন তাঁদের আর কোন কিছুতেই কিছু আসে যায় না। তার আগে পর্যন্ত এগুলো হল সব মুখের কথা। কিন্তু মুখের কথায় বিশ্বাস, বাচ্চা ছেলে যেমন মাকে বিশ্বাস করে, মায়ের মুখের সব কথাকেই সে বিশ্বাস করে। ঠিক সেই রকম সরল বালকের ন্যায় বিশ্বাস –ঠাকুরই সব করছেন, ঠাকুরই সব দেখছেন।

আপদ-বিপদ যখন হয়, দুঃখ-কষ্ট যখন আসে, তখন এই ভাবটাকে জাগিয়ে রাখা; কেঁদে কেঁদে না, শান্ত মনে। অসুখ হলে ডাক্তার ওষুধ দেন, দরকার হলে সার্জারি করেন, কখন-সখন কোন অঙ্গ কেটে বাদ দিয়ে দেন, না বাদ দিলে রোগ সারা শরীরে ছড়িয়ে যাবে। যে রোগী, সে জানে ডাক্তারবাবু আমাকে সুস্থ করে তোলার জন্যই এ-সব করছেন। ঈশ্বরের ব্যাপারে এই রকম একটা ধারণা আনতে হবে। আমাদের মন ভালকে নিয়ে, সুখকে নিয়ে এমন হয়ে গেছে যে, খারাপ কিছু হলে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা দেখতে পারি না; চেঁচামেচি করতে শুরু করি। করোনা যখন শুরু হল, লোকেরা বলতে লাগল, ভগবান এ কি করলেন! আরে ভাই মৃত্যুটা কি ভগবানের নয় নাকি? কষ্ট যেটা আসছে সেটা কি ভগবানের নয়? শম্ভু মল্লিকের এই ভাব –যদি বিপদ হয়েও যায়, তিনি মেনে নেবেন ঈশ্বরই এই বিপদ আমার ভালর জন্যই করেছেন।

ঠাকুর এবার বলছেন, সাথে নিজের কথাও বলছেন –**বিশ্বাসেই সব হয়। আমি বলতুম, অমুককে যদি দেখি, তবে বলি সত্য। অমুক খাজাঞ্চী যদি আমার সঙ্গে কথা কয়! তা যেটা মনে করতুম, সেইটেই মিলে যেত**।

ঠাকুরের সারা জীবনই এই বালকভাবটা ছিল, মায়ের সাধনা করেছিলেন কিনা। মায়ের দর্শন হয়েছে, সবই হয়েছে, তবুও মায়ের পরীক্ষা করে যাচ্ছেন –অমুককে যদি দেখি, অমুক খাজাঞ্চী যদি আমার সঙ্গে কথা কয়। ঠাকুর অতি সাধারণ মানুষ, খাজাঞ্চী অফিসের একজন বড় কর্মচারী, সে যদি এই অতি সাধারণ লোকের সাথে কথা কয়। সব কিছুই মিলে যেত। রাজযোগে দুটি মনের কথা বলছেন –সমষ্টি মন আর ব্যষ্টি মন। ব্যষ্টি মন মানে নিজের মন। জগৎ যখন চলে তখন ব্যষ্টি মনকে নিয়েই চলে। সমস্ত ব্যষ্টি মন মিলে হয় সমষ্টি মন। সমষ্টি মনেরই অঙ্গ ব্যষ্টি মন। কখন কখন এমন অবস্থা হয়, যখন ব্যষ্টি মন সমষ্টি মনের সঙ্গে মিশে যায়। তখন ওই অবস্থায় আপনি অন্যের মনকে জানতে পারবেন, অজান্তায় অন্যের মনকে প্রভাবিত করতে পারবেন। তবে বেশিক্ষণ ওই অবস্থায় থাকা যায় না, বেশিক্ষণ থাকলে মন লীন হয়ে যাবে। কিন্তু যাঁরা যোগী, যাঁরা ওই স্তরে চলে গেছেন, তাঁদের এটা হয় এবং পার্মানেন্টলি থাকতে পারেন। কিন্তু যাঁরা দেহ ধারণ করে আছেন, যেমন ঠাকুর, ওই অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকলে শরীরই চলবে না। মাস্টারমশাই ইংরাজী পড়া লোক, তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন।

মাস্টার –আচ্ছা, কোন কোন ঘটনা মেলে নাই, এমন কি হয়েছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ –না, সে-সময় সব মিলত। সে-সময় তাঁর নাম করে যা বিশ্বাস করতুম, তাই মিলে যেত। (মণিলালকে) তবে কি জানো, সরল উদার না হলে এই বিশ্বাস হয় না।

সরল না হলে ঈশ্বরেই বিশ্বাস হবে না। ইউটিউবের সৌজন্যে আমি অনেক ইয়ং ছেলেমেয়েক জানি, যারা এই ক্লাশগুলো শোনে। ওদের বাবা-মার ওই একই কথা –আবার ওই বুড়ো লোকটার কথা শুনছিস? মনটা এদের কত বিষিয়ে রয়েছে, নিজের ছেলেমেয়েরা, আর এরা কেউ এখন বাচ্চা তো নয়, আঠারো কি আঠারোর উপর বয়স, তারা শুনছে ধর্মের কথা, তাতেই বাবা-মায়ের এত আপত্তি।

হাড়পেকে, কোটরচোখ, ট্যারা –এরকম অনেক লক্ষণ আছে, তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না। শরীরের লক্ষণ দিয়ে যে হয়, ঠাকুর এগুলো পুরো মানতেন।

শরীরের লক্ষণ নিয়ে অনেক কিছু আছে, চোখ এমন হলে কেমন হয়, কপাল এমন হলে কেমন হয়; আগেও আমরা এর আলোচনা করেছি। আমরাও ছোটবেলা কেউ এলে জিজ্ঞেস করতুম, আচ্ছা আমাকে দেখে কি বুঝছেন? কেউ ভাল বললে ভালো তো লাগে। ঠাকুরও বলতেন, আমাকে দেখে তোমার কি মনে হয়? কিন্তু বেশির ভাগ লোক, বিশেষ করে বর্তমান কালের লোকেদের বিশ্বাস করানো যাবে না। এরপর ঠাকুর একটা গ্রাম্যকথা বলছেন **'দক্ষিণে কলাগাছ উত্তরে পুঁই, একলা কালো বিড়াল কি করব মুই'**। অশুভ লক্ষণগুলিকে নিয়ে বলা হচ্ছে, এগুলো গ্রাম্যকথা; ঠাকুর সবটাই মানতেন।

এরপর শুরু হয় ভগবতী দাসীকে নিয়ে খুব নামকরা ঘটনা। ভগবান একাধারে সর্বশক্তিমান, করুণাসাগর, কৃপাসিন্ধু আর পতিতপাবন। ঠাকুরের জীবনের সাথে জড়িত অনেক ঘটনা আমরা পড়ি, শুনি। নটি বিনোদিনীর কথা, গিরিশচন্দ্রের কথা, আরও অনেকের কথা ঠাকুরের জীবনীতে আমরা পড়ি। কিন্তু কথামৃতে সরাসরি যে ঘটনা এসেছে, তা হল, এই ভগবতী দাসীর বর্ণনা। ঘটনাটা খুবই স্পর্শকাতর, কারণ এই ধরণের ঘটনাতে আচমকা অনেক কিছু হয়। ব্যক্তিগত ভাবে এই ঘটনাটা আমার কাছে খুব টাচিং, আর কথামৃতে খুব জোরাল ভাবে ঘটনাটা জায়গা করে নিয়েছে। লীলাপ্রসঙ্গেও এই ধরণের অনেক ঘটনা পাই।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে জয়েন করার পর দুই-এক বছর হয়ে গেছে। আমি দেওঘর বিদ্যাপীঠে জয়েন করেছিলাম, দেওঘর আশ্রম হল স্কুল সেন্টার। সেইজন্য দেওঘর সেন্টারে সারা বছর অনেক ধরণের প্রোগ্রাম হতে থাকে, ঠাকুর, মা, স্বামীজীর তিথি পূজাতো আছেই, তার বাইরে নেতাজী জয়ন্তী, গান্ধী জয়ন্তী হত। ঠাকুরকে নিয়ে রোজ সন্ধ্যেবেলায় একটা প্রোগ্রাম হত। হঠাৎ দেখা গেল কোন কারণে ইংরাজী বক্তা নেই। স্বামী সুহিতানন্দজী তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন আর স্বামী চন্দ্রনাথানন্দজী সেক্রেটারী ছিলেন, তিনি গত হয়েছেন। হঠাৎ সুহিতানন্দজী আমাকে তুলে দিয়ে বলছেন, 'তুই যা, ঠাকুরের সম্বন্ধে বলবি'। 'ঠাকুরের ব্যাপারে আমি কি বলব, কিছুই জানি না, কি বলব? ভিতরে একটা ভাব তৈরী হবে, সেই ভাব জমবে, তবে না ঠাকুরের ব্যাপারে বলা যাবে। আমি বুঝতেই পারছি না কি বলব'। তখন সুহিতানন্দজী মহারাজ আমাকে ভগবতী দাসীর এই ঘটনাটাই বলেছিলেন। আমি এটাই ভাবি, মহারাজের তখন খুব বেশি বয়স হবে না, খুব বেশি হলে চল্লিশ বেয়াল্লিশ হবে। কিন্তু কেমন এই ভাবে টগবগ করছেন যে, মুহুর্তের মধ্যে তিনি আমাকে ভগবতী দাসীর পুরো বর্ণনা করে দিলেন। ভগবতী দাসী ঘটনাটা শোনার পর আমার মনে হল, এর মধ্যে বলার কি আছে। তখন সুহিতানন্দজী আমাকে বোঝাচ্ছেন, এই যে ঠাকুর ভগবতী দাসীকে গান শোনাচ্ছেন, এই ভালবাসা। ঘটনাটা মনে আমার গেঁথে গেল। আমরা যে ঠাকুরকে অবতার রূপে দেখি, অবতারের অনেকগুলো দিক থাকে, যার মধ্যে অনেক কিছুই আমরা সব সময় বুঝতে পারি না।

মূল কথা হল, ভগবতী দাসী আগে জানবাজারে রানী রাসমণীদেবীর বাড়িতে কাজ করতেন। প্রথম বয়সে ওনার চরিত্র একটু অন্য রকম ছিল। কোথায় কিসে খারাপ হয়, কোথায় কিসে ভাল হয়,

এগুলো খুব জটিল জিনিস। বড় বড় লেখকরা বিভিন্ন ভাবে আমাদের সামনে এই ধরণের ঘটনা উপস্থাপিত করেছেন। যাকে আমরা খারাপ মনে করি, সে খারাপ নাও হতে পারে; আবার যাকে ভাল মনে করছি, সে ভাল নাও হতে পারে। আমরা অত বিস্তারে যাচ্ছি না, এখানে যেমনটি বর্ণনা আছে তেমনটি ধরে এগিয়ে যাব।

কথামৃতকার বর্ণনা করছেন –**কিয়ৎক্ষণ পরে বাবুদের দাসী ভগবতী আসিয়া দূর হইতে প্রণাম করিল। ঠাকুর বসিতে বলিলেন। ভগবতী খুব পুরাতন দাসী। অনেক বৎসর বাবুদের বাড়িতে আছে। ঠাকুর তাহাকে অনেকদিন ধরিয়া জানেন। প্রথম বয়সে স্বভাব ভাল ছিল না**। মাস্টারমশাই এতটুকু বলে ছেড়ে দিয়েছেন, বাকি যা বোঝার আপনারা বুঝে নেবেন।

কিন্তু ঠাকুর দয়ার সাগর পতিতপাবন, তাহার সহিত অনেক পুরানো কথা কহিতেছেন। খুব টাচিং জিনিসটা। ১৮৮৩ সালে এই ঘটনা হচ্ছে, ঠাকুর ১৮৫৩ সালে দক্ষিণেশ্বর গেছেন, তিরিশ বছর হয়ে গেছে। তিরিশ বছর বিরাট লম্বা সময়, আমাদের ধরে নিতে অসুবিধা নেই যে, দুজনে এক সঙ্গে অনেক কিছু দেখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –এখন তো বয়স হয়েছে। টাকা যা রোজগার করলি, সাধু বৈষ্ণবদের খাওয়াচ্ছিস তো?

খুব ইন্টেরেস্টিং কথা, এই কথা আপনাদের জন্যও। আপনারা হাজার, লাখ, কোটি যাই টাকা রোজগার করে থাকুন, এই উপার্জিত টাকা একটু ছাড়তে হয়। আমরা যে টাকা ছাড়ি না তা না, কার উপরে? ওই নিজের পরিচিত কেউ কষ্টের মধ্যে আছে, তাকে কিছু সাহায্য করা হল। ওই কোথাও মনে হয় আমার কোন কিছু আপদ-বিপদ হলে সে আমাকে দেখবে। এভাবে হয় না। নিজের পরিচিত দুঃস্থ কাউকে দিচ্ছেন ঠিক আছে, কিন্তু তার সাথে অজানা, অচেনা দুঃস্থদেরও দিতে হয়। সাধু যাঁরা, গরীব যাঁরা, যাঁরা আপনার অজানা, অচেনা, তাঁদেরকেও দিতে হয়। দিলে হৃদয় খোলে। অনেকে পরিচিত মহারাজদের এই আশায় দেয়, দুপুর মঠে প্রসাদ পেতে সুবিধা হবে বা অমুক সেন্টারে বেড়াতে গেলে থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। এগুলো ধান্দাবাজী। এর বাইরেও দিতে হয়, হৃদয়টাকে খুলতে হয়।

ভগবতী (ঈষৎ হাসিয়া) –তা আর কি করে বলব? পরিষ্কার করে বলে দিলেই হল, হ্যাঁ করি। ঠাকুর আবার জিজ্ঞেস করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –কাশী, বৃন্দাবন, এ-সব হয়েছে?

অনেকে বোকা বোকা সব প্রশ্ন করে, রামকৃষ্ণ মিশন অদ্বৈত মানে, তারা আবার অবতার মানে নাকি? ঠাকুর সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি কি বলছেন? কথা শুরু করলেন আহ্নিক দিয়ে, সেখান থেকে এসে গেল বিশ্বাস, বিশ্বাস থেকে চলে গেলেন দান-ধর্মে। দান করা একটা যজ্ঞ, শুধু যে যজ্ঞ তা না, খুব বড় যজ্ঞ। মনুস্মৃতিতে মনু বলছেন –যাঁকে দান করা হয় তিনিও স্বর্গে যান, যিনি দান করেন তিনিও স্বর্গে যান। যাঁকে দান করা হচ্ছে, তিনি না থাকলে এই যজ্ঞ পূর্ণ হবে না। যজ্ঞ জিনিসটাই পূণ্য, দানের পর আবার দক্ষিণা দিতে হয়। আপনারা সবাই দেখে থাকবেন, কোথাও একশ টাকা দান করা হবে, সেখানে একশ টাকা না দিয়ে একশ এক টাকা দেওয়া হয়, হাজার না দিয়ে এক হাজার এক টাকা দান করা হয়। অনেকের ধারণা যে শূন্য দিয়ে শেষ করতে নেই। কিন্তু জিনিসটা আসলে তা নয়। এই যে একশ টাকা দেওয়া হল, এটা হল দান, একটা যজ্ঞ। প্রত্যেক যজ্ঞে দক্ষিণা দিতে হয়, ওই এক টাকা যেটা দেওয়া হল, ওটা হল যজ্ঞের দক্ষিণা।

একজন সাধুসন্ন্যাসীকে আপনি বাড়ি নিয়ে গেলেন, এটা একটা যজ্ঞ। যজ্ঞে দক্ষিণা দেওয়া বাধ্যতামূলক। দেওঘরে খুব কাছ থেকে জিনিসগুলো দেখতাম। ঠাকুরের পূজা, মায়ের পূজা, স্বামীজীর

পূজা দেখতাম, পূজার পর হোম হত। হোম হয়ে যাওয়ার পর দক্ষিণা দিতে হবে। তখন একটু চাল, ডাল, সব্জি, মিষ্টি সঙ্গে দুটো টাকা সাজানো হত। দেওঘরে আমাদের এক পাণ্ডা আছেন, ওনার জন্য ওটা রেখে দেওয়া হত। ব্রাহ্মণকে দান করা হল। তখন আমি ব্রহ্মচারী, অল্প বয়স, অনেক কিছু জানতাম না; কিন্তু আমার খুব অবাক লাগত। আমরা সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীদেরই সবাই প্রণামী দেয়, সবাই অবশ্য দেয় না, তবে দেওয়ার কথা। কিন্তু এই নৈবেদ্য কেন বাইরের কাউকে দেওয়া হয়, ব্যাপারটা অনেক পরে বুঝলাম। আসলে এটা যজ্ঞ কিনা, যজ্ঞের দক্ষিণা কাকে দেবে? ব্রাহ্মণকে।

দানের সাথে আসে আরেকটা বড় ধর্মকর্ম –তীর্থ করা। তীর্থ করা মানে তীর্থে গিয়ে পিকনিক করা না। আপনার যদি ইচ্ছে হয় তীর্থ করার, একা যান। খুব হলে নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যান। ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, কাশী, বৃন্দাবন হয়েছে কিনা। ভগবতী ঠাকুরের কথায় আরও সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। সঙ্কুচিত হওয়া মানে অহংকারের লক্ষণ। ব্রহ্মচারী অবস্থায় একজন মহারাজের সঙ্গে একটা কোন কথা হচ্ছিল। মহারাজ তখন বললেন, 'ঠাকুর যদি কখন তোমাকে এই রকম দায়ীত্ব দেন'? আমি একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললাম, 'না না মহারাজ একি বলছেন, তা কি কখন হয়'? মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'এই যে তুমি সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছ, এটা অহংকারের লক্ষণ। এত সাধারণ জিনিসে অহংকার করার কি আছে'। এগুলো এত সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার যে, আমরা বুঝতেও পারি না।

ভগবতী (ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া) –তা আর কি করে বলব? একটা ঘাট বাঁধিয়ে দিইছি। তাতে পাথরে আমার নাম লেখা আছে। আপনারা দেখে থাকবেন, তীর্থে অনেক স্থানে পাথরে নাম-ঠিকানা খোদাই করা থাকে। এই দেখুন, ভগবতী দাসী, স্বভাব ভাল ছিল না। ঠাকুরও জানেন, কথাও বলছেন। ঠাকুর যখন দানের কথা বলছেন, তীর্থের কথা বলছেন, সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। কারণ তার ভিতরে একটা গর্ব বোধ আছে কিনা। ভিতরে কত রকমের দোষ।

শ্রীরামকৃষ্ণ –বলিস কি রে? ভগবতী দাসী বুঝতে পারছে না, ঠাকুর এটা প্রশংসার অর্থে বলছেন না, ঠাকুর আসলে চমকে উঠেছেন।

ভগবতী –হাঁ, নাম লেখা আছে, "শ্রীমতি ভগবতী দাসী"। বলা হয় ভক্তরা আমার নামের উপর পা মাড়িয়ে যাবে, ভক্তদের চরণধুলা আমার নামে উপর পড়বে। এটা তার একটা সাধনা আর কি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাসিয়া) –বেশ বেশ।

ভগবতী দাসীর ব্যক্তিত্বে কত রকমের দোষ। বাবুদের দাসী, স্বভাব যা ছিল, বাকিটা বুঝে নিন। কিন্তু পরবর্তি কালে তার মনে হয়েছে কিছু ধর্মকর্ম করতে হবে। একটার পর একটা ধর্মকর্ম করেছে, ঠিক আছে, চুপচাপ থাকো, তাও না। কিন্তু তার মনে পাপবোধ, অপরাধবোধ কত ভাবে যে খেলা করছে, বুঝতেও পারছে না, বোঝাও যায় না।

এই সময় ভগবতী সাহস পাইয়া ঠাকুরকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন।

বৃশ্চিক দংশন করিলে যেমন লোক চমকিয়া উঠে ও অস্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরূপ অস্থির হইয়া 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। লীলাপ্রসঙ্গে আমরা কিছু কিছু এই রকম ঘটনা পাই, কথামৃতে শুধু এই ঘটনার বর্ণনাই পাই। **ঘরের কোণে গঙ্গাজলের একটি জালা ছিল –এখনও আছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে যেন ত্রস্ত হইয়া সেই জালার কাছে গেলেন। পায়ের যেখানে দাসী স্পর্শ করিয়াছিল গঙ্গাজল লইয়া সে-স্থান ধুইতে লাগিলেন**।

এই অনুচ্ছেদে চিন্তন-মনন করার অনেক কিছু রয়েছে। আমি আপনি যে ভগবতী দাসী থেকে যে খুব একটা উপরে, তা নয়। আমরাও কম-বেশী ওই অবস্থাতেই আছি। আমরা যখন ঠাকুরকে গিয়ে

প্রণাম করছি, ঠাকুরের কিন্তু এভাবে বৃশ্চিক দংশন হচ্ছে। সেইজন্য কিছু পারি না পারি, স্নান করে, শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে বেলুড় মঠে যখন ঢুকলাম, তখন থেকে জপ করতে থাকি।

সকালে মন্দিরে প্রণাম করে ফিরে আসছি একদিন দেখছি একটি ছেলে আর মেয়ে বেলুড় মঠে গল্প করছে, থেকে থেকে একজন আর-একজনের হাত ধরার চেষ্টা করছে। আমি এমনিতে কিছু বলিনা। কিন্তু ওই সকালে ব্যাপারটা আমার এত নোংরা মনে হচ্ছিল যে, বাধ্য হয়ে আমি ছেলেটাকে ডেকে পাঠালাম। ছেলেটিকে বললাম, 'জানো এটা তীর্থস্থান? জানো, এখানে সাধু সন্ন্যাসীরা বাস করেন'? 'হ্যাঁ জানি'। 'ভাই, তোমার বয়সের যা স্বভাব তুমি এটাই করবে, দয়া করে গেটের বাইরে গিয়ে কর'। ওরা বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি পিছন পিছন আসছিলাম। দেখছি, গেটের বাইরে গিয়েই ছেলেটি একটা দিকে পালালো, মেয়েটি আর-এক দিকে পালালো। বুঝলাম, লুকিয়ে লুকিয়ে এখানে এসে প্রেম করছে। কিভাবে লোকেরা একটা পবিত্র স্থানকে নষ্ট করছে। এটা কিন্তু আমরা সবাই করি। মঠে আসার জন্য বাড়ি থেকে বেরোলেন, জপ করতে করতে আসুন, কারুর সঙ্গে কোন কথা বলবেন না। তা নাহলে ভগবতী দাসীর মতই অবস্থা আমরা ঠাকুরের করছি।

দ্বিতীয় গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য। ঠাকুর, যিনি এত শুদ্ধ পবিত্র, যিনি সব কিছুকে শুদ্ধ করেন, তাঁরও যেন বৃশ্চিক দংশন হচ্ছে। সেটাকে পবিত্র করে দিচ্ছেন মা গঙ্গা। যাঁরা যমুনার তীরে বাস করেন তাঁরা যমুনাকে নিয়ে এই কথা বলেন; যাঁরা নর্মদা তীরে বাস করেন, তাঁরা নর্মদাকে নিয়ে এই কথা বলেন, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু গঙ্গাজলের যে মাহাত্ম্য যেটা আমরা স্পষ্ট চোখের সামনে দেখছি। আপনি দেশে থাকুন, বিদেশে থাকুন, গঙ্গাজল সঙ্গে রাখবেন। রোজ মাথায় গঙ্গাজলের ছিটে দিন। কোন ভুলভাল কাজ করে ফেলেছেন, মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিজেকে শুদ্ধ পবিত্র করে নিন। মিথ্যে কথা বলেছেন, জিহ্বাতে গঙ্গাজল ছিটিয় জিহ্বাকে শুদ্ধ করে নিন।

ঘরে আরও দু-একজন ছিলেন, ঘটনাটা দেখে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেছেন। **দাসী জীবন্মৃতা হইয়া বসিয়া আছেন**। ইংরাজীতে লেকচার দেওয়ার যে ঘটনাটা আমি বললাম, আমি তখন অতটুকুই বুঝলাম যে, জিনিসটা খুবই শকিং। কিন্তু ঠাকুর দয়াসিন্ধু পতিতপাবন। ঠাকুরের যে এই বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা, এটা বাস্তবিক, এখানে কোন নাটকীয়তা নেই। জ্বালার চোটে অস্থির হয়ে তিনি হাঁপাচ্ছেন, 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' এই নাম উচ্চারণ করছেন। মনে রাখবেন আমি, আপনি সবাই ঠাকুরকে এই একই কষ্ট দিই।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাসীকে সম্বোধন করিয়া করণামাখা স্বরে বলিতেছেন, 'তোরা অমনি প্রণাম করবি'। বলতে চাইছেন, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে হবে না। **এই বলিয়া আবার আসন গ্রহণ করিয়া দাসীকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বলিলেন, 'একটু গান শোন'**। সুহিতানন্দজী যখন আমাকে এই ঘটনাটা বলেছিলেন, তখন তিনি এই জিনিসটাতে ফোকাস করেছিলেন। এই যে এই রকম একটা ঘটনা হয়ে গেল, ভগবতী দাসীও মনে মনে বিব্রত বোধ করছে, না জানি কি অন্যায় করে ফেলেছি। সেইজন্য ঠাকুর ভগবতী দাসীর বিব্রত মনকে, অস্বস্থিপূর্ণ মনকে স্বাভাবিক করতে কয়েকটা গান গেয়ে শোনাতে লাগলেন।

(১) **মজল আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ-নীলকমলে।**
(শ্যামাপদ-নীলকমলে –কালীপদ-নীলকমলে।)
(২) **শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়তেছিল।**
কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল।
(৩) **আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে।**
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।।

ভগবতী দাসীকে ঠাকুর ছোট করছেন না, এবং কোথাও ছোট করলেন না। ঠাকুর মিষ্ট ব্যবহার করছেন, মিষ্টি করে কথা বলছেন। কিন্তু না বুঝে আচমকা সে এমন করে দিয়েছে যে ঠাকুরকে যেন বৃশ্চিক দংশন করল। সেইজন্য কখন সাধুসন্ন্যাসীদের আচমকা প্রণাম করতে নেই। সবচেয়ে বড় হল, নিজের জীবন, নিজের মন, শরীরকে শুদ্ধ রাখতে হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম প্রেমোন্মাদ কথা

কথামৃতের আজকের তারিখ হল ৫ই জুন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, মঙ্গলবার (পৃঃ২০২)। আগের দিন রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে ফলহারিণী কালীপূজা হয়েছে। ফলহারিণী কালীপূজার পরের দিনের কথা হচ্ছে। মাস্টারমশাই লিখছেন, মঙ্গলবার হওয়াতে বেশি ভক্তের সমাগম হয় নাই। মাস্টারমশাই যেদিন যেদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন, বা কলকাতায় ভক্তদের বাড়িতে যখন ঠাকুর যেতেন সেখানে মাস্টারমশাই উপস্থিত থাকতেন; এই দিনগুলির কথাই মাস্টারমশাই কথামৃতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এতে অনেকের মনে হতে পারে, এমনি দিনগুলিতে মাস্টারমশাইকে ছাড়াও তো ঠাকুর অনেক কথা বলতেন, সেই কথাগুলো তো লিপিবদ্ধ করা যায়নি। হতে পারে, তবে পুরো কথামৃত যদি দেখা হয়ে থাকে, তাহলে দেখবেন আমাদের যত শাস্ত্র আছে তার কোন কিছুই বাদ যায়নি, কথামৃতে ঠাকুর শাস্ত্রের সব কথাই বলেছেন। অপ্রকাশিত কোন কথাও যদি থাকে, মাস্টারমশাইর অনুপস্থিতিতে ঠাকুর যে কথাগুলো বলেছেন, সেগুলো আমাদের জন্য খুব একটা জরুরী না।

সোমবার রাত্রে মা-কালীর নাটমন্দিরে কৃষ্ণযাত্রা হইয়াছিল। যেটা আগের দিন অর্থাৎ রবিবার রাত্রে হওয়ার কথা ছিল সেটা সোমবার হয়েছে।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে, ঠাকুর নিজের ঘরে আছেন। রাখাল ঠাকুরের কাছে আছেন, মাস্টারমশাইও আছেন। **ঠাকুর নিজের প্রেমোন্মাদ অবস্থা আবার বর্ণনা করিতেছেন**। প্রেম জিনিসটা কি, যদি এই জিনিসটা বুঝতে চান, তাহলে আমি আপনাদের অনুরোধ করব, ভাগবতের উপর আমাদের যে ক্লাশগুলো হয় তার মধ্যে রাসলীলা অংশটা যদি শোনেন, তাহলে প্রেম সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করতে পারবেন। অথবা পরকীয়া, নিজের যে প্রেম তার বাইরে যে প্রেম, সেখানে যে টান, এই টানটুকুর কথাই ঠাকুর কথামৃতে বলছেন। নিজের জীবনে যাঁরা এই টান অনুভব করেছেন, তাঁরা একটু বুঝতে পারবেন প্রেমোন্মাদ কাকে বলে। সুফি পরম্পরাতে একটা খুব সুন্দর গল্প আছে, আগেও কয়েকবার বলেছি।

একজন মেয়ে কাউকে ভালবাসে। সারাদিনে সে তাকে দেখার সুযোগ পায় না। সন্ধ্যে হয়েছে, একটু সময় পেয়েছে, সে এবার দৌড়েছে। যাওয়ার পথে একজন শেখজী আল্লার নাম জপ করছিল। তাড়াহুড়ো করে যেতে যেতে মেয়েটির পা শেখজীর গায়ে লেগে যায়। শেখজী রেগে আগুন হয়ে গালাগাল দিতে লাগল। 'প্রেমিকের সাথে দেখা করার জন্য তুমি এইভাবে দৌড়াচ্ছ'? মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়েছে। 'দোহাই শেখজী আমাকে ক্ষমা করে দিন, তবে আমার একটা প্রশ্ন আছে, 'আমি একটা দেহধারী একটি মানুষের প্রেমে মত্ত, তাতেই আমার জগতের হুঁশ নেই; কিন্তু আপনি আল্লার নাম প্রেমের সঙ্গে জপ করছেন, কিন্তু আপনার সব দিকে হুঁশ আছে'।

আমি যখন প্রথম এই কাহিনীটা পড়েছিলাম, ভিতরটা কেমন জানি নড়ে উঠেছিল। সত্যিই কি আমাদের ভিতর ঠাকুরের প্রতি সেই উন্মাদ অবস্থা থাকে? উন্মাদ হওয়া তো দূরের কথা, এই জিনিসটাকে যে আমরা ধারণা করব সেই ক্ষমতাও আমাদের নেই। ভাগবতের রাসলীলার উপর ইউটিউবে আমাদের যে ক্লাশগুলো আছেন, ভাল করে দেখবেন, তাহলে কিছুটা ধারণা করতে পারবেন। গ্রাম দেশে দেখেছি, বাছুরের দুধ খাওয়ার সময় হয়েছে। গরু কোথায় ঘাস খাচ্ছে। গরু ঘাস খাওয়া বন্ধ করে বাছুরের দিকে কেমন দৌড়াচ্ছে। গরু যখন বাছুরের জন্য দৌড়ায়, ওর তখন কোন হুঁশ থাকে না।

এগুলো শুনলে বা দেখলে আমাদের কত সাধারণ মনে হয়। গুরু বলে দিয়েছেন, ওই কোন রকমে একশ আটবার জপ করছে, এতে কতটুকুই হবে আর কিই বা হবে। হিন্দিতে খুব সুন্দর একটা ভজন আছে, সিয়া রামধুন মে হো জা মাতোয়ারা, সীতারামের নামে মাতোয়ারা হয়ে যাও। কোন হুঁশ থাকবে না। দেখে থাকবেন, যারা গাঁজা খায়, ভাঙ খায়, ওই খেয়ে কেমন বুঁদ হয়ে থাকে, ওই রকম ঈশ্বরের নামে বুঁদ হয়ে যাওয়া। এবার ঠাকুর নিজের অবস্থা বর্ণনা করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) –কি অবস্থাই গিয়েছে। এখানে খেতুম না। বরাহনগরে, কি দক্ষিণেশ্বরে, কি এঁড়েদয়, কোন বামুনের বাড়ি গিয়ে পড়তুম। ব্রাহ্মণের ভাব ঠাকুরের চিরদিনই ছিল। সমাজে যেমনটি প্রথা, নিয়ম, রীতি-নীতি থাকে, অবতার এর কোনটাই ভাঙবেন না। তবে যেগুলো একেবারে আবর্জনা হয়ে আছে, সেগুলোকেই পরিষ্কার করেন। **আবার পড়তুম অবেলায়। গিয়ে বসতুম, মুখে কোন কথা নাই**। আপনারা যারা কথামৃত শুনছেন, আপনার কেউ সাধারণ মানুষ নন, সাধারণ মানুষ হলে কি করে শুনতেন! কথামৃতের উপর চারিদিকে প্রচুর ক্লাশ হয়, প্রবচন হয়, তা সত্ত্বেও আপনার এখানে শুনতে এসেছেন। আমার না আছে ভাব, না আছে ভাষা, তাও শুনছেন, বুঝতে হবে কোথাও আপনার ভিতরে ঠাকুরের প্রতি একটা টান আছে। যে কথাগুলো এত পড়েছেন, এত জায়গায় শুনেছেন; এক মুহুর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে যদি নিজেকে ভাবেন, অবেলায় ঠাকুর কারুর বাড়ি চলে গেছেন। হয়ত তারা ঠাকুরকে চেনে, হয়ত চেনে না। **বাড়ির লোক কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে কেবল বলতুম, আমি এখানে খাব**। এগুলো ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। প্রেমোন্মাদ, জগতের কোন হুঁশ নেই। **আর কোন কথা নাই। আলমবাজারে রাম চাটুজ্যের বাড়ি যেতুম। কখনও দক্ষিণেশ্বরে সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়িতে। তাদের বাড়ি খেতুম বটে, কিন্তু ভাল লাগত না –কেমন আঁষ্টে গন্ধ**।

খুব ইন্টারেস্টিং। ঠাকুরের একদিকে কোন হুঁশ নেই, বেরিয়ে পড়েছেন। কারুর বাড়িতে গিয়ে বলছেন, এখানে খাব। খাওয়াটা কেমন ছিল সেটা কিন্তু মনে আছে। এই অবস্থা কিন্তু ঠাকুরের সব সময় ছিল না। আপনারা যদি লীলাপ্রসঙ্গ পড়েন, সেখানে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা আছে, সারদানন্দজীর ব্যাখ্যা। এমন সময় ছিল যখন হুঁশ থাকত না, আবার এমন সময়ও ছিল যখন হুঁশ থাকত। আমাদের মহারাজরা সাধারণত কারুর বাড়িতে গিয়ে খাবেন না, আমি তো কখনই কোথাও খাই না, আমার কেমন আঁষ্টে গন্ধ লাগে। দোকানের খাবারে আঁষ্টে গন্ধ লাগে না। আসলে লোকেদের বাসন-পত্র, এগুলো নিজেদের জন্য করেছেন কিনা, আমার জন্য নয়, ওই জন্য আঁষ্টে গন্ধ লাগে।

একদিন ধরে বসলুম, 'দেবেন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি যাব'। সেজোবাবুকে বললুম, দেবেন্দ্র ঈশ্বরের নাম করে, তাকে দেখব, আমাকে লয়ে যাবে? ঠাকুর একবার যদি শোনেন কারুর মধ্যে কোন গুণ আছে, ঠাকুর তাঁর কাছে চলে যেতেন। এটাকে আমরা যদি বিস্তারে নিয়ে আসি, তাহলে কেমন দেখাবে? স্বামীজী বারবার বলছেন, ঠাকুর এখনও সূক্ষ্ম শরীরে আছেন, অবতার কিনা। আপনার ভিতর সত্ত্বগুণের কোন গুণ যদি থাকে, ঠাকুর আসবেন আপনার কাছে –স্বপ্নে আসবেন, ধ্যানের সময় আসবেন, যেখানে সেখানে দর্শন দেবেন। এই কথা আমার কথা না। এক সময় আমি অনেক মহারাজের সঙ্গ করতাম। মাঝে মাঝে ওনাদের জিজ্ঞেস করতাম, ওনাদের কি অনুভূতি হয়েছে। আমি আশি সালে জয়েন করি, তখন এত কথা বুঝতাম না। ১৯৮৫ থেকে নিয়মিত আমি বিভিন্ন মহারাজদের, যাঁরা আরোগ্য ভবনে আছেন, বা অন্য কোথাও আছেন, আমি তাঁদের অনুভূতি, উপলব্ধিত কথা জিজ্ঞেস করতাম। মহারাজরা বিভিন্ন ধরণের কথা বলতেন। সেই কথাগুলোই আপনাদের আমি বলতে থাকি, আমার নিজের আর কতটুকু ক্ষমতা। যুক্তিটা অত্যন্ত সহজ। স্বামীজী বলছেন ঠাকুর সূক্ষ্ম শরীরে অনেকদিন থাকবেন। তাহলে স্থূল শরীরে তিনি যখন ছিলেন তখন কারুকে যদি ঠাকুরের ভাল লাগত, কোন গুণ আছে জানতে পারলে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলে যেতেন; তাহলে সূক্ষ্ম শরীরে যদি থাকেন, আপনার যদি কোন গুণ থাকে, আপনাকে ডাকতেও হবে না, ঠাকুর নিজেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চলে আসবেন।

শুধু আপনাকে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। দান, দয়া, ধর্ম, শুচি, পবিত্রতা, গান-বাজনা ইত্যাদি সাত্ত্বিক গুণগুলো থাকতে হবে। একজন খুব সুন্দর বীণা বাজাতেন, ঠাকুর তাঁকে দেখতে চলে গেলেন। বিদ্যাসাগরের এত পাণ্ডিত্য, তাঁকে দেখতে গেছেন। সেই বিদ্যাসাগর মহাশয় নরেনের স্কুলে পড়ানোর ব্যাপারে বিরাট ঝামেলা করে দিলেন, কিন্তু তাঁকে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন। এগুলো আমি একেবারেই বাড়িয়ে বা বানিয়ে বলছি না, এগুলো সত্য। তবে এটা ঠিক যে, সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে ঠাকুর যেখানে সেখানে নামতে পারবেন না। একটা বড় পাখী, গৃধ্ররাজ, সে যে গাছের ডালে এসে বসতে চাইবে, সেই ডালটাকে তো সেই রকম মজবুত হতে হবে। সে যদি ভেণ্ডি গাছে নামে, গাছটাই দুমড়ে মুচড়ে যাবে। ঠাকুর ভগবান, তিনি আপনার মনে যে নামবেন, সেই মনে তাঁর নামার জন্য একটা কিছু তো আপনাকে রাখতে হবে। উদাহরণ দিয়ে বোঝানর জন্য বলা। ঠাকুরের নামগুণগান করছেন, ঠিক আছে, এতে দেহ শুদ্ধ হয়। কিন্তু কোন গুণ কি আপনার ভিতর আছে, যেটাকে সত্ত্বগুণ বলা হয়? গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবীসম্পদের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। ওই দৈবীসম্পদ যদি আপনার থাকে ঠাকুর নিজেই আপনার কাছে আসবেন। সূক্ষ্ম শরীরে তিনি আছেন, তিনিও তো চাইছেন তাঁর ভক্তদের দেখতে; আমার এই ভক্ত কেমন, অমুক ভক্তের কেমন ভক্তি। কিন্তু আপনি যদি পেঁপে গাছের ডাল হন, ভেণ্ডি গাছের ডাল হন, আপনার কাছে কি করে তিনি নামবেন।

সেজোবাবু –তার আবার ভারী অভিমান, সে সেধে লোকের বাড়ি যাবে? এগু-পেছু করতে লাগল। তারপর বললে, 'হ্যাঁ, দেবেন্দ্র আর আমি একসঙ্গে পড়েছিলুম, তা চল বাবা, নিয়ে যাব'।

একদিন শুনলুম বাগবাজারের পোলের কাছে দীন মুখুজ্জে বলে একটি ভাল লোক আছে –ভক্ত। সেজোবাবুকে ধরলুম দীন মুখুজ্জের বাড়ি যাব। সাধুসন্ন্যাসীদের এই এক সমস্যা, বাচ্চাদের মত মন, মাথায় একটা ঢুকে গেল, তক্ষুণি ওটাই চাই। দীন মুখুজ্জে অতি সাধারণ মানুষ। **সেজোবাবু কি করে, গাড়ি করে নিয়ে গেল। বাড়িটি ছোট, আবার মস্ত গাড়ি করে এক বড় মানুষ এসেছে**। সাধুসন্ন্যাসীদের কথায় যদি সংসার চালাতে যান, সংসার একেবারে ডুবিয়ে ভাসিয়ে দেবে, চুড়মার হয়ে যাবে সংসার। সাধুসন্ন্যাসী ঈশ্বরীয় কথা পর্যন্ত ঠিক আছেন, তার বাইরে সব এলেমেলো করে দেবেন।

তারাও অপ্রস্তুত, আমরাও অপ্রস্তুত। সেদিন আবার তার ছেলের পৈতে। বাড়িতে লোকজনে ভর্তি, এনাদের কোথায় বসতে দেবেন! মথুরবাবু তখনকার দিনের একজন রাজা, অনেকেই তাঁকে জানে মানে; কিন্তু ঠাকুরকে কেউ জানে না। **আমরা পাশের ঘরে যাচ্ছিলুম, তা বলে উঠল ও ঘরে মেয়েরা, যাবেন না**। অজানা অচেনা একজন উটকো এসে গেছেন, তাও আবার ছোট্ট একটা গলির মধ্যে একটা বিশাল গাড়ি নিয়ে হাজির। **মহা অপ্রস্তুত**। সেদিন কি কথাবার্তা হল জানা নেই। ফেরার সময় মথুরবাবু বলছেন, **'বাবা! তোমার কথা আর শুনব না'। আমি হাসতে লাগলুম**।

প্রচুর জপধ্যান যদি করা হয়, যোগাভ্যাস যদি ঠিক ঠিক করা হয়; জপধ্যান করা যা, যোগাভ্যাস করাও তাই; এতে মন কেন্দ্রিত হয়। আতস কাঁচ দিয়ে সূর্যের আলোকে যেমন কেন্দ্রিত করে একটা পয়েন্টে এনে ফেলা যায়, ঠিক সেইভাবে মনও জপধ্যান, যোগাভ্যাস করার ফলে কেন্দ্রিত হয়ে যায়। সাধারণ লোকেদের জন্য ওটাই যোগবিঘ্ন হয়। কারণ জপধ্যান করে, যোগাভ্যাস করে মনের শক্তি বেড়ে যেখানে গেল সেখানে এই শক্তিকে ধরে রাখার জন্য যে আর-একটা শক্তির দরকার, সেটা আর তৈরী করতে পারে না। যার জন্য দেখা যায়, অনেক সাধুসন্ন্যাসী, যাঁরা বিভিন্ন ভাবে চারিদিকে ধর্মের প্রচার করেন, তাঁদের অনেকেই কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে জড়িয়ে যান, নামযশের পাল্লায় পড়ে যান। এর কারণ এটাই; জপধ্যান করেছেন, যোগাভ্যাস করেছেন, মন একাগ্র হয়ে গেছে; কিন্তু নিজেকে যে কামিনী-কাঞ্চন, নামযশের থেকে সরিয়ে আনবেন, সেই শক্তিটা তৈরী হয়নি। রাজযোগে এটাকে বলছেন – প্রত্যাহার; যম, নিয়ম, আসন এগুলোর সাথে প্রত্যাহার। শুধু গুণ দিয়ে হয় না।

প্রত্যাহার হল –মনটা যদি কোথাও চলে যায়, সেখান থেকে মনকে টেনে ফেরৎ আনার ক্ষমতা। আমাদের জীবনে এটাই আসল সমস্যা। অনেকে যেমন বলে, মহারাজ মন কেন্দ্রিত করব কি করে। মন কেন্দ্রিত করতে কখন সমস্যা হয় না। সমস্যা হয়, মনটাকে কোন কিছু থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা। আমাদের সবার জীবনের সমস্যা হল প্রত্যাহার। বাচ্চার মন খেলাতে পড়ে আছে, ওখান থেকে তার মনকে সরিয়ে আনা খুব মুশকিল। *বাল্যস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত তরুণস্তবাৎ তরুণীরক্তা। বৃদ্ধাস্তাবৎ চিন্তামগ্না পরমে ব্রহ্মাণি কোহপি ন লগ্নঃ।* তরুণরা ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত, ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা খুব মুশকিল। ঠাকুরের এই সমস্যা ছিল না। কিন্তু মাথায় একবার যখন একটা কিছু উঠে গেল, এখন সেটা করতেই হবে।

আমাদের সাধু মহারাজদের এই সমস্যা দেখেছি। স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের অনেক ঘটনা শুনেছি, ওনার সেক্রেটারী স্বামী আত্মারামানন্দ মহারাজের কাছ থেকেই শোনা। মহারাজ চোখে দেখতে পেতেন না। মঠের ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন তিনি প্রায়ই রাঁচিতে থাকতেন। সেক্রেটারী মহারাজকে উনি জিজ্ঞেস করতেন, ‘কটার সময় আমাকে বেরোতে হবে’? বলা হল সাড়ে চারটেয়। সময়ের খুব সুন্দর আন্দাজ ছিল। সেবককে বলছেন, সাড়ে চারটে কি বাজল? যেমনি বলা হল সাড়ে চারটে বাজল, উনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসবেন, এসে দেখছেন এখনও হয়ত গাড়ি আসেনি। তাতে কি হয়েছে, দরকার হলে বারান্দায় বেঞ্চের উপর বসে যাবেন। এগুলো হল কেন্দ্রিত মনের লক্ষণ। আমি স্বামী আত্মারামানন্দজী মহারাজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘কি করে আপনারা ম্যানেজ করতেন’? উনি বললেন, ‘পরের দিকে আমরা ওনাকে আর সময় বলতাম না, শুধু বলতাম, মহারাজ গাড়ি এলে আপনাকে ডেকে নেব’। স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজকেও দেখেছি, এতটা সময় গাড়ি স্টার্ট করবে, ব্যস সময় যেই হয়ে গেল, যে অবস্থাতেই থাকুন সোজা গিয়ে গাড়িতে বসে যাবেন, গাড়ির ছাড়ুক আর নাই ছাড়ুক, ড্রাইভারই হয়ত এখনও এসে পৌঁছাননি, উনি গাড়িতেই বসে থাকবেন। যাই হোক ঠাকুর আরও নিজের কথা বলে যাচ্ছেন।

কি অবস্থাই গেছে। কুমার সিং সাধু-ভোজন করাবে, আমায় নিমন্ত্রণ কল্লে। গিয়ে দেখলুম, অনেক সাধু এসেছে। আমি বসলে পরে সাধুরা কেউ কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা কল্লে; যাই জিজ্ঞাস করা, আমি আলাদা বসতে গেলুম। ঠাকুরের তখন ওই প্রেমোন্মাদের অবস্থা চলছে, ঠাকুর পুরোপুরি ঈশ্বরে ডুবে আছেন। ওই অবস্থায় কথা বলতে আর ইচ্ছা করে না। **ভাবলুম অত খবরে কাজ কি। তারপর যেই সকলকে পাতা পেতে খেতে বসালে, কেউ কিছু না বলতে বলতে আমি আগে খেতে লাগলুম**। মন্ত্রাদি পাঠ করে সাধুরা ভোজন শুরু করেন, অনেক জায়গায় শুধু বলা হয়, আরম্ভ্‌ কি জিয়ে। **সাধুরা কেউ কেউ বলতে লাগল শুনতে পেলুম, ‘আরে এ কেয়া রে’**। পরমহংসের অবস্থা ঠাকুরের, মনটা একেবারে বাচ্চার মত, বিধি-নিয়মের কোন হুঁশ নেই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হাজরার সঙ্গে কথা –গুরুশিষ্য-সংবাদ

এতক্ষণ ঠাকুর নিজের অবস্থা বলে এবার তিনি হাজরা সঙ্গে কথা বলছেন। হাজরা ঠাকুরের দূর-সম্বন্ধী। **বেলা পাঁচটা হইয়াছে। ঠাকুর বারান্দার কোলে যে সিঁড়ি, তাহার উপর বসিয়া আছে। রাখা, হাজরা ও মাস্টার কাছে বসিয়া আছেন। হাজরার ভাব ‘সোহহম’**।

হাজরা জপধ্যানও করতেন, আবার সোহহম্‌ ভাব নিয়েও চলতেন। মাস্টারমশাই এখানে বলছেন বটে, হাজরার সোহহম্‌ ভাব, কিন্তু হাজরা আবার এটাকে নিয়ে মজাও করতেন, তবে প্রচুর জপ করতেন। খুব আশ্চর্য লাগে, এত কিছু করেও ঠাকুরের যে ভাব, সেটাকে হাজরা ধরতে পারলেন না। হলধারী, হাজরা আর হৃদয়রাম, তিনজনেরই নামের আদ্যাক্ষর ‘হ’ আর তিনজনই ব্রাহ্মণ, তিনজনই

কোন না কোন ভাবে ঠাকুরের সাথে একটা সম্পর্কে যুক্ত। একজন সেবা করে গেলেন, একজন শাস্ত্রচর্চা করে গেলেন আর-একজন জপ-ধ্যান করে গেলেন –তিনটে যোগকে আমরা দেখতে পাচ্ছি – জ্ঞানযোগ(হলধারী), ভক্তিযোগ(হাজরা) আর কর্মযোগ(হৃদয়রাম)। কিন্তু আশ্চর্যের যে, তিনজনের মধ্যে কেউই দাঁড়াতে পারলেন না। এখন ঠাকুর সেই হাজরাকে উপদেশ দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি) –হাঁ, সব গোল মেটে; –তিনিই আস্তিক, তিনিই নাস্তিক; তিনিই ভাল, তিনিই মন্দ; তিনিই সৎ, তিনিই অসৎ; জাগা, ঘুম এ-সব অবস্থা তাঁরই; আবার তিনি এ-সব অবস্থার পার।

কথামৃতের অনেক কিছুই বোঝা যায়, কিন্তু ঠাকুরের এই কথাগুলো এমনিতে বোঝান যাবে না। আপনাদের যদি বোঝার ইচ্ছা থাকে, তাহলে একটা কথা বলি, মাণ্ডুক্যকারিকার উপর ইংরেজীতে আমাদের যে ক্লাশগুলো হয়েছিল, সেগুলো ইউটিউবে আপলোড করা আছে, আপনারা যদি ওই লেকচারগুলো মন দিয়ে শোনেন ও বোঝার চেষ্টা করেন, আপনারা ঠাকুরের এই কথাগুলোও তখন বুঝতে পারবেন। এটা ঠিক যে, মাণ্ডুক্যকারিকা একবার শুনে নিলে কথামৃতের অনেক কিছু বোঝা যায়। এই যে ঠাকুর বলছেন, তিনি আস্তিক, তিনি নাস্তিক ইত্যাদি; বা শ্রীশ্রীমা যখন বলছেন, আমি সতেরও মা অসতরেও মা, এই কথা দিয়ে শ্রীশ্রী মা কি বলতে চাইছেন? জগতে কোন কিছু নেই যেটা তিনি প্রসব করেননি। সৎ ওখান থেকে এসেছে, অসৎও সেখান থেকে এসেছে। ভাল-মন্দ, সেখান থেকে; আস্তিক-নাস্তিক সেখান থেকে। এই যে গুণগুলো আছে, এগুলোর কি বাস্তবিক সত্তা আছে? এই যে কলম আমার হাতে, আপনি পরিষ্কার বলতে পারবেন, আমি আর কলম দুটো আলাদা সত্তা। কারণ আমার হাত আছে, হাতের মধ্যে কলমটা ধরে আছি। হাত একটি সত্তা, কলম একটি সত্তা; স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দুটোই সত্য; আমার হাতটাও সত্য, কলমটাও সত্য। ঠিকই, এতে কোন সন্দেহ নেই।

সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা করতে গিয়ে রাজযোগ বলছেন, প্রকৃতি থেকে কিভাব আসে সমষ্টি মন, সমষ্টি মন থেকে কিভাবে ধীরে ধীরে তিনটে গুণ বেরিয়ে আসে –সত্ত্ব, রজো ও তমো; ওই তিনটে গুণ থেকে এই পুরো জগতের সৃষ্টি। ফলে আস্তিক, নাস্তিক; ভাল-মন্দ যাবতীয় সব কিছু হল তিনটে গুণের খেলা। এই তিনটে গুণই বেরিয়েছে প্রকৃতি থেকে, মা তাই সব কিছুর জননী। মাণ্ডুক্যকারিকা যদি পড়েন দেখবেন, সেখানে বলছেন, এগুলোর কোন স্বাধীন সত্তা নেই। তাহলে কি বাস্তবে এগুলো নেই? অবশ্যই আছে। কিন্তু এদের কারুরই স্বাধীন সত্তা নেই। দেখলে মনে হবে যে, হাতের একটা স্বাধীন সত্তা আছে, কলমের একটা স্বাধীন সত্তা রয়েছে। মাণ্ডুক্যকারিকা শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে বোঝাবে কেন এগুলোর স্বাধীন সত্তা নেই। কিভাবে স্বাধীন সত্তা নেই?

আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি; আমার এই বোধ আছে যে আমি বলছি, আপনার এই বোধ আছে যে আপনি শুনছেন, 'আমি'টা সত্য। আমি যখন ঘুমোতে যাচ্ছি, তখন আমি কত রকমের স্বপ্ন দেখছি। সেখানে এই ভাবটি চলছে, আমি স্বপ্ন দেখছি। ঘুমোতে যাওয়ার আগে বলছি, আমি ঘুমোতে যাব। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছি, সেখানেও আমিত্ব থাকছে। এরপর ঘুম থেকে যখন উঠলাম, তখন বলছি, আমি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম। তার মানে জাগ্রত আর স্বপ্ন এই দুটি আমারই অবস্থা। কিন্তু এই 'আমি' কে? এই প্রশ্ন নিয়ে মাণ্ডুক্যকারিকা লম্বা আলোচনা চলে। সেখানে বলছেন, এগুলো সব অবস্থা। জাগ্রত যদি একটা অবস্থা হয়, তাহলে আত্মা জাগ্রত হয়ে গেল? তাহলে কি আত্মার সুষুপ্তি হয়ে গেল? ঠাকুর বলছেন, আবার তিনি এসব অবস্থার পার। এটাই তুরীয়, তুরীয় যে কি এটা মুখে বলা যাবে না। আপনি বলবেন, তাহলে তিনি কি তুরীয়ও পারে? এটা হল শব্দের খেলা মাত্র। তুরীয় মানেই হয় সব কিছুর পারে। যেমন ব্রহ্ম, এখন কেউ যদি বলে ভগবান ব্রহ্মকেও জন্ম দেন। এগুলো শব্দের খেলা। ব্রহ্মের যে পরিভাষা, তাতেই বলে দেওয়া হয় ব্রহ্ম বৃহত্তম, ব্রহ্মকে আর কেউ জন্ম দিতে পারে না। ঠাকুর হাজরাকে এসব কথা বলছেন, হাজরা কতটুকু বুঝলেন, বলা খুব মুশকিল।

যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, আত্মজ্ঞান হওয়ার পরেও যিনি এখানে আছেন, তিনি দেখবেন, সবটাই তিনি। গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে বলছেন, *শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতঃ সমদর্শিনঃ* –কুকুর, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ সবার মধ্যে তিনি দেখেন সেই ব্রহ্ম সমান ভাবে বিদ্যমান। ভালোটাও তিনি, মন্দটাও তিনি; তাই বলে যে তাঁকে সীমিত করে দেওয়া যাবে, তা কখনই করা যাবে না। কারণ এগুলোর পারেও তিনি। মনের জগতে আপনি যা যা কল্পনা করতে পারেন সবটাই তিনি। কিন্তু মনের বাইরেও তিনি। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই শব্দগুলি যখন বলা হচ্ছে, এগুলো মনের অবস্থা। ভাল-মন্দ, আস্তিক-নাস্তিক, এগুলো সব মনের অবস্থা। মনের যত রকমের অবস্থা হতে পারে সবটাই তিনি, আবার মনের বাইরেও তিনি। শ্রীশ্রীমা যখন বলছেন, আমি সতেরও মা অসতেরও মা, বলতে চাইছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু তিনিই হয়েছেন। যেখানেই গুণের খেলা, গুণের খেলা মানেই মনের খেলা। মা মনকেও জন্ম দিয়েছেন বলে, মনেরও সব কিছু তিনি। অথচ মা তার বাইরে।

বোঝানর জন্য ঠাকুর চাষীর গল্প বলছেন। চাষীর একমাত্র ছেলে মারা গেছে, কিন্তু কোন শোকতাপ নেই, কান্নাকাটি নেই। চাষীর **পরিবার প্রতিবেশীদের কাছে তাই আরও দুঃখ করতে লাগল যে, এমন ছেলেটি গেল এঁর চোখে একটু জল পর্যন্ত নেই। অনেকক্ষণ পর চাষা পরিবারকে সম্বোধন করে বললে, 'কেন কাঁদছি না জানো? আমি কাল স্বপন দেখেছিলুম যে, রাজা হয়েছি, আর সাত ছেলের বাপ হয়েছি, ছেলেগুলি রূপে গুণে সুন্দর। ক্রমে বড় হল বিদ্যা ধর্ম উপার্জন কল্লে। এমন সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল**। চাষী বলছে; **এখন ভাবছি যে তোমার ওই এক ছেলের জন্য কাঁদব, কি আমার সাত ছেলের জন্য কাঁদব**। এগুলো হল শুদ্ধ বেদান্ত। স্বপ্ন যতটুকু সত্য, জাগ্রত ঠিক ততটুকু সত্য। এগুলো ধারণা করা খুব কঠিন। আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের দেহবোধ এত প্রবল, খাওয়াতে একটু নুন কম বেশি হলে মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনা, কেউ একটু কটূ কথা বললে অসন্তুষ্ট হয়ে যাই। এই মন নিয়ে আমরা শুদ্ধ বেদান্ত কি বুঝব বলুন।

ঈশ্বরই কর্তা, তাঁর ইচ্ছাতে সব হচ্ছে।

হাজরা –কিন্তু বোঝা বড় শক্ত। হাজরা মহাশয়ের বক্তব্য, ঈশ্বরই সব করছেন, এটা বোঝা শক্ত। **ভূকৈলাসের সাধুকে কত কষ্ট দিয়ে এক রকম মেরে ফেলা হল। সাধুটিকে সমাধিস্থ পেয়েছিল। কখন মাটির ভিতর পোঁতে, কখন জলের ভিতর রাখে, কখন গায়ে ছেঁকা দেয়। এইরকম করে চৈতন্য করালে। এই সব যন্ত্রণায় দেহত্যাগ হল। লোকে যন্ত্রণাও দিলে, আর ঈশ্বরের ইচ্ছাতে মারাও গেল**। এখানে হাজরা মহাশয় ঠাকুরকে কটাক্ষ করছেন। আপনি বলতে চাইছেন সবটাই ঠাকুরের ইচ্ছা, বাঃ বেশ কথা। ভূকৈলাসের পিছনে একটা ছোট্ট কাহিনী আছে। রাবণের ইচ্ছে হল শিবকে কৈলাস থেকে নিয়ে যাবে লঙ্কায়। রাবণের এই কাহিনী বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে আছে। দক্ষিণ ভারতে আছে, আবার বৈদ্যনাথেও এই কাহিনী আছে। রাবণ শিবকে লঙ্কায় নিয়ে যাচ্ছেন। শিব চলে গেলে মুশকিল। তখন দেবতারা একটা ফন্দি আঁটলেন। রাবণের হাত থেকে শিবলিঙ্গটা সরাতে হবে। বিভিন্ন জায়গায় কাহিনী বিভিন্ন ভাবে আছে। যেখানেই শিবলিঙ্গ রাখা হল, সেখানেই শিব এসে গেলেন। শিব এসে গেলেন মানে, পৃথিবীতে কৈলাস এসে গেল, পৃথিবীর আর-এক নাম ভূ, সেইজন্য হয়ে গেল ভূকৈলাস।

হাজরা যে ঘটনাটার কথা বলছেন, আমার মনে হয়, কলকাতার খিদিরপুরের কাছে একটা ভূকৈলাস মন্দির আছে; মনে হয় তিনি ওই মন্দিরেরই কোন ঘটনা বলছেন। ঘটনাটা শুনে মনে হয় ওনাদের সময়েই এটা হয়েছিল, কারণ ওখানে যে ভূকৈলাস মন্দির সেটা খুব বেশি পুরনো নয়। সেখানে হয়ত কোন সাধু ছিল। তাঁর সমাধি হয়েছিল। ঘটনাটা আমাদের বিস্তারে জানা নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ –যার যা কর্ম, তার ফল সে পাবে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে সাধুর দেহত্যাগ হল।

আধ্যাত্মিক দর্শনে যাঁদের আগ্রহ আছে, তাঁদের জন্য এই বাক্যটা খুব জরুরী বাক্য। ভূকৈলাসের সাধু সমাধিস্থ ছিলেন, তাঁকে যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছে এবং যন্ত্রণায় সাধুর শরীর চলে গেল। হাজরা কটাক্ষ করে বলছেন, লোকে যন্ত্রণাও দিলে আর ঈশ্বরের ইচ্ছায় মারাও গেল। ঠাকুর তার উত্তরে বলছেন, যার যা কর্ম, তার ফল সে পাবে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে সাধুর দেহত্যাগ হল। এটা একটা অত্যন্ত দার্শনিক statement। এতটুকু যদি আপনারা ধারণা করতে পারেন, জীবনে অনেক সুবিধা হবে।

আমাদের শাস্ত্রে একটা খুব সুন্দর শব্দ আছে –*ফলরূপতা*। ফলরূপতা হল, সাধনার সময় যে কর্মটা করা হচ্ছে ওই কর্মটাই ফল। তার মানে, যে কাজটি করা হচ্ছে, তার ফল ওই কর্মের মধ্যেই রয়েছে। এটাকে যখন আমরা জীবনে নামিয়ে আনি, তখন সেখান থেকে যে দর্শন জন্ম নেয়, তা হল – কোন কিছু যখন ঘটে তখন ফলের মধ্যেই তার কার্যটাকে দেখতে হবে। যদি ফলের মধ্যে কার্যটা দেখা যায়, তাহলে সেটাই সবচেয়ে বেশি ভাল উত্তর। গাছ থেকে ফল কেন মাটিতেই পড়ে? যদি আমরা বলি সেখানে ছোট ছোট সব দেবতারা আছেন, ফল পেকে গেলে দেবতারা ওই ফলকে ধরে মাটিতে নামিয়ে দেন। খুব সুন্দর উত্তর। কেউ প্রশ্ন করতে পারবে না। কিন্তু নিউটনের যে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মগুলো আছে, সেখানে গেলে আমরা নিউটনের বিভিন্ন সূত্র দেখতে পাই। তাঁর মতে বস্তু বস্তুকে টানে। ফলে ভারি জিনিসের দিকে হাল্কা জিনিস চলে যায়। হাল্কা জিনিসও টানছে, কিন্তু ভারি জিনিসের শক্তি বেশি বলে হাল্কা বস্তুকে ভারী বস্তু বেশি টেনে নেয়। ফল যেটা মাটিতে পড়ছে, এটা একটা ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার কারণ ফলের মধ্যে রয়েছে, বাইরে থেকে কেউ এসে ওটাকে টানছে না। এটাই সব থেকে বেশি ভাল উত্তর। জীবনের যে কোন জিনিসে যদি এই সিদ্ধান্তটা লাগানো যায়, জীবন অনেক মসৃণ ভাবে চলবে।

আমার জীবনে কষ্ট কেন? এই প্রশ্নের তিনটি উত্তর। প্রথম উত্তর, এই লোকটি আমাকে কষ্ট দিয়েছে। দ্বিতীয় উত্তর, ঠাকুর আমাকে ধাক্কা মারছেন আর তৃতীয় উত্তর –আমার কর্ম ভিতরে ছিল, ওই কর্মটাই বেরিয়েছে। ওই লোকটির জন্য আমি কষ্ট পাচ্ছি –এই উত্তরে সমাধানটা বাইরে চলে গেল, কার্যটা এখানে আছে কিন্তু কারণটা বাইরে চলে গেল। ঠাকুর আমাকে ধাক্কা মেরেছেন, এখানেও কারণটা চলে গেল বাইরে। আমার কর্মই আমাকে মারছে, কারণটা চলে এলো ভিতরে; ফলে এটাই বেশি ভাল সমাধান। কর্মবাদের এটাই বৈশিষ্ট্য, এই যে ফলরূপতা বলা হল, যেখানে কারণ ও কার্য একই হয়ে যায়। কোন কিছু ঘটলে, এটা কেন ঘটল –এর সমাধান একটা আসতে পারে ভিতর থেকে, আর-একটা বাইরে থেকে। ভিতরের যে সমাধান, এই সমাধান সব সময় বাইরের সমাধান থেকে বেশি ভাল, এটাই scientific। Scientific মানে, সমস্যার সমাধান তাঁরা ভিতরেই খুঁজছেন।

সূর্য কেন পূর্বদিগন্তে উদয় হয়? তখন বলা হয়, সূর্য দেবতা রথে বসে বললেন, মন্দরাচল পর্বতকে পরিক্রমা করতে হবে। খুব সুন্দর উত্তর, আমাদের বেদেও সেটাই বলছেন। বিজ্ঞান বলছে, না, তা কি করে হয়; সূর্য মাধ্যাকর্ষণের নিয়মানুসারে ঘুরে যাচ্ছে। তার মানে, ওর যেটা সিস্টেম, উত্তরাটা ওর ভিতরে ঢুকে গেল। তাই বলে কি আমরা পুরাণের কথা মানব না? কেন মানবেন না, অবশ্যই মানবেন, তাতে আমাদের কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দিক থেকে যদি দেখেন, যুক্তির দিক থেকে যদি দেখেন, তাহলে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মটা সব থেকে ভাল।

তাহলে এই দাঁড়ায় যে, সমস্ত সমস্যার উৎস ভিতরে। কর্মটা কোথা থেকে তৈরী হয়? রাজযোগে কর্মাশয়ের কথা বলা হয়েছে। জলাশয়ে যেমন জল সঞ্চিত করে রাখা হয়েছে, তেমনি কর্মাশয়ে আমার আপনার সবার সমস্ত জন্মের কর্ম সঞ্চিত করে রাখা আছে। প্রত্যেকের পিঠে এই কর্মাশয়ের পুটুলিটা ঝোলান আছে। ওই কর্মাশয়ে যত কর্ম আছে, ওই কর্মগুলিই আপনাকে দিয়ে কর্ম করাচ্ছে। এর থেকেও যদি আর-এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া যায়, তখন কি হবে? যিনি আমাদের অন্তর্যামী, যিনি ভগবান, যিনি ঈশ্বর, তিনি না থাকলে তো কিছুই হবে না। একটা জিনিসকে কাজ করানোর জন্য শক্তি দরকার। সেই শক্তি কোথা থেকে আসবে? মানুষের ক্ষেত্রে এটা চৈতন্য শক্তি। তার মানে সব কিছু করাচ্ছেন ঈশ্বর।

আমি হাত নাড়ছি। কে হাত নাড়ছে? আমি নাড়ছি। আর-একটু যদি ভিতরে যাওয়া হয়, তখন বলবে, আমার ইন্দ্রিয় আর মন কর্মেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, বিভিন্ন নার্ভ সিস্টেমের জন হাতটাকে নাড়াচ্ছে। যার জন্য যাদের নার্ভ সিস্টেম খারাপ থাকে তারা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক ভাবে নাড়াতে পারে না। আরও ভিতরে যদি যাওয়া হয়, তখন কি দেখছেন? তিনিই হাত নাড়ছেন। ঠাকুর সাক্ষাৎ দেখছেন। লাটু দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গালে হাত দিয়ে বসে আছে, ঠাকুর বলছেন, দেখছি সচ্চিদানন্দই গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। উত্তরটা কোথায় গেল? আরও ভিতরে।

সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা যখন ঠাকুর বলেন, তখন ওই ঠাকুর নন, এই ঠাকুর। ভিতরে যিনি ঠাকুর আছেন, অন্তর্যামী যিনি আছেন, তাঁর ইচ্ছাতে সব হয়। কেন? ফলরূপতা। যে কোন কার্যের কারণ ভিতরে খুঁজতে হয়। যেমন ধরুন, আমাকে আজকে কেউ অপমান করল। কে আমাকে অপমান করল? ওই লোকটি অপমান করল। ভাল উত্তর, একেবারে সঠিক উত্তর। কিন্তু আমার যে কর্ম আছে, সেটাই আমাকে ধাক্কা মারল, আরও অনেক ভাল উত্তর এসে গেল। কিন্তু মনের পিছনে যেটা আসল, অন্তর্যামী, ঈশ্বর; তাঁর ইচ্ছাতেই ধাক্কাটা খেলাম –আরও ভাল উত্তর। কিন্তু আমি তো সব সময় বলি –যারাই ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে সব ধাপ্পাবাজ। এরা মনে করে একজন ভগবান আছেন, তিনি উপরে একটা সুপার কম্প্যুটার নিয়ে বসে সব কন্ট্রোল করছে। তখন কি হচ্ছে? ওখানে আর ফলরূপতা থাকছে না। তখন আপনি একটা বাহ্যিক শক্তির কল্পনা করে নিচ্ছেন।

ঠাকুর এখানে এই যে বলছেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে সাধুর দেহত্যাগ হল। সাধুকে যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছে, সেটাও ঈশ্বরের ইচ্ছায়। কারণ, কর্মফল যেটা, সেটাও ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই আসে। আমরা দেখছি কর্মফল রূপে। সে কর্ম করেছে, যে কোন কর্ম করলে কর্মের ফল তো আসবে। কর্ম কর্মাশয় হয়ে আছে, কবেকার কোন জন্মের কোন কর্ম বাকি পড়ে আছে, কে জানে। অনেক সময় রাস্থাঘাটে কাউকে দেখলে মনটা টেনে নেয়। আবার অনেকে আছে তাকে দেখলে ভাল লাগে না। আমাদের কাছে অনেকে দেখা করতে আসেন, যাওয়ার সময় বলেন, মহারাজ যদি অনুমতি দেন আবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসব। আবার অনেকে বাইরে বেরিয়ে বলাবলি করে, এ কেমন সাধু! আবার অনেকের সাথে প্রথম দেখাতেই ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। কিছু করার নেই, আমাদের এমন এমন কর্ম আছে, এই রকমটাই হওয়ার কথা। তবে আমরা যে মনে করছি, ঈশ্বর উপরে বসে কলকাঠি নাড়ছেন, এখানে ঠাকুর ওই অর্থে বলছেন না। শুদ্ধ চৈতন্য, এটাই আসল। সব কিছু তিনি কর্মের মাধ্যমে করান, কর্মফলের মাধ্যমে দেন। যিনি করছেন, সেটাও তিনি, যিনি পাচ্ছেন সেটাও তিনি আর যিনি করাচ্ছেন সেটাও তিনি – ফলরূপতা। কার্য, কারণ; কারণের পিছনে যে ইচ্ছা; তিনটেই এক।

কবিরাজেরা বোতলের ভিতর মকরধ্বজ তৈয়ার করে। চারিদিকে মাটি দিয়ে আগুনে ফেলে রাখে। বোতলের ভিতর যে সোনা আছে, সেই সোনা আগুনের তাতে আরও অন্য জিনিসের সঙ্গে মিশে মকরধ্বজ হয়। তখন কবিরাজ বোতলটি লয়ে আস্তে আস্তে ভেঙে, ভিতরের মকরধ্বজ রেখে দেয়। তখন বোতল থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি? তেমনি লোকে ভাবে সাধুকে মেরে ফেললে, কিন্তু হয়তো তার জিনিস তৈয়ার হয়ে গিছল। ভগবানলাভের পর শরীর থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি?

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমের দিকেই ভগবান অর্জুনকে বলছেন, *অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে,* যাদেরকে নিয়ে শোক করার কথা না, তাদেরকে নিয়ে তুমি শোক করছ। 'ভীষ্ম, দ্রোণ আমার হাতে মারা যাচ্ছেন, আমি কি তাহলে শোক করব না'? 'হ্যাঁ, তুমি অবশ্যই শোক করবে, যদি তাঁরা নিজেদের ধর্ম থেকে পতিত হয়ে যেতেন'। আমরা এত গীতা শুনি, এত গীতা পড়ি, তাও বাবা-মা কেউ মারা গেলে, আমরা কেঁদে ভাসিয়ে দিই। আপনার বাবা-মা ধর্মাচরণ করেছেন, সময় হয়ে গেছে, চলে গেলেন, কান্নার কি আছে! হ্যাঁ, কোন ব্যবস্থা যদি না করে গিয়ে থাকেন, তখন শোকের কারণ হতে পারে। আমি একজনকে জানি, একজনের এক কি দু বছরের বাচ্চা ছিল, ভদ্রলোক মারা

গেছেন। বাচ্চাটির মা সংসারের কিছুই জানে না। আমার সাথে ভাল পরিচয় ছিল। সত্যিই তাঁর জীবনটা শেষ হয়ে গেল। তারপর বাচ্চাটির মামা দায়ীত্ব নিলেন। ছেলেটি এখন বিরাট বড়লোক হয়ে গেছে। জীবনে বাবাকে পায়নি, কোনদিন ওটা নিয়ে কোন কথাও বলে না যে, বাবাকে পেলাম না। কিন্তু দাঁড়িয়ে গেল। সাময়িক একটা অসুবিধা অবশ্যই হবে, অর্থের অভাব থাকলে একটা সাময়িক বিপর্যয় অবশ্যই আসবে। কিন্তু নামকরা কথা আছে; রাজা তার বড় সন্তানকে জিজ্ঞেস করছে, 'কার ভাগ্যে তুমি খাও'? ছেলে বলছে, আপনার দয়াতে। কিন্তু ছোট ছেলেটাকে একই প্রশ্ন করার পর সে বলছে, নিজের ভাগ্যে আমি খাই।

আমরা হিন্দু, আমরা এটাকে মানি, ঈশ্বরই দেখেন। কর্মফলের মাধ্যমে এটাকে দেখা হয়। সেইজন্য বাবা-মা, গরু যে দুধ দেবে, গাছ যে ফল দেবে, তিনি মাধ্যম হয়ে যান, তার বেশি কিছু না। আপনি অহংকার করছেন, আপনি আপনার সন্তানকে বড় করছেন। আপনি না থাকলে কি সন্তান বড় হবে না? অনাথ শিশু, তার বাবা-মা মারা গেছে, আমি তাকে খুব ভাল ভাবে জানি। সেই শিশুকে কোন সম্বন্ধী রেখেছেন, খুব ভাল ভাবে রেখেছেন। আবার কেউ খারাপ ভাবেও রাখেন, সেটাও জানি। তবে আমার আপনার জন্য সবচেয়ে জরুরী কথা –অত বিচার করে কি লাভ, এই যে ঠাকুর প্রেমোন্মাদের কথা বলেছেন, যেখান থেকে আমরা শুরু করলাম, আমাদের উদ্দেশ্য ঠাকুরের প্রেমে ডুবে যাওয়া। যার যা কিছু হচ্ছে, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে হচ্ছে, এই ভাবটা নিয়ে এলে আর অত দশ রকমের বিচারের কোন প্রয়োজন হয় না। প্রথম, এই কথাটি সত্য; দ্বিতীয়, এই কথাটা বুঝে নিলে, এই ভাব যদি অবলম্বন করা হয়, জীবনে শান্তি আসে। আপনার যদি মনে হয় এটা আপনার দায়ীত্ব, আপনি পালন করুন। আপনার যদি মনে হয়, আপনার দায়ীত্ব না, আপনি পালন করবেন না। আমি কি করে বলব কোনটা ভুল, কোনটা ঠিক? যে কাজটা করতে মন খুঁত খুঁত করছে, সেই কাজ করবেন না; যে কাজ করাটা দায়ীত্ব বোধ বলে মনে হচ্ছে, সেটা করুন।

ঠাকুর এখানে বলছেন, যিনি সমাধিস্থ, যাকে মাটিতে পুঁতে দিচ্ছে, জলে ডোবাচ্ছে, যার হুঁশ আসছে না, তার মানে সে সমাধিস্থ ছিল। সমাধিবান লোক সমাধিস্থ অবস্থায় বাঁচল কি মরে গেল, তাতে তার কি আসে যায়। কারণ তাঁর সূক্ষ্ম শরীর ভগবানের সঙ্গে লয় হয়ে গেছে।

মানুষ ট্যাঁকের পয়সা খরচ করে দুঃখের সিনেমা দেখতে যায়। আমি ছোটবেলা থেকেই ভাবতাম, পয়সা খরচ করে মানুষ কেন দুঃখের সিনেমা দেখবে। নিশ্চয় তার ভাল লাগছে বলেই দেখছে। ওটাই যখন এক ধাপ এগিয়ে নিজের জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়, দেখা যাবে তখন সারা জীবন চোখের জল ফেলার জন্য তার দরকার একটা দৃশ্য, একটা পরিস্থিতি। ওই দৃশ্য বা পরিস্থিতির নায়ক/নায়িকা কে? আপনি নিজে। ইংলিশে দুঃখের সিনেমা দেখে চোখের জল ফেলাকে বলে tear jerker, এমন এমন দুঃখের দৃশ্য তৈরী করবে যে আপনার চোখ দিয়ে জল বার করে ছাড়বে। জীবননাট্যের নায়ক/নায়িকা আপনি নিজে, আপনি নিজেই এই দৃশ্য, এই সংলাপ, এই পরিস্থিতি চেয়ে এনেছেন। এসব কথা শুনতে হয়ত খুব কঠোর লাগবে, কিন্তু এটাই সত্য। কোন একটা বই বা কোন একজন ঋষি যদি বলে থাকতেন, তাহলে কি মানতাম? অন্যান্য ধর্মে যেমন হয়, কোন একটা বই আছে, কোন একজন বলে গেছেন। সেই ভদ্রলোকের কোনটা নিজের কথা, কোনটা ঈশ্বরের কথা ভগবান জানেন। আমাদের সব ঋষিরা একই কথা বলছেন।

মানুষ পয়সা দিয়ে এ্যাকশান মুভি দেখতে যায়, কমেডি দেখতে যায়, রোমান্স দেখতে যায়, ট্রাজেডি দেখতে যায়। আবার যাঁরা সিনেমা তৈরী করেন, তাঁরা বলেন –এখন এই ধরণের কাহিনী চলছে না। খুব নামকরা লেখকরা যাঁরা বই লেখেন, তাঁদের মধ্যে কেউ হয়ত অনেক সময় খুব খেটেখুটে একটা খুব সুন্দর বই লিখলেন। পাবলিশারের কাছে গেলেন, পাবলিশার দেখে বলে দিল, এই বই এখন আর চলে না। Zen and the Art of Motorcycle Maintenance খুব নামকরা বই,

ফিলজফিক্যাল বই। লেখককে প্রায় তিরিশজন পাবলিশারস্ ফিরিয়ে দিয়েছেন। একজন খুব অনামী পাবলিশার ভাবলেন, বইটাকে লাগিয়েই দিই, যা হবার হবে। লাগিয়ে দিলেন, বেস্ট সেলার হয়ে বেরিয়ে গেল। একজন মহিলা বায়োলজি সম্পর্কিত একটা বই লিখেছিলেন, বইটা ছাপাবার জন্য কোন পাবলিশারসকে পেলেন না, চেষ্টা করেও পেলেন না। শেষে তিনি ফ্রীতে ইন্টারনেটে বইটাকে ছেড়ে দিলেন। ইন্টারনেটে বইটা কোন এক স্মল টাইম পাবলিশারের নজরে পড়ল। সে লেখিকাকে গিয়ে বলল, বইটা আমি ছাপব। বইটাকে ইন্টারনেট থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। ছাপা হল এবং বেস্ট সেলার হয়ে বেরিয়ে গেল। ওই পাবলিশারের ছোট্ট একটা অফিস ছিল, এরপর এত টাকা আয় করল যে তার বিশাল বাড়ি হয়ে গেল। ওই মহিলাই পরে আর-একটা বই লিখলেন, একেবারেই চলল না। এটাই হয়, যেমন বলে –এখন এই জিনিস চলছে না, আবার কিছু দিন যেতে না যেতে বলছে –এখন চলছে। একটা সময়ের পর আবার এটা চলবে না। ঠিক তেমনি আমার আপনার সবার জীবনেও এই জিনিস হয় –এখন চলছে না, কিছু দিন পর বলছি –এখন চলছে।

আপনাদের হয়ত একেবারেই বিশ্বাস হবে না, কিন্তু একটু যদি আপনার পড়াশোনা থাকত, একটু যদি সাইকলজি পড়া থাকত, তাহলে জানতে পারতেন যে, সংসারে অনেক লোক আছে যারা নিজে থেকেই দুঃখ চায়; ইংরাজীতে এটাকে মর্বিডিটি বলে। ওকে যদি কেউ পিটিয়ে দেয়, মনে মনে শান্তি পায়। ঘা যেমন চুলকালে শান্তি লাগে, পরে তার যাই হোক। ঠিক তেমনি আমাদের জীবন চলচ্চিত্রে ওই দৃশ্যগুলো দেখতে ভাল লাগে; ওই কামনাগুলো খুব জোরাল ছিল; সেই কামনাগুলো এখন এসে গেছে। এই সিনেমার আপনিই নায়ক/নায়িকা। কিছুদিন বাদে আপনি বলবেন, এটা চলবে না; পরিস্থিত তখন পাল্টে যাবে। আপনার তো হওয়ার কিছু নেই, যা আছেন পার্মানেন্ট আছেন, এখানে পাল্টানোর কিছু নেই। দৃশ্য আপনার ভাল লাগছে, দৃশ্য পাল্টে যাবে। সমস্যা কি হয়, যতই আমরা শাস্ত্র শুনি, কিন্তু এই বোধ যে, আমি শরীর; এই বোধ যে আমার একটা পরিবর্তন হবে; এই বোধ যে আমি একটু এদিকে যাব; এই বোধগুলি থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারিনা। লোকেরা কত দিকে যায়, বোম্বে যায়, দিল্লি যায়, লণ্ডন যায়, আমেরিকা যায়, সেই রকম আমি ঠাকুরের কাছে যাব। বাস্তবে এখানে এ-রকম কিছু হয় না। কারণ আপনি তো ঠাকুরের কাছেই আছেন। বাবার কোলে বসে দৃশ্য দেখছেন। সন্তান মাঝে মাঝে হাত-পা নাড়ে, বাবা ভয়ে সন্তানকে আরও বুকের মধ্যে আগলে রাখে। ঠাকুর তো আপনাকে কোলে করে দৃশ্যগুলি দেখিয়ে যাচ্ছেন। একবার শুধু বলুন –আমার দৃশ্য লাগবে না, আমি মার কাছে যাব। এর বাইরে আর কিছু না, এখানে হওয়ার কি আছে! জগৎকে এত বেশি সত্য বলে মনে করাটা বুদ্ধিমানের লক্ষণ না।

আমাদের প্রসঙ্গ ছিল, ভূকৈলাসের সাধুকে নানা ভাবে যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। এটাকে নিয়ে ঠাকুর খুব বেশি বলছেন না। উনি বলছেন, যার যার কর্ম তার ফল সে পাবে। ঠাকুর যে বলছেন, যার যার কর্ম তার ফল সে পাবে; এটা ওই একই জিনিস। আপনি দৃশ্যটা দেখতে চাইছেন বলে, উনি কিছু কিছু জিনিস করে দিচ্ছেন, যাতে আপনি দৃশ্যটা দেখতে পারেন। ট্রাজেডি সিনেমা দেখতে যদি চান, আপনাকে অমুক সিনেমা হলে খেটে যেতে হবে, লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটতে হবে। কমেডি হলে তখন অন্য রকম। আগেকার দিনে শহরে তিনটে চারটে করে সিনেমা হল থাকত –ট্রাজেডি সিনেমা দেখতে গেলে ওদিকে যেতে হবে, কমেডি দেখতে হলে অন্য দিকে যেতে হবে; এ-ছাড়া আর কিছু না। একটু যদি চিন্তা করেন, শাস্ত্রে যেগুলো শুনেছেন, একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে –জিনিসটা এই।

এর আগে আমরা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আগেও আলোচনা করা হয়েছে, প্রসঙ্গ এলে আবারও আলোচনা করা হবে। স্থূল শরীর –যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। সূক্ষ্ম শরীর –যিনি আত্মা, যিনি চৈতন্য, তিনি মন, বুদ্ধি, অহংকার, প্রাণ এগুলোর সঙ্গে নিজেকে জুড়ে রেখেছেন, আত্মা মনে করেন এটা আমি; আমরা যেমন মনে করি এই শরীর আমি। এই সূক্ষ্ম শরীরের পিছনে থাকে কারণ শরীর। স্থূল শরীর থেকে যখন আমিত্ব ভাব চলে যায়, সূক্ষ্ম শরীর থেকে যখন আমিত্ব ভাব চলে

যায়, তখন থেকে যায় শুদ্ধ আমিত্ব, এর বেশি আর কিছু না। কারণ শরীরটাও শেষ অবস্থা না, তার পিছনে রয়েছেন মহাকারণ, যেখানে এই শেষ আমিত্বটুকুও খসে পড়ে যায়।

সমাধি প্রত্যেক অবস্থাতেই হতে পারে। রাজযোগে আরও বিস্তারে মনের বিভিন্ন অবস্থার কথা বলা হয়। যেমন বলছেন, ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে নিয়ে আসা হল। বাচ্চারা ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে খুব ভালবাসে। ভারত-পাকিস্থানের ওয়ানডে ম্যাচ হচ্ছে, বাচ্চারা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে, পড়াশোনা ছেড়ে টিভি চালিয়ে বসে যাবে। এটাও এক ধরণের সমাধি, তবে নিম্নস্তরের সমাধি। কিন্তু শেষ যে সমাধি সেখানে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে যায় –মহাকারণ। সব কটাকেই সমাধি বলা হয়।

ভূকৈলাসের সাধুর কথা বলতে গিয়ে ঠাকুর মকরধ্বজের কথা বলছেন, এটা আমার জন্যও এবং আপনাদের জন্যও। আমরা স্থূল শরীরকে বড্ড বেশি দাম দিই। বস্তুবাদ, ভোগবাদ এত বেশি রমরমা হয়ে গেছে, দেহবোধ এত বেশি প্রবল হয়ে গেছে, মন এত বেশি অধোগতিতে চলে গেছে যে, হঠাৎ মৃত্যুটা যেন আমাদের কাছে বেশি সত্য হয়ে গেছে। জীবনটাকে আমরা অধিকতর সত্য বলে মনে করছি। গঙ্গায় শুশুক দেখা যায়, এক ধরণের জলজ প্রানী, শুশুক জলের তলায় থাকে আর কিছুক্ষণ পরে পরে ভুস্ করে জলের উপরে ভেসে ওঠে আবার ডুব মারে। ছোটবেলায় আমাদের শুশুক দেখতে মজা লাগত। এখানে ডুব দিল, কিছুটা দূরে গিয়ে আবার ভুস্ করে ভেসে উঠল, একটু বেশি করে নিঃশ্বাস নিল, নিয়ে আবার ডুব মারল। আমি আপনি সবাই এই শুশুকের মতই। কিছুক্ষণের জন্য আমরা এই জীবনে এসেছি, আবার ডুব মারব।

এই যে সূক্ষ্ম শরীর, তার সঙ্গে যে সূক্ষ্ম জগৎ, বিভিন্ন স্বর্গ আদিতে সূক্ষ্ম শরীরটা ঘুরঘুর করে, এখানে সেখানে ঘুরে আবার একটা স্থূল শরীর ধারণ করে এই জগতে শুশুকের মত ভুস্ করে ভেসে উঠছি। কিছুক্ষণ স্থূল জগতে ভেসে থাকার পর আবার ডুব মারব। কারণ, এই যে সংসার, কর্ম এই সংসারেই হয়, অন্য কোন লোকে কর্ম হবে না। শাস্ত্রও এই কথা বলছেন, ঠাকুরও বলেছেন। শুধু একটা কথা মনে রাখবেন, যখন আমরা এই সংসারে এসেছি, আমাদের উদ্দেশ্য হল নিজেকে বড় করা, চরিত্র নির্মাণ করা। কি করে আমি বড় হতে পারি। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে, যেখানে গীতা ঠিক ঠিক শুরু হয়, সেখানে বলছেন, *অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে*। অর্জুন দুঃখ করছেন – ভীষ্ম, দ্রোণ এনারা সবাই মারা যাবেন, এটা ঠিক হচ্ছে না। ভগবান তখন বলতে শুরু করলেন, *অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং*, যেটাকে নিয়ে শোক করার কথা নয়, সেটাকে নিয়ে তুমি শোক করছ।

যেদিন থেকে আমি গীতা পড়া শুরু করেছি, তখন থেকেই আমার অবাক লাগত, ভগবান এই কথা বলে কি বোঝাতে চাইছেন? পরে এক ভাষ্যকারের ভাষ্য দেখলাম, সেখানে তিনি বলছেন –ভীষ্ম, দ্রোণ, এনাদের চরিত্রের যদি পতন হয়ে যেত, তাহলে দুঃখ করা বা শোক করার কারণ থাকত। ভীষ্ম, দ্রোণ সবাই নিজের স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য চিন্তার কিছু নেই। বাল্মীকি রামায়ণে আছে, শ্রীরামচন্দ্রকে চোদ্দ বছরের বনবাস দেওয়া হয়েছে। ভরতকে তাঁর মাতুলালয় থেকে ডেকে আনা হয়েছে। ভরত এসে যখন শুনলেন, শ্রীরাম বল্কল পরিধান করে বনবাসে চলে গেছেন, তখন তিনি খুব বিচলিত হয়ে গেলেন। দাদা কি এমন পাপ করলেন যে তাঁকে জঙ্গলে চলে যেতে হল? রাম মরে গেলে ভরতের দুঃখ হবে না, কিন্তু তাঁর যদি কোন স্খলন হয়ে যায়, সেটার জন্য ভরতের দুঃখ। আপনার বাবা কিংবা মা যদি মারা যান, আপনার কিসের দুঃখ! শুধু ভাববেন, এনারা জীবনটাকে সুন্দর ভাবে অতিবাহিত করলেন কিনা, ওনাদের আর কিছু করার ছিল কি ছিল না। যদি কিছু করার বাকি থাকত, তাহলে দুঃখের কারণ হবে। কারণ মৃত্যুর পর কোথায় গিয়ে জন্মাবেন জানা নেই, এই সুযোগ আর পাবেন কিনা জানা নেই।

দ্বিতীয় হল, কম বয়সে যাঁরা মারা যান, তাঁদেরকে নিয়ে দুঃখ হয়। কারণ, এনারা একটা সুন্দর পরিবেশ পেয়েছিলেন, একটা ভাল সুযোগ ছিল, মারা যাওয়াতে সেই সুযোগটা হারিয়ে গেল। উপরন্তু তাঁর উপর যাঁরা আশ্রয় করে ছিলেন, তাঁদের জন্য অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। বালিকে যখন শ্রীরামচন্দ্র বধ

করলেন, তখন স্ত্রী তারা এসে বিলাপ করছেন, শোক করছেন। মহাবীর হনুমান তখন তারাকে বোঝাচ্ছেন, তোমাকে নিয়েই এখন সবাই শোক করবে, তুমি আর আলাদা করে কি শোক করছ! বাল্মীকি রামায়ণের এটি একটি অত্যন্ত সুন্দর কথা। তারা তোমার স্বামী থাকল না, তারা তোমার সন্তানের কোন আশ্রয় থাকল না, লোকেরা তোমাকে নিয়ে শোক করবে, তুমি অপরকে নিয়ে কি আর শোক করছ। বালির একটা ভাল জীবন ছিল, চলে গেছে তো কি আর হয়েছে। অধর্ম কিছু করেনি, অধর্ম একটা করেছিল ঠিকই, নিজের ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে নিয়ে নিয়েছিল। শোক যদি করতে হয় এটার জন্যই শোক করতে হয় –স্খলন হয়েছে কিনা।

আমার খুব মজার কথা –Ready for the day, ready for death। সকাল হল, ঘুম ভাঙলো –আজকের দিনের জন্য প্রস্তুত, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। তার সঙ্গে দু ঘন্টা পরে আমার দুশ্চিন্তা হয়; এতদিন আমি যে সঙ্ঘের অন্ন ভক্ষণ করেছি, এত লোক যে আমাকে ভালবাসা ঢেলেছেন, তার যে প্রতিদান সেটা কি করতে পারছি? একটা দুশ্চিন্তা আমার থাকে। আর মনে মনে হিসাব করতে থাকি, যে কাজগুলো করেছি সেগুলো কি সমানে সমানে হচ্ছে, না ওজনে কম পড়ে যাচ্ছে। একটু হিসাব করে দেখবেন, সমাজ থেকে আমরা সবাই শুষে যাচ্ছি। খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, আশ্রয় সবেতেই আমরা শুষে যাচ্ছি। বিনিময়ে দিচ্ছি কি? এই যে এত ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে, ডাক্তার হচ্ছে, হয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে, এত টাকা আয় করছে, পরিচয় দেওয়ার সময় বলে, আমি এত টাকা আয় করি। কিসের আয় করছ, তুমি তো শুষে যাচ্ছ, তুমি দিচ্ছটা কি? আমার সব সময় দুশ্চিন্তা থাকে, আমি যতটুকু নিলাম, তার থেকে বেশি আমি ফেরত দিতে পারছি কিনা। কারণ আমার সম্বল মাত্র দুটো –সময় আর মনের শান্তি, এই দুটো ছাড়া আমার আর কিছু নেই। এইটা যদি আমি না করতে পারি, তবেই এটা হবে দুঃখের।

মকরধ্বজ তৈরীর কথা যে ঠাকুর এখানে বলছেন, ঠাকুর এটাই বলতে চাইছেন। সেই সাধুর মকরধ্বজ তৈরী হয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ সাধুর ভিতরটা তৈরী হয়ে গিয়েছিল; সব সময় এই জিনিসটাকে মনে রাখতে হয়। দিনের শেষে রোজ একবার বিচার করবেন, এই যে বাচ্চা বয়স থেকে সমাজ থেকে, প্রকৃতি থেকে শুষে যাচ্ছেন, এর প্রতিদান আমি কি করছি? যে যত টাকা আয় করছে সে তত বড় প্যারাসাইট। সারা বিশ্বের যারা শ্রেষ্ঠ ধনীলোক, এক, দুই, তিন, চার নম্বরে; কি হারে এরা সমাজ থেকে টাকা নিয়েছে। একটু দাম কম করলে অত টাকা করতে পারত না। আমাদের ছিলেন জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বোস, উনি প্যাটেন্ট করালেন না। কেন প্যাটেন্ট করাব? আমার বিদ্যা দিচ্ছি, এই বিদ্যার বিনিময়ে আমি কেন পয়সা নেব? কিন্তু সবাইকে দেখুন কিভাবে টাকা নিয়ে যাচ্ছে, শুষে নিচ্ছে। যাদেরই বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছা মানেই শুষে নেওয়ার একটা ভাল পথ বার করা। শুষে নেওয়ার জন্য ইদানিং নূতন নূতন পথ বার করছে। বদলে আপনি আপনার দেশ, সমাজকে কি দিলেন? আপনার ভিতরে কি মকরধ্বজ তৈরী করলেন? ভূকৈলাসের কাহিনী আপনারা অনেকেই পড়েছেন, কিন্তু জিনিসটা অত সহজ না।

এই যে একটা জীবন পেয়েছেন, জীবনটাকে কি আপনি কাজে লাগিয়েছেন যাতে আপনার ভিতরে মকরধ্বজ তৈরী হয়? যেখানে সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীর থেকে আলাদা বোধ করবে? সূক্ষ্ম শরীর কি আপনার এটুকু বোধ করতে পারছে যে এই রক্ত-মাংস-হাড় দ্বারা নির্মিত এই শরীর একটা স্থূল শরীর মাত্র? এই স্থূল শরীর ছেড়ে আবার আর-একটা স্থূল শরীরে ঢুকবে। উদ্দেশ্য ভিতরের দিকে যাওয়া, আপনি বাস্তবিক যেটা, সেটা হওয়া।

ঠাকুর কি সুন্দর বলছেন, **লোকে ভাবে সাধুকে মেরে ফেললে, কিন্তু হয়তো তার জিনিস তৈয়ার হয়ে গিছল**। ভগবান লাভের পর শরীর থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি? আপনারাও ভেবে দেখুন, আপনার জিনিস কি তৈয়ার হয়ে গেছে? দায়ীত্বের কথা বলা হচ্ছে না, এই জগতে যে আসে সে তার নিজের কর্ম নিয়ে আসে। কত বাচ্চা অনাথ হয়ে যায়, পরে আবার বিরাট বড় একজন হয়ে যায়। কোন

মানুষই বাবা-মার ভাগ্যে খায় না। বাবা-মা একটা সুযোগ পান, নিজের সন্তানের সেবা করে নিজের ভিতরের জিনিসটাকে তৈয়ার করার। কোন অনুসন্ধান করে, আবেদন পত্র জমা দিয়ে সন্তান বাবা-মার কাছে আসেনি। ভাসমান জীবাত্মা কোন গর্ভে ঢুকে পড়ে। সেই গর্ভ থেকে সন্তানের জন্ম হল, এবার তার সেবা করুন, আপনার ভিতরের জিনিস তৈয়ার হবে। এই কথা আমি বলছি না, ঠাকুর বলছেন।

ঠাকুর যে তৈয়ার হওয়ার কথা বলছেন, তিনি এই অর্থেই বলছেন। স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, প্রতিদান এমন করতে হবে যে যতটুকু নিয়েছি, ঠিক ততটুকু যেন ফিরিয়ে দিতে পারি। প্রতিদান শুধু টাকা-পয়সা দিয়ে হয় না, প্রতিদানের হাজারটা পথ আছে। ঠাকুর কোন একটা অর্থে এক জায়গায় বলছেন, বড়লোকদের দেখলে ভয় হয়। বড়লোকরা সব প্রচণ্ড সেলফিস লোক হয়। সব অসুরের বংশের, অসুররা যেমন সব কিছু নিজের জন্য চায়, এরাও সবটা নিজের জন্য চায়। আপনি শাস্ত্র শুনছেন, শাস্ত্রের কথা মনন করছেন, আপনি ও-রকম নন। রোজ সকালে ভাববেন, যেদিন আমি জন্ম নিয়েছি সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত মায়ের দুধ থেকে শুরু করে যা যা শুষে নিয়েছি আজ পর্যন্ত, তার প্রতিদানে আমি কি দিয়েছি। এই প্রতিদান যেদিন দেবেন, তবে গিয়ে আপনার ভিতরের জিনিস তৈয়ার হবে। ঠাকুর বলছেন, লোকে ভাবে সাধুকে মেরে ফেললে, কিন্তু তার জিনিস তৈয়ার হয়ে গিয়েছিল। প্রতিদান দিলে কি হয়? আপনার জিনিসটা তৈয়ার হয়ে যাবে। ঠাকুরের যে কথাগুলো আছে, এগুলো হল আসল দর্শন, সবাইকে এই কথাগুলো বোঝান যায় না, ধ্যানের গভীরে নিজেকেই বুঝে নিতে হবে। কিন্তু এই বাক্যটা আমার জন্য –জিনিস কি তৈয়ার হয়েছে?

হরিদ্বার ও উত্তরাখণ্ডে আগেকার দিনে যখন সাধুদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে যেতে, তখন ওনারা একটা কথাই জিজ্ঞেস করতেন –মহাত্মাজী দর্শন সাফ্ হ্যায় না? দর্শন, অর্থাৎ ফিলজফি অফ ইওর লাইফ পরিষ্কার আছে তো? আপনার যাঁরা শুনছেন, আপনাদের ফিলজফি অফ লাইফ পরিষ্কার আছে তো? আপনি যে কৃতজ্ঞতার একটা বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন, এটাকে নামাতে পারছেন তো? যদি তৈয়ার না হয়ে থাকে, তাহলে এখন থেকেই চিন্তা-ভাবনা শুরু করুন। আমার 'পরম' বইতে একটা দৃশ্য আছে, যেখানে পরম ট্রেন ধরতে যাচ্ছে। একটা ভিখারী একটা দুটো টাকা ভিক্ষা চাইছে, পরম ভিখারীকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। ভিখারী তাকে বলছে, সারা জীবন তো নিতেই শিখলে বাবু, একটু দিতেও শেখ। ভিখারীর কথা শুনে পরম বেচারী নার্ভাস হয়ে গেছে। সারা জীবন তো নষ্ট করতেই শিখলেন, এবার তৈয়ার করতে শিখুন।

হিন্দুদের যে জীবনধর্ম, ঠিক ঠিক হিন্দু জীবনদর্শন যেটা, তাতে জীবনটাই সব কিছু নয়, জীবনের একটা গুরুত্ব আছে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু শেষ কথা না। অন্যান্য ধর্মে বলবে –তোমার এই একটা জীবন; মরে গেলে সব শেষ। আমাদের হিন্দু ধর্মে তা নয়। আপনি হিন্দু, হিন্দুশাস্ত্র শুনেছেন, ভাল হিন্দুর মত ব্যবহার করুন। আমার 'হিন্দু ধর্মজীবন' বইতে বারবার এটা বলা হয়েছে, এই বোধ – এই জীবনটাই শেষ নয়। জিনিসকে তৈয়ার করা। এরপরে আবার যখন জন্ম নেবেন, তখন আপনি কেমন প্রকৃতির মানুষ হবেন, কি করবেন, কি-রূপ থাকবেন? এই জন্মে যে প্রকৃতি নিয়ে আছি, সেই প্রকৃতি নিয়েই থাকব, এই জন্মে যেমনটা আছি, নূতন শরীর নিয়ে তেমনটাই থাকব। আজকে যে রকম আছেন, কালও সেই রকমই থাকবেন। একটু একটু করে যদি না পাল্টান, পাঁচ-দশ জন্ম পরে আপনি একই রকম থাকবেন।

ভূকৈলাসের সাধু সমাধিস্থ ছিল। সমাধিকে এর আগে বলা হল। মূল হল ছড়ানো মনকে কুড়িয়ে আনা, মনকে একাগ্র করা, রাজযোগে চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা বলা হয়। ঠাকুর বলছেন, **সমাধি অনেক প্রকার হয়**। সমাধি অনেক প্রকার বলার মাধ্যমে ঠাকুর কিন্তু নিজের অবস্থার বর্ণনা করছেন। রাজযোগেও অনেক প্রকার সমাধির কথা বলা হয়েছে, যেমন সবিতর্ক, নির্বিতরক, সবিচার, নির্বিচার, সানন্দা, সাস্মিতা ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের সমাধি হয়। এই সমাধিগুলো হল যেমন যেমন আপনার মন একাগ্র

হচ্ছে, তেমন তেমন জগতের সত্য অন্য ভাবে আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হতে শুরু হয়। ঠাকুর এখানে যে সমাধির কথা বলছেন, এখানে কুণ্ডলিনী জাগরণকে নিয়ে বলছেন।

হৃষীকেশের সাধুর কথার সঙ্গে আমার অবস্থা মিলে গিছল। কখন দেখি শরীরের ভিতর বায়ু চলছে যে পিঁপড়ের মতো, কখনও বা সড়াৎ সড়াৎ করে, বানর যেমন এক ডাল থেকে আর-এক ডালে লাফায়। কখন মাছের মত গতি। যার হয় সেই জানে। ঠাকুর বলছেন, আমার কথা না' 'যার হয় সেই একমাত্র জানে', এগুলো কাউকে বলে বোঝান যাবে না। **জগৎ ভুল হয়ে যায়।** এটাও এক ধরণের একাগ্র চিত্ত, বাচ্চারা যেমন খেলার সময় সব ভুলে থাকে। ঈশ্বরের ভাবেও মানুষের জগৎ ভুল হয়ে যায়। **মনটা একটু নামলে বলি, মা! আমায় ভাল কর, আমি কথা কব**। ভূকৈলাসে যে সাধু সমাধিস্থ ছিলেন, তিনিও কথা বলছিলেন না, কিন্তু এনাদের যখন সমাধি হয়, ভূকৈলাসের সাধু কে ছিলেন আমাদের জানা নেই, কিন্তু সমাধিস্থ ছিলেন মানেই শরীরে তাঁর কোন হুঁশ ছিল না। যার জন্য তাঁকে অত যন্ত্রণা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি কিছু টের পেলেন না। শেষে ওই অত্যাচারেই তাঁর স্থূল শরীরটা ভেঙে যাওয়াতে তিনি মারা গেলন।

ঈশ্বরকোটি (অবতারাদি) না হলে সমাধির পর ফেরে না। সাংখ্যদর্শন ও রাজযোগে এই অবস্থাকে প্রকৃতিলীন পুরুষ বলা হয়। ভক্তিশাস্ত্রে এনারাই হলেন কারণ জগতের বাসিন্দা, যেখানে তাঁরা ঈশ্বরকে পরিষ্কার দেখেন, কিন্তু ছুঁতে পারেন না। এও এক ধরণের সমাধি। আবার নির্বিকল্প সমাধি, ওই একটু ছুঁইয়ে দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার পর আবার নিয়ে এলেন, যেমন স্বামীজীকে ঠাকুর করলেন – অখণ্ড দেখিয়ে দিলাম, মায়ের কাজের জন্য তোমাকে এখন রাখা হল। তবে কি, আমরা যে আলোচনাগুলো করছি, এগুলো থিয়োরেটিক্যাল। এই ধরণের সব সমাধিতে কি হয়, একমাত্র যাঁর হয় তিনিই জানেন।

জীব কেউ কেউ সাধনার জোরে সমাধিস্থ হয়, কিন্তু আর ফেরে না। কারণ জগতেই যান, আর মহাকারণেই যান, আর ফিরবেন না। কিন্তু **তিনি যখন নিজে মানুষ হয়ে আসেন, অবতার হন, জীবের মুক্তির চাবি তাঁর হাতে থাকে, তখন সমাধির পর ফেরেন। লোকের মঙ্গলের জন্য**।

যিনি ভগবান, একমাত্র তিনি পারেন সমাধি থেকে ফিরে আসতে, লোকের মঙ্গলের জন্য। তাঁর কাছে যে জীবের মুক্তির চাবিটা আছে। অবতার যখন আসেন, তখন লোকের মঙ্গল হয়। কিভাবে লোকের মঙ্গল হয়? আমরা এভাবে কল্পনা করতে পারি। একটা বিরাট বড় মাঠ। সেখানে পুরো মাঠ জুড়ে একটা ত্রিপল দেওয়া আছে। আপনি যদি ত্রিপলটা টানতে চান, তাহলে আপনি একটু এদিকে টানতে পারেন, একটু ওই দিকে টানতে পারেন, তার বেশি না। অবতার হলেন সুপারম্যান, যিনি মাঝখান থেকে দাঁড়িয়ে পুরো ত্রিপলটাকেই টেনে নেবেন। পুরো জিনিসটাই উপরে চলে যাবে। এই জিনিস বাস্তবে হয়। অবতার যখন আসেন, সারা বিশ্বের যে সমাজ, বিশেষ করে তিনি যেখানে আসেন, সেখানে একটা জোর ধাক্কা মারেন। ওই ধাক্কাটা সব কিছুতে দেখা যাবে – সাহিত্যে দেখা যাবে, বিজ্ঞানে দেখা যাবে, কলা ও সংস্কৃতিতে দেখা যাবে, রাজনীতিতে দেখা যাবে, সব ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন আসে। একটু বিচার করে দেখবেন, ঠাকুর আসার পর ভারতে কত রকম পরিবর্তন হল। লোকেরা শিল্প বিপ্লবের কথা বলে।

আলভিন টপলার একজন বিখ্যাত লেখক, ওনার খুব নামকরা বই, The Third Wave। First Wave বলছেন, যখন এগ্রিকালচার শুরু হল। Second Wave বলছেন যখন Industrial revolution শুরু হল। Third wave কম্প্যুটার থেকে এসেছে। আমি এদের একটুও মানি না, যাঁরা বুদ্ধি দিয়ে লেখেন, এঁদেরকে আমি একটুও বিশ্বাস করিনা। আমাদের এখানে যে দশাবতার, চব্বিশ অবতারের কথা বলছেন, আমাদের যে পুরাণাদি রচনা হয়েছে, এক-একটি পুরাণে যে অবতারের বর্ণনা

করা হয়েছে, এটাই আমাদের এখানে ঠিক ঠিক revolution। এমনকি আমরা যুগ পাল্টে যাওয়ার কথা বলি। শ্রীকৃষ্ণ এলেন, ত্রেতা যুগ শেষ, দ্বাপর যুগ শুরু হল। ঠাকুর এলেন, একটা নূতন যুগ শুরু হয়ে গেল, সত্য যুগের শুরু। এই কথা স্বামীজী বলে গেছেন। এরপরে সত্য যুগে কি কি হতে যাচ্ছে আমরা জানি না। বলা হয়, সত্য যুগে একটি বেদ, একটি বর্ণ। তাহলে তো তাই হয়ে গেল, আমাদের সংবিধান সব ভেঙে দিয়েছে, কোন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যে প্রিভিলেজ নিতে পারবে, তা এখন আর পারবে না। যারা হাজার হাজার বছর ধরে নিচে পরে ছিল, রিজার্ভেশান আদি করে তাদের উপরে আনার চেষ্টা হচ্ছে। নিউজপেপারের লোকেরা মাঝে মাঝে এদের নিয়ে এই সেই শব্দ লেখে, না লিখলেই ভাল। হিন্দু ধর্ম এখন ধীরে ধীরে একটি বর্ণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমার ইংরাজী বই 'The Hindu Way'সেখানে আমি বারবার এই জিনিসটার উপর জোর দিয়েছি।

এটা কত বড় একটা রিভউলিশান ভাবা যায়! ঠাকুর আসার পর পুরো বর্ণ ব্যবস্থাটাই উঠে গেল। বেদেও ছিল না, পুরুষসূক্তমে আছে, কিন্তু এটা পরে এলো, তার মানে কোন সময় এই জিনিসটা ছিল। আপনারা বলতে পারেন, এটা তো সংবিধানের জন্য হল। ঠিকই, সংবিধানের জন্যই হয়েছে। কিন্তু কি হয়, যখনই কোন অবতার আসেন তখন সব দিকে একটা বিরাট পরিবর্তন আসে। এমন একটা evolution হয় যে, বিজ্ঞানের চিন্তাধারটাই পুরো পাল্টে যায়; সাহিত্যের চিন্তাধারার গতি পরিবর্তন হয় সাহিত্যের মানকে এক বিশাল উচ্চ শৈলীতে নিয়ে যায়। তেমনি ধর্মের চিন্তাধারা পাল্টে যায়, সংস্কৃতি, কৃষ্টি; চিন্তা-ভাবনার জগৎটার সব কিছু পাল্টে যায়। পাল্টে যাওয়াতে কি হয়? লোকের মঙ্গল হয়। শুধু মানুষেরই না, প্রকৃতিতে যত পশুপাখি, জীবজন্তু আছে সবারই মঙ্গল হয়।

মাস্টারমশাই মাঝে মাঝে এমন এমন মন্তব্য করেন, যেটা ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি, এই মন্তব্য না করলেই যেন ভাল হত।

মাস্টার (স্বগতঃ) –ঠাকুরের হাতে কি জীবের মুক্তির চাবি? ঠাকুরের হাতে মুক্তির চাবি, যার বোঝার সে ঠিক বুঝে নেবে, আলাদা করে বলার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এরপর হাজরা মশাই খুব সুন্দর বলছেন।

হাজরা –ঈশ্বরকে তুষ্ট করতে পারলেই হল। অবতার থাকুন আর না থাকুন।

হাজরার মন সংশায়াচ্ছন্ন ছিল, তবে এসব কথা বলার আমাদের অধিকার নেই। কারণ তিনি আর যাই করুন না কেন, কত জপ করতেন, আমি তো অত জপ করতে পারিনা আর পারবও না। আর ঠাকুরের ঘরের সামনে দিনের পর দিন ওইভাবে বসে থাকা। ঠাকুরের কত সঙ্গ করেছেন, ঠাকুরের কত বকুনি খেয়েছেন। কোথাও বড় একটা সিদ্ধি না থাকলে ঠাকুরের বকুনি খেয়ে কেউ ওখানে টিকে থাকতে পারে? সেইজন্য হাজরাকে নিয়ে আমাদের বলার কোন অধিকার নেই। কিন্তু এই কথাগুলোকে যখন আধ্যাত্মিক দর্শন দিয়ে দেখছি, তখন একটু অন্য রকম ভাবেই আমাদের বলতে হয়। ঠাকুর হাজরার কথা শুনে হাসছেন, হেসে খুব সুন্দর কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া) –হাঁ, হাঁ। বিষ্ণুপুরের রেজেস্টারির বড় অফিস, সেখানে রেজেস্টারি করতে পাল্লে, আর গোঘাটে গোলে থাকে না।

পাসপোর্ট করাতে গেলে পুলিশ ভেরিফিকেশান লাগে। কিন্তু কোন বড় আইএএস বা আইপিএস অফিসারের সঙ্গে যদি আপনার পরিচয় থাকে, আর দরখাস্তে উনি যদি সই করে দেন, এরপর আর পুলিশ ভেরিফিকেশান লাগেনা। বড় কোন জায়গা থেকে যদি সই হয়ে যায়, তখন ছোটর আর দরকার পড়ে না। কিন্তু যেটা দরকার লাগে –সই একটা লাগবে। রেজেস্ট্রিটা আপনাকে করাতে হবে, তা আপনি

শ্রীরামপুর থেকেই করান, বা কোন মিউনিসিপ্যালিটি অফিস থেকে করান, বা কলকাতার হাইকোর্ট থেকেই করা, রেজেস্ট্রি আপনাকে করাতে হবে।

ঠাকুরের এই কথাটা খুব সুন্দর কথা, বিষ্ণুপুরের রেজেস্টারির বড় অফিস, সেখানে রেজেস্টারি করতে পাল্লে, আর গোঘাটে গোলে থাকে না। ঠাকুরও জানতেন ছোট অফিস থেকে রেজেস্ট্রি করালে ওর মধ্যে অনেক গোলমাল থাকতে পারে। ওই দলিল দিয়ে কিছু কাজ হবে, কিছু কাজ হবে না। কিন্তু বড় অফিস থেকে করিয়ে নিলে কোথাও কোন গোলমাল হবে না। বাবুর কাছে জো সো করে যদি কোন ভাবে পৌঁছে যেতে পারেন, তখন আপনার সব হয়ে যাবে, ঠাকুর বারবার বলছেন। কিন্তু আপনাকে পৌঁছাতে হবে। তখনকার দিনে এত আধ্যাত্মিক কথার প্রচার প্রসার ছিল না। এখনই বা কতজন আর জানে বা জানতে চেষ্টা করছে। লোকেরা আমাদের কাছে এসে যখন মুখ খোলে, কথা শুনে অবাক লাগে। টিভি দেখে, ইউটিউবে কিছু লেকচারাদি শুনে, বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলগুলিতে কিছু দেখে এমন সব উদ্ভট ধারণা তৈরী করেন, মুখ খুললেই সব উল্টোপাল্টা কথা বেরিয়ে আসে। তখনকার দিনে আরও সমস্যা ছিল। বলছেন, হাজরা আবার কখন কখন সোহহম্ ভাবে থাকেন। সোহহম্ ভাব বলতে কি বোঝাতেন ভগবান জানেন।

প্রসঙ্গটা হল –ঈশ্বরকে যদি তুষ্ট করা হয়। আমাদের কাছে ঈশ্বরও যা, অবতারও তাই। ঠাকুর এটাই বলছেন। গীতাও বারবার এটাই বলছেন। আচার্য শঙ্কর, এত বড় যিনি অদ্বৈতবাদী, তিনিও বারবার বলছেন, যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কৃষ্ণ, যিনি কৃষ্ণ তিনিই ঈশ্বর; আলাদা কিছু নন। হাজরা বলছেন, অবতার থাকুন আর নাই থাকুন। অবতার আর ঈশ্বরের মধ্যে কি কোন তফাৎ আছে? অবতার মানেই তো ঈশ্বর। ঈশ্বর, কারণ জগতে যাঁকে দেখা যায়, প্রত্যক্ষ করা যায়, ছোঁয়া যায় না; সূক্ষ্ম জগতে তিনি দেখা দিতে পারেন, তবে সব সময় না; আর স্থূল জগতে তাঁকে স্থূল চক্ষু দেখা যায় যখন তিনি অবতার হয়ে আসেন। ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাচ্ছে –স্থূল জগতে যখন অবতার হয়ে আসেন, তখন ভগবানকে দেখা যায়; সূক্ষ্ম জগতে আর-একটু বেশি হয় কারণ সূক্ষ্ম শরীরটা থাকে; কারণ জগতে সব সময়ই প্রত্যক্ষ হয়; মহাকারণে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায়।

হাজরা মশাই ঠাকুরের কাছে কাছে থাকছেন, কথাবার্তা হচ্ছে, অথচ হাজরা জিনিসটা নিতে পারছেন না, এই জিনিসটা আমার কাছে কেমন যেন অবাক লাগে। তবে হাজরার জন্য দুঃখ কম হয়, আমার নিজের জন্যই বেশি দুঃখ হয়। আমরাও তো বেলুড় মঠে বসে আছি, ঠাকুরের কাছেই না বসে আছি। আপনারাও তো তাই বসে আছেন। কতটুকু কি হল? হাজরার মত কখন ওই কথা বলি, কখন এই কথা বলি, কখন এই নিয়ে সংশয়, কখন ওই নিয়ে সংশয়। নরেন, রাখালের মত কজন আমরা হতে পারছি? হাজরার কথায়, হৃদয়রামের কথায় হেসে কোন লাভ নেই। আমরাও তাই। সেবা করছি, তাতেই কত অহংকার; আমার নিজের কথাও বলছি। আমাদের কাজের এত অহংকার যে, মহন্ত একটু কোন কথা বললেন, এমন রাগ হয়ে গেল যে বলেই দিলুম –মহারাজ, দয়া করে এই কাজ থেকে আমাকে নিবৃত্তি দেওয়া হোক। আমি নিজেও অনেকবার মহন্তদের সাথে এমন ব্যবহার করেছি। মহন্ত হয়ত একটু বোঝানর চেষ্টা করলেন, সেখানেও প্রত্যাখানের ভাব, এমন অহংকারের ঢিপি। হৃদয়রাম থেকে কি আর আলাদা হলাম আমরা। একটু বিচার করে দেখবেন –বই যখন পড়ি হলধারীর মত, কাজ যখন করি হৃদয়রামের মত, জপধ্যান যখন করি হাজরার মত। নরেন, রাখালের মত আমরা হতে পারছি কই। এনাদের নিয়ে হাসাহাসি করে, নিন্দা করে কি হবে!

সন্ধ্যে হয়ে গেছে, ঠাকুরবাড়িতে আরতি হচ্ছে। বারান্দায় মাদুরের উপর ঠাকুর শুয়ে আছেন, শোওয়া অবস্থাতেই ঠাকুর মণির সাথে ফিসফিস করে কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –দেখ, ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়! যাঁরা প্রচুর জপধ্যান করেছেন, মনকে শুদ্ধ পবিত্র করেছেন, মন অনেকটা একাগ্র হয়েছে, মনের কামনা-বাসনা অনেক কমে গেছে, ঈশ্বর তাঁদের ওই ভাবটা জাগিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁদের একটা ঝাঁকি দর্শন দিয়ে দেন। এখানে ঠাকুর এই দর্শনের কথা বলছেন। ভক্ত প্রহ্লাদের কাহিনীতে, নারদের কাহিনীতেও আমরা এই ধরণের ঝাঁকি দর্শনের বর্ণনা পাই। তবে এই ঈশ্বরদর্শন ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্তি নয়। ঈশ্বরজ্ঞান তখনই হয়, যখন কারণ জগতের অবস্থায় পৌঁছে যান। **অমুকের দর্শন হয়েছে, কিন্তু কারুকে বলো না**। ঠাকুর এখানে কার কথা বলছেন, আমাদের জানা নেই। **আচ্ছা তোমার রূপ না নিরাকার ভাল লাগে?** ঠাকুরের সঙ্গে মাস্টারমশাইর প্রথম যেদিন দেখা হয়েছিল, সেদিনও ঠাকুর তাঁকে এই প্রশ্নটা করেছিলেন। এক বছর পরেও একই প্রশ্ন করছেন।

মণি –আজ্ঞা, এখন একটু নিরাকার ভাল লাগে। প্রথমের দিকে মাস্টারমশাইর নিরাকারই ভাল লাগত, তখন অবশ্য তাঁর উপর কেশব সেনের প্রভাব ছিল। **তবে একটু একটু বুঝছি যে, তিনিই এ-সব সাকার হয়েছেন**। অবতারের সঙ্গগুণে মাস্টারমশাইর এতদিনে এই পরিবর্তনটা হয়েছে। ঠাকুর মতি শীলের ঝিলের কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –দেখ, আমায় বেলঘরের মতি শীলের ঝিলে গাড়ি করে নিয়ে যাবে? সেখানে মুড়ি ফেলে দাও, মাছ সব এসে মুড়ি খাবে।

আমি এক সময় ছাপরা মঠে ছিলাম, তখন নূতন সেন্টার হয়েছে। ওখানে একজন বয়স্ক ডাক্তার ছিলেন, মঠের ভক্ত। তিনি একদিন বললেন, আমাদের এখানে একটা শিব মন্দির আছে, চলুন একদিন যাই ঘুরে আসি। মঠ থেকে মন্দির অনেক দূরে। গেলাম, সেখানে বিরাট বড় একটা পুকুর দেখলাম। এগুলো দেখলেই কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ি –কোথায় একটা প্রত্যন্ত গ্রাম, সেখানে একটা বিরাট শিব মন্দির, মন্দিরের সামনে বিশাল এক পুকুর। পুরো পুকুরটা বড় বড় রুই মাছে কিলবিল করছে। ওখানে মাছ ধরা একেবারে নিষিদ্ধ। ছোট ছোট প্যাকেটে মুড়ি পাওয়া যায় মাছেদের খাওয়ানোর জন্য। রুই মাছের পিঠটা কালো হয়, বিশাল বিশাল মাছে সারা পুকুর জুড়ে খেলা করে বেড়াচ্ছে, দেখে মনে হয় একটা কালো রঙের পুকুর। যেখানে মুড়ি দেওয়া হচ্ছে, সেখানে মাছ গুলো উল্টেপাল্টে গিয়ে খেতে যাচ্ছে, তখন ওই জায়গার জলটা পুরো সাদা রূপোলি লাগছে। রুই মাছের পেটের দিকটা সাদা। বড় বড় মাছগুলো নিজের আনন্দে ঘুরছে। ঠাকুর এখানে মতি শীলের ঝিলের কথা বলছেন।

মাছগুলি ক্রীড়া করে বেড়াচ্ছে, দেখলে খুব আনন্দ হয়। তোমার উদ্দীপন হবে, যেন সচ্চিদানন্দ-সাগরে আত্মারূপ মীন ক্রীড়া করছে। তেমনি খুব বড় মাঠে দাঁড়ালে ঈশ্বরীয় ভাব হয়। যেন হাঁড়ির মাছ পুকুরে এসেছে।

তাঁকে দর্শন করতে হলে সাধনের দরকার।

কিভাবে ঈশ্বরকে দর্শন করবেন? দর্শন পেতে হলে ঈশ্বরকে কি তুষ্ট করতে হবে না? ঈশ্বরকে যদি তুষ্ট নাই করা হয়, ঈশ্বর আসবেন কি করে? কোন না কোন ভাবে আপনার তাঁকে তুষ্ট করতে হবে, যেখানে তিনি এসে বলবেন, হে বৎস, আমি তুষ্ট, বল কি চাও? হিন্দুদের যে এত কথা কাহিনী, দেবীদেবতারা এসে বর দিচ্ছেন। এগুলো বাস্তবিক। ঠাকুরও এই কথাগুলো বারবার বলছেন।

আমাকে কঠোর সাধন করতে হয়েছে। বেলতলায় কত রকম সাধন করেছি। গাছতলায় পড়ে থাকতুম, মা দেখা দাও বলে, চক্ষের জলে গা ভেসে যেত। আমাদের অত কিছু তো করতে হবে না, কিন্তু কিছু তো করতে হবে। মাস্টারমশাই খুব সুন্দর কথা বলছেন।

মণি –আপনি কত সাধন করেছেন, আর লোকের কি একক্ষণে হয়ে যাবে? বাড়ির চারিদিকে আঙুল ঘুরিয়ে দিলেই কি দেয়াল হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) –অমৃত বলে, একজন আগুন করলে দশজন পোয়ায়। আর-একটি কথা, নিত্যে পৌঁছে লীলায় থাকা ভাল।

উদাহরণে এই রকমও হয়, আবার উদাহরণে তার উল্টোটাও হয়। ঠাকুর এই উদাহরণগুলো দিয়ে বোঝাচ্ছেন, এটা সত্য। মনে রাখবেন উদাহরণ দিয়ে সত্যে পৌঁছান যায় না, সত্যকে বোঝনর জন্য উদাহরণ নেওয়া হয়। আগুন পোয়ানোর এই উদাহরণের উল্টোটা যখন বলবে, তখন বলবে, আমি খেলে তোমার কি পেট ভরবে? অবতার আর সাধকে বিরাট তফাৎ। সাধকের যে সিদ্ধি এটা নিজের পেট ভরার মত। অবতারের যে সিদ্ধি, অবতারের যে সাধনা, এটা হল দশজনের মঙ্গলের জন্য। ঠাকুর এসে তৎকালীন সমাজের কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়ে দিলেন। এমন আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন, শীতের সময় দশজন এসে আগুন পোয়াচ্ছে। ঠাকুর এই যে বলছেন, নিত্যে পৌঁছে লীলায় থাকা ভাল, সেটার পরিপ্রেক্ষিতে মাস্টারমশাই প্রশ্ন করছেন।

মণি –আপনি বলেছেন, লীলা বিলাসের জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ –না। লীলাও সত্য। এটি একটি বিরাট বিষয়। ঠাকুর এই যে বলছেন, লীলাও সত্য, এই কথা বলে ঠাকুর কি বলতে চাইছেন? নিত্য কি? লীলা কি? লীলা কি বিলাসের জন্য? লীলা কি সত্য? লীলা কেন? লীলা বলতে বোঝায় বা কি? এই সব কিছুর উপর আমরা এবার পর পর আলোচনা করতে থাকব।

কিসে মানুষের ভাল হয়? মানুষ বলতে আমরা ধরে নিয়েছি আধ্যাত্মিক পথের কথা। এমনিতে সাধারণ মানুষের যা কিছু ভাল হওয়ার সব কর্মের দ্বারা হয়। গীতায় ভগবান বলছেন, *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*, আমার ভক্তের যাবতীয় যা কিছু দরকার সব আমি নিজে বহন করে নিয়ে যাই। বাকিদের তাহলে কে দেন? বাকিদেরও ভগবানই দেন। কিন্তু বাকিদের কর্মের মাধ্যমে দেন, তাদের কাজ করিয়ে দেন। সাধারণ মানুষ যেমনটি কর্ম করবে তেমনটি কর্মফল পাবে। কিন্তু যাঁরা ভক্ত তাঁরা রাজার ব্যাটা; ভক্ত হলেন রাজার ব্যাটা। ঠাকুর বলছেন, মাসে মাসে তাঁর মাসোয়ারা এসে যায়, রাজার ব্যাটাকে কাজ করতে হয় না। কিন্তু রাজার ব্যাটা হব কিভাবে? যাঁরা শুনছেন, আপনাদের মনে অনেকেরই প্রশ্ন হয়, কিভাবে আমি রাজার ব্যাটা হতে পারি, ভক্ত হতে পারি? কম বয়সে আমরা যখন এগুলো পড়তাম, বিশেষ করে যখন মাসোয়ারার কথা পড়েছিলাম, তখন আমারও খুব ইচ্ছে হত কিভাবে রাজার ব্যাটা হওয়া যায়। কথাটা তখন খুব ভাল লেগেছিল, কি সুন্দর কথা –রাজার ব্যাটা মাসোয়ারা পায়। কিন্তু তার জন্য আমাদের আগে রাজার ব্যাটা হতে হবে। এমনি এমনি সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে বসে গেলেই যে রাজার ব্যাটা হয়ে যাব, তা তো হয় না।

এর আগে ঠাকুর নিজের কথা বলতে গিয়ে বলছিলেন –তাঁকে দর্শন করতে হলে সাধনার দরকার। প্রথম কথাটাই হল সাধনা দরকার। রাজার ব্যাটা হওয়ার যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে প্রথমে এই ব্যাপারটা ভাল করে মাথায় বসিয়ে নিতে হবে –সাধনার দরকার। ভক্তরা এসে কত কথাই বলেন। তার সঙ্গে এই কথাটা বলা চাই –মহারাজ একটু আশীর্বাদ করবেন, ঠাকুরের কাছে একটু প্রার্থনা করবেন –মনে যেন সব সময় ঠাকুরই থাকেন, ঠাকুর ছাড়া যা কিছু আছে সব যেন মন থেকে বেরিয়ে যায়। এর থেকে বোকা বোকা প্রার্থনা আর কি হতে পারে। কারুর প্রার্থনাতে, কেউ আশীর্বাদ করলে আপনার মন থেকে যদি সংসার চলে যায়, মন থেকে সব কামনা-বাসনা যদি চলে যায়; তাহলে আর সাধনার কি দরকার? ঠাকুর নিজের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, আমাকে কি কঠোর সাধনাই না করতে হয়েছিল।

আমরা আগেও অনেকবার এই কথা বলেছি –উপমা দিয়া কখন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। উর্দুতে এটাকে নিয়ে একটা খুব সুন্দর প্রবাদ আছে –নিম হাকিম খতরে জান্। উর্দুতে নিম মানে

কাঁচা, হাকিম মানে বৈদ্য। যে বৈদ্যের অল্প জ্ঞান, তার হাতে রোগী মরবে। শাস্ত্রজ্ঞান যদি অল্প একটু থাকে, আপনি নির্ঘাৎ মরবেন। আচার্যের কাছে যদি অধ্যয়ন না করে থাকেন, গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা যদি না পেয়ে থাকেন, জানবেন –হাকিম খতরে জান্। ঠাকুর নিজে কি প্রচণ্ড তপস্যা করেছেন, নিজের শিষ্যদের দিয়ে কত সাধনা করিয়েছেন। সবটাই অপরের উপদেশের উদ্দেশ্যে যদি নেন, তাহলে আপনাকেও ওই ভাবে ধরে নিতে হবে, আপনাকেও ঠাকুর আদর্শ রূপে রেখেছেন অপরকে দেখানোর জন্য, তার মানে আপনাকেও সাধনা করতে হবে। ঠাকুরের যত শিষ্যরা ছিলেন, সবাইকে দিয়ে তিনি সাধনা করিয়ে নিয়েছেন। শ্রীশ্রীমাকে দিয়ে ঠাকুর কত সাধনা করিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ওই এক কথা –ওনারা তো আদর্শরূপে। চব্বিশ ঘন্টা সাধনা। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচ মিনিট আপনি যদি সংসার চিন্তা সংসার রূপে করেন, আপনাকে বুঝে নিতে হবে জিনিসটা এলেমেলো হয়ে গেল।

আমি যখন কম বয়সে রামকৃষ্ণ মিশনে জয়েন করি, তখন আমার একজন পরিচিত আমাকে দেখে ওনার চোখে জল এসে গেল। চোখের জল নিয়েই বলছে –বড় কঠিন গো, বড়ই কঠিন। বড় কঠিন গো কথাটা এত সুন্দর বলেছিলেন যে, এখনও আমারা দৃশ্যটা মনে আছে – বড় কঠিন পথ বেছে নিলে। মঠে নূতন ব্রহ্মচারী দেখলেই খালি ভাবতাম, হে ঠাকুর! কি করে এনাদের এত বড় জীবন চলবে? আমরা লড়াই করছি, আমরা জানি; কঠোর সাধন কি। একটু ফাঁক মানে, আপনাকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবে। আধ্যাত্মিক জীবন যদি বেছে নিয়ে থাকেন, এই পথে সফল যদি হতে চান তাহলে জেনে রাখুন, পুপুলার টকস্, পপুলার সেইংস, পপুলার আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং, এগুলো দিয়ে হয় না। নমো নমো করে সকাল-বিকাল দু-বেলা একশ আটবার জপ করে দিলাম, আমার দায়ীত্ব শেষ; এভাবে হয় না। গুরু আপনাকে একশ-আট জপ করতে বলে দিয়েছেন যাতে মন্ত্রটা না ভুলে যান।

দ্বিতীয় যেটা এখানে ঠাকুর বলছেন, সেটা হল লীলা; লীলাটাও সত্য। লীলা সত্য বলা মানে, এই সংসারটা সত্য, এটা মিথ্যা না। এই জিনিসটাকে বুঝে রাখা –সংসারে যত সমস্যা আছে, এর সব কটা সত্য। যত আকর্ষণগুলো রয়েছে, সব কটা সত্য। আপনার যে সাধনা, এটাও সত্য। তাহলে বেদান্তে কেন এই সংসারকে, এই জগৎকে মিথ্যা বলছেন? কিভাবে মিথ্যা, আমরা পরে দেখব।

তৃতীয় যেটা বলবেন ঠাকুর, তা হল –সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা। আমার আচার্য আমাকে প্রায়ই বলতেন, সাধুসেবার মত বড় পূণ্য আর হয় না। দেখবেন, আপনি যাঁর সঙ্গ করছেন, তাঁর কোন একটি কথা আপনার মনে গেঁথে যাবে। আমারও ওই কথাটা মাথায় গেঁথে আছে। আমি যখনই পারি, তখনই বয়সে ছোট হোক কি বড় হোক, যতটা পারি সেবা করি।

এই তিনটে জিনিস –প্রথম সাধনা; দ্বিতীয়, এই যে সংসার এটা তাঁরই লীলা, লীলাটাও সত্য। এটা টেকনিক্যাল টার্ম, যে অর্থে আমরা সত্য মনে করছি, সে অর্থে সত্য নয়। আবার মিথ্যা বলতে যেমন শূন্য বোঝায়, সেই শূন্যও না। তৃতীয় –সাধুসেবা। শুধু সাধুসঙ্গ না, সাধুসেবা। এই তিনটে যদি কেউ করেন, দেখবেন তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে উপরে উঠতে শুরু করে দিয়েছেন। যা কিছু আছে সব ভিতরেই আছে, বাইরে আর কি আছে! আলেকজাণ্ডার বলল, সে সারা বিশ্বকে জয় করবে। চেঙ্গিস খাঁ, হিটলার কত কিছু করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হল? কিন্তু যাঁরা ভিতরের দিকে গেলেন, অন্তর্জগৎকে জয় করলেন; যেমন ভগবান বুদ্ধ, আমাদের ঋষিরা, এনারাই যুগ যুগ ধরে পূজিত হয়ে আসছেন। এই তিনটি জিনিস যদি করা হয়, দেখবেন জীবন আপনার ধন্য হয়ে যাবে।

ঠাকুর বলছেন, তাঁকে দর্শন করতে হলে সাধনার দরকার। জীবনে বড় হতে চান? পুরোদমে সাধনা, সাধনা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। আমাকে একজন বললেন, 'আপনার গীতার ক্লাশগুলো শুনেছি, খুব ভাল লেগেছে, কিন্তু কাজ করতে গেলে হুঁশ থাকে না'। আমাদের একজন খুব বড় মহারাজকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'মহারাজ, ধ্যানের সময় কি আপনার কাজের কথা মনে পড়ে'? উনি খুব সুন্দর বললেন, 'কেন মনে পড়বে না, কাজের সময় তো ঠাকুরের কথা মনে পড়ে।

এগুলো মিলেমিশে রয়েছে কিনা'। ঠাকুর যেরকম সাধনা করেছিলেন, ওই সাধনা করা আমাদের পক্ষে একেবারেই সম্ভব না। ধ্যানের সময় সংসারের কথা আসবে, সংসারে থাকার সময় ঠাকুরের কথা মনে আসবে, এতে দোষের কিছু নেই। দরকার শুধু ভাব। আপনার মনের ভাবকে যদি ঠিক করা হয়, ধীরে ধীরে বাকি সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য যদি ঠিক থাকে, যেমন ধরুন আপনি কলেজে পড়ছেন, উদ্দেশ্য যদি পড়াশোনা করা হয়, তাহলে একটু যে ডানদিক বামদিক হচ্ছে, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু কোন উদ্দেশ্য নেই, কলেজে আসছেন, কলেজ যাচ্ছেন, থাকছেন, তাহলে কোনটাই হবে না।

মহাপুরুষরা বারবার বলে গেছেন সাধন করতে হয়। আপনি যদি নিজের মনের মত সব কিছু করে নেন, তাহলে তো আপনার শাস্ত্র রচনা করার সময় হয়ে গেল। আমার কাছে এমন অনেক ইয়ং ছেলেমেয়েরা আসে, বিশেষ করে যাদের 'চলবে না, চলবে না' বলে গলাবাজি করার ভাব আছে; এসে বলবে, হিন্দু ধর্মের এটা ঠিক না বা বলবে ভারতের এই জিনিসটা ঠিক না। আমি তখন বলি, 'ভাই তুমি একটা সংবিধান লিখে দাও। পুরোটাই লিখতে হবে, শুধু একটাকে নিয়ে বললে হবে না, পুরোটাই বলতে হবে'।

আমাদের একটা খুব মজার ঘটনা আছে –মঠের এক সেন্টারে স্বামীজীর একটা বড় মুর্তি স্থাপন করার কথা হয়েছে। যেমন করা হয়ে থাকে, প্রথমে একটা মডেল তৈরী করা হল। কিন্তু কোন কারণে স্বামীজীর মুখের একদিকটা ঠিক করতে গেলে অন্য দিকের মুখটা বেঁকে যায়। মুর্তিটা বম্বেতে তৈরী করা হচ্ছিল। তখন কলকাতা থেকে একজন বড় শিল্পী ও তাঁর সহকারীদের বম্বে নিয়ে যাওয়া হল। উনি গিয়ে দেখলেন। তারপর মুর্তিটা ঠিক করতে শুরু করলেন। পান চিবুতে চিবুতে উনি মুর্তিটা ঠিক করে দিলেন। ওখানকার শিল্পী বললেন, 'আপনি তো এটা ঠিক করে দিলেন, এবার অন্য দিকটা দেখুন'? একটা আপনার ঠিক হয়ে যাবে, দ্বিতীয়টা এলেমেলো হয়ে যায়। আপনি যদি সাধন-ভজন নিয়ে আপনার মত করে বলেন, সাধন-ভজন এই রকম হওয়া দরকার। অতটুকু বললে হবে না, পুরোটা বলুন। আর এখান-ওখান থেকে কপি করলে চলবে না, সবটাই আপনাকে নিজের থেকে লিখতে হবে। কিছু ঠাকুরের কথা নিলাম, কিছু গীতা থেকে নিলাম, কিছু উপনিষদের আর কিছু আমার মনের চিন্তা থেকে; এভাবে হয় না। যেটাতে যাবেন, পুরোটা আপনাকে নিজের মন থেকে লিখতে হবে। ভারতের সংবিধান যদি নেন, পুরোটাই আপনাকে নিতে হবে। আমাকে অনেক সময় কেউ কেউ বলেন, 'আপনি সাধু হয়ে এই রকম করছেন'? আমি তাঁকে বললাম, 'যে বইতে বলছে সাধুদের এই রকম করতে নেই, সেই বইতেই বলছে, গৃহস্থরা সাধুদের কখন উপদেশ দিতে যাবে না; মুখটা বন্ধ রাখুন'। নিলে পুরোটা নিন, একটা নেবেন না। বেছে বেছে নিজের মনের মত কথা নিতে নেই। আরও বাজে, নিজের মন থেকে যদি আপনি তৈরি করেন, আপনার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

ঠাকুর হেসে বলছেন, একজন আগুন করলে দশজন পোয়ায়; এটা ঠাকুরের মত নয়। আর-একটি কথা, নিত্যে পৌঁছে লীলায় থাকা ভাল। এগুলোকে বলা হয় technicalities of religion। ধর্মের দুটো রূপ, একটা রূপ হল যে রূপটা আমার কাজে লাগবে; আর একটা হল technicalities। শাস্ত্র হলেন মা, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভাণ্ডার। কথামৃত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভাণ্ডার, যেমন আমরা জানি কুবের বিরাট বড়, আমাদের ভাষায়; ভগবান তাঁর থেকেও বড়। কথামৃতে অনেক ধরণের কথা আছে। উপনিষদ হোক, কথামৃত হোক, গীতা হোক, কথাগুলোকে আপনি যেমনি বাছতে শুরু করবেন, দেখবেন পরিষ্কার দুটো জিনিস বেরিয়ে চলে আসবে –একটা হল যেটা আমার লাগবে, আর-একটা হল technicalities। এই কথাগুলো ধর্মের technicalitiesএর মধ্যে পড়ে।

Technicalitiesকে নিয়ে যখন লোকেরা প্রশ্ন করেন, আমি তখন অসন্তুষ্ট হয়ে যাই; আপনার অতশত জেনে কি হবে? আপনি নিজে যদি একটু গভীরে যান, নিজেই এর উত্তরগুলো পেয়ে যাবেন। কিন্তু শুনে রাখতে হয়। যখন জানবেন পুরোটাই জানতে হবে। কিন্তু ওগুলোকে বুঝতে গিয়ে আপনার

মনের পুরো শক্তিটাই যদি চলে যায়, তখন সমস্যা হয়ে যাবে, তখন এটাও যাবে ওটাও যাবে। লীলা যদিও এটা technicalitiesএর মধ্যে পড়ে, তবে একটা জায়গায় আমাদের যোগ আছে, যেটা বললাম, জীবনে যদি বড় হতে চান, এটা বুঝলে কাজে লাগে। কি রকম, বলছেন, নিত্য থেকে লীলা, যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, সমাধিতে যিনি চলে গেছেন; তিনি অনেক সময় ওখান থেকে নেমে এসে সংসারটাকে ধরে রাখেন।

মণি –আপনি বলেছেন, লীলা বিলাসের জন্য। ঠাকুর হয়ত ঠিক এই রকম বলেননি। ঠাকুর কোথাও হয়ত বিলাস কথাটা বলেছেন, কোথাও লীলা বলেছেন, দুটো শব্দ মিশে গেছে। আমাদের এই সমস্যাটা হয়, অনেক সময় আমরা পুরনো কথাকে মিশিয়ে ফেলি। যতক্ষণ না আপনি ওই বিষয়ের মাস্টার না হন, শব্দগুলো মিশে যায়। ঠাকুরও তাই সঙ্গে সঙ্গে আটকে দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারমশাইকে আটকে দিয়ে বলছেন –**না। লীলাও সত্য**। যখন এই জিনিসগুলো আসে, লীলাও সত্য; নিত্য মানে শুদ্ধ আত্মা, ঈশ্বর, সচ্চিদানন্দ। ঠাকুর স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ বলতেন; নিত্য হল মহাকারণ। স্থূল হল এই শরীরের জগৎ, যে জগৎটা আমরা সামনে দেখছি। সূক্ষ্ম হল মন আর ইন্দ্রিয়ের জগৎ। কারণ জগৎ হল যেখানে ঈশ্বরকে পরিষ্কার দেখা যায় কিন্তু একটা ব্যবধান থাকে, এটাও কিন্তু মনের জগৎ। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ তিনটেই মনের জগৎ। মহাকারণ মনের পারে। যাঁরা আমার ক্রতু বই পড়েছেন, সেখানে দেখবেন এর একটা খুব সুন্দর বর্ণনা আছে; ক্রতু কিভাবে কারণ জগৎকে ভেঙে এগোতে পারছে না এবং পারলও না। নিত্য হল মহাকারণ। লীলা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ তিনটেই।

সমস্যা হল, বেদান্তে বলছেন, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা; মহাকারণ সত্য বাকি সব মিথ্যা। ভক্তিশাস্ত্র এভাবে চলবে না, তন্ত্রতো কোন মতেই এটাকে মানবে না। তাহলে সত্যটা কি? বেদে খুব নামকরা পুরুষসূক্তম্ আছে, সেখানে সৃষ্টিকে নিয়ে বলে খুব সুন্দর বলছেন, *এতাবানস্য মহিমা*। মহিমা মানে বিস্তার, মহিমা হল ঐশ্বর্য। যখন আমরা বিলাস বলছি, তখন এই বিলাস কিন্তু মিথ্যা। এই যে বলছেন, লীলা বিলাসের জন্য, যেমন আপনি হিমালয় বেড়াতে গেলেন, বিলাসের জন্য গেলেন। পার্কে ঘুরতে গেলেন, বিলাসের জন্য গেলেন। বাজারে এমনি ঘুরে ঘুরে সব দেখছেন, বিলাসের জন্য। কিন্তু সেই বাজারেই আবার সংসারের প্রয়োজনে কাজের জিনিস কিনতে যাচ্ছেন। লীলাকে তাই লোকেদের অনেক সময় মনে হয় বিলাস। লীলা বিলাস না, লীলা সত্য। কেন? *এতাবানস্য মহিমা*। এই যা কিছু দেখছি, এটা ভগবানেরই প্রকাশ, এই জগৎ, এই সংসার ভগবানেরই বিস্তার।

অত্যন্ত একটা সহজ উদাহরণ দিলে ভাল বুঝতে পারবেন। ঠাকুর সাধনা করছেন, তখন তিনি টাকা মাটি মাটি টাকা বলে একটা টাকা আর মাটির একটা ডেলা নিয়ে দুটোকেই জলে ফেলে দিলেন। টাকা কি কখন মাটি হতে পারে? মাটি কি কখন টাকা হয়? কখন হয় না। শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে থাকার সময় ভক্তরা মাকে প্রণামী পাঠাতো। পিওন এসে টাকা দিলে মা ওই টাকা মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করে তুলে রাখতেন। ঠাকুর টাকা-পয়সা ছুঁতে পারতেন না, টাকা মাটি মাটি টাকা বলে টাকা ত্যাগ করলেন। পরে আবার ঠাকুরের ভয় হল, পাছে মা লক্ষ্মী রাগ করে খ্যাঁট বন্ধ করে দেন। তখন বললেন, মা তুমি হৃদয়ে বাস কর। একজন বললেন, এটা তো পাটোয়ারী। ঠাকুরও বলছেন, হ্যাঁ ওইটুকু পাটোয়ারী। কিন্তু শ্রীশ্রীমা কোন দিন টাকাকে মিথ্যাও বললেন না, পাটোয়ারীও করতে গেলেন না। ঠাকুর ও মায়ের জীবনের এই একটি উপমা যদি মনে থাকে, তাহলে নিত্য ও লীলা কি, সব সময় পরিষ্কার থাকবে। ঠাকুর বস্তু রূপে টাকা ও মাটি দুটোকে ত্যাগ করেছেন। মা ব্রহ্ম রূপে টাকাকে গ্রহণ করেছেন।

টাকা হল মা লক্ষ্মী, যার জন্য কক্ষণ টাকার অপচয় করতে নেই। টাকার যদি কেউ অপচয় করে, তাহলে সে দেবীর অপমান করছে। ঠাকুর যখন বস্তুরূপে টাকাকে ত্যাগ করলেন, তখন তাঁর মনে হল, টাকার তো একটা লক্ষ্মী রূপও আছে; তিনি তখন বলছেন, মা তুমি হৃদয়ে বাস কর। আমি যখন

ক্লাশ ফাইভ কি সিক্সে পড়ি তখন এই ঘটনাটা পড়লাম, টাকা মাটি মাটি টাকা শুনে খুব মজা লাগল। কিন্তু জিনিসটা যে কত গভীর বোঝা দরকার। বস্তু রূপে ত্যাজ্য, ব্রহ্ম রূপে অবশ্যই গ্রাহ্য।

মা জগজ্জননী, তিনি লীলার মধ্যে আছেন, পুরো সৃষ্টিটা লীলার মধ্যে ঘুরছে। যিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, যিনি ব্রহ্ম তিনিই এখানে মা লক্ষ্মী রূপে আছেন। লীলাতে মা লক্ষ্মী রূপে সেই ব্রহ্মই আছেন, সেই ঈশ্বরই আছেন; সেখানে মাটি আর টাকাকে এক করে ফেলে দিলে তো তাঁর অপমান হয়ে যাবে। এখানে তিনটে জিনিস –টাকার একটা হল তার বস্তু রূপ, টাকার একটা হল দেবীর রূপ, মা লক্ষ্মী আর তৃতীয় টাকা ব্রহ্ম। বস্তু রূপে ত্যাজ্য। জ্ঞান সাধনা যাঁরা করেন, আমি, আপনি সবাই যে সাধনা করছি, তা যে পথের সাধনাই হোক, কোথাও তো এটাকে ত্যাগ রূপে নিতেই হবে। কিন্তু আবার অন্যটাও আছে। ঠাকুর যেমন একজনকে সাবধান করছেন, বেশি ওর কাছে যাসনি, বেশি বাৎসল্য ভাব থেকে তাচ্ছল্য ভাব হয়। বেশি যদি আপনি ব্রহ্ম রূপ ব্রহ্ম রূপ করতে থাকেন, কোথাও যে এলেমেলো হয়ে যাবে আপনাকে বুঝতেও দেবে না। কখন ব্রহ্ম বস্তু রূপ নিয়ে দড়ি হয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে দেবে।

সেইজন্য প্রথমের দিকে বস্তু রূপে ত্যাগ করতে হয়; আদপেই যদি কিছু নিতে হয়, তবে মা লক্ষ্মী রূপে নিতে হবে। কিন্তু একবার নিত্যে পৌঁছে যাওয়ার পর, মহাকারণের জ্ঞান যখন হয়ে গেল, তখন ওটাকে ব্রহ্ম রূপে নেওয়া যায়। এটাই বলছেন –লীলা বিলাসের জন্য নয়, লীলা সত্য। এই জিনিসগুলিকে সবাইকে বুঝে নিতে হয়। যাঁরা চাকরি করছেন, কাজকর্ম করছেন, তাঁদের এটা মনে রাখতে হয়ে যে, এই জগৎ বস্তু রূপে ত্যাজ্য, দেবী রূপে পূজ্য এবং ব্রহ্ম রূপে গ্রাহ্য, গ্রহণ করার যোগ্য। কিন্তু আমরা এখনও মহাকারণে পৌঁছাইনি, আত্মজ্ঞান উপলব্ধ হয়নি বলে ব্রহ্ম রূপে গ্রহণ ব্যাপারটাকে আটকে রাখতে হয়। কিন্তু জানতে হয় যে, আসলে এটা ব্রহ্ম। নানা রকমের লীলা, খেলা এগুলো যে চলছে, এখানে বস্তু রূপে ত্যাগ ও দেবদেবী রূপে গ্রহণ করা যায় ঠিকই, তবে একটু দূরে থাকাই ভাল, বেশি জড়াতে নেই। আপনি যদি পুরোপুরি বলে দেন এগুলো মিথ্যা, তাহলে তখন এটা হয়ে যাবে শূন্য। আপনার দেবীদেবতা যদি শূন্য হয়ে যান, ব্রহ্মও তখন থাকবে না। একটু চিন্তা-ভাবনা করলে এগুলো পরিষ্কার হয়ে যায়, এগুলো এমন কিছু রকেট সাইন্স না।

ঠাকুর একটা খুব ছোট্ট কথা বললেন –লীলাও সত্য। এই জিনিসগুলিকে বুঝতে হয়, কেন ঠাকুর এমন কথা বলছেন। শুধু টাকা মাটি মাটি টাকা আর শ্রীশ্রীমা টাকাকে মাথায় ঠেকিয়ে রাখা, এই জিনিসটা যদি মনে রাখেন পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার থাকবে। তার মানে জগতে সব সময় আপনাকে খুব সাবধান থাকতে হবে। কাজকর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে। শুধু যে তাঁর প্রতি সম্মানের ভাব থাকবে তা না, পূজোর ভাব থাকবে। সাধনা করে করে আরও যখন উপরে যাবেন, তখন ব্রহ্ম ভাব, তখন অন্য রকম হয়ে যায়। ঠাকুর মাস্টারমশাইকে আরও অনেক কথা বলছেন।

আর দেখ, যখন আসবে, তখন হাতে করে একটু কিছু আনবে। হয় মাস্টারমশাই এই জিনিসটা জানতেন না, নয়তো তিনি অতটা মানতে চাইতেন না, লোকে গোঁড়া মনে করবে বলে; কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে খালি হাতে যেতে নেই। আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, দেখতাম ওনার কাছে অনেক ভক্তরা আসতেন, অভাবে আছেন এমন ভক্তরাও আসতেন। মহারাজ কিন্তু সবাইকে বলতেন, কিছু যদি না পারো একটা হরিতকী বা আমলকী নিয়ে আসবে। কিছু একটা নিয়ে আসতে হয়, খালি হাতে সাধুর কাছে আসতে নেই।

নিজে বলতে নাই, অভিমান হয়। ঠাকুরের অভিমান হচ্ছে না, কিন্তু যাঁরা শুনছেন তাঁদের ঠাকুরের ব্যাপারে ওটা মনে হতে পারে, তাতে তাঁদের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। সেইজন্য নিজের মুখে বলতে নেই, ঠাকুর তাই সব সময় বলতেন, এখানকার জন্য। তা নাহলে লোকেরা মনে করবে, তিনি নিজেকে এত বড় মনে করছেন, আমি সাধু, আমার জন্য এটা নিয়ে আসবে।

অধর সেনকেও বলি, এক পয়সার কিছু নিয়ে এস। ভবনাথকে বলি, এক পয়সার পান আনিস। কিছু একটা নিয়ে যেতে হয়। বাড়িতে হয়ত টাকা-পয়সা নেই, সেখানেও একটা হয়ত আমলকী বা হরিতকী, কিছু একটা নিয়ে আসতে হয়; সাধুদের কাছে খালি হাতে যেতে নেই। যাঁরা সাধু সন্ন্যাসী, তিনি যেমনই হন না কেন, এখানে তিনি হলেন ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিরূপ। ভগবান যাঁকে ভালবাসেন, ভগবান যাঁকে আপন মনে করেন, ঠিক ঠিক যাঁরা ভক্ত, তাঁকে দিয়ে তিনি কিছু করিয়ে নেন। আমরা অতি সাধারণ মানুষ, আমাদের পক্ষে কি সম্ভব যে মায়া ভেদ করতে পারব? সমাধিতে পৌঁছাতে পারা আমাদের দ্বারা কি সম্ভব? আমরা মায়ের অবোধ সন্তান, মা আমাদের দিয়ে করিয়ে নেন। আগে তার জন্য রাজার ব্যাটা হতে হয়।

কিভাবে করিয়ে নেন? সুদামা কৃষ্ণের জন্য চিড়া নিয়ে এসেছেন। চিড়ার পুটলিটা লুকিয়ে রেখেছেন, লজ্জা করছে শ্রীকৃষ্ণকে এই সামান্য কটি চিড়া দিতে। ভগবান ভক্তবৎসল, ভক্তের মনের সব খবর জানেন। সুদামাকে জিজ্ঞেস করছেন, 'বৌদি আমার জন্য কি পাঠিয়েছেন'? তারপর তিনি সুদামার কাছ থেকে জোর করে চিড়ার পুটলিটা ছিনিয়ে নিলেন। বৃন্দাবনের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাখন চুরি করছেন। খেতে পারছেন না, মাখনের হাঁড়ি ভেঙে দিচ্ছেন। তাতে কি হয়েছে, ভগবানেরই তো গ্রহণ করা হয়ে গেল। ঠাকুরকেও দেখবেন কখন বলছেন, আমার পাটা কামড়াচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও তো গা। যাঁরা সংসারে আছেন, যাদের কাছে ভোগবিষয় হল শেষ কথা, তারা এগুলো ঢপবাজি মনে করে, এগুলোকে তারা মানতে চায় না। সব কিছুর উপর তাদের কাছে একটা ব্যাখ্যা আছে। পা ছুলে নাকি হাতে ব্যাকটেরিয়া লেগে যায়। অথচ করমর্দন করলে হয় না; আশ্চর্য লাগে। শুধু সাধুদের কাছেই না, কোন মন্দিরে, কোন পীঠস্থানে গেলে কিছু একটা দিতে হয়, ফল হোক, মিষ্টি হোক, টাকা-পয়সা হোক, কিছু না কিছু একটা দিতে হয়। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, ভবনাথকে বলি, এক পয়সার পান আনিস। ঠাকুর ভবনাথকে দিয়ে সেবা করিয়ে নিচ্ছেন। এই যে সেবা করিয়ে নিচ্ছেন, এতে ভবনাথেরই উন্নতি হবে। ভবানাথের কথা বলতে বলতে ঠাকুরের মন ভবনাথের দিকে চলে গেল।

ভবনাথের কেমন ভক্তি দেখেছ? নরেন্দ্র, ভবনাথ –যেমন নরনারী। ভবনাথ নরেন্দ্রের অনুগত। সেখান থেকে আবার নরেন্দ্রের দিকে মনে চলে গেল, বলছেন, **নরেন্দ্রকে গাড়ি করে এনো**। নরেন্দ্রের তখন খুব অভাব চলছিল। **কিছু খাবার আনবে। এতে খুব ভাল হয়**। আবার ঠাকুর মাস্টারমশাইকে সেই এক কথা বলছেন।

এই হল উপায়। এই কয়েকটি জিনিস –সাধন, জগৎ তাঁর লীলা, জগৎকে জানা; বস্তু রূপে ত্যাগ, দেবদেবী রূপে গ্রহণ আর ব্রহ্ম রূপে শেষ গ্রহণ। আর তার সাথে সাধুসেবা। অনেকে বলে সাধুদের সেবা করা থেকে দীনদুখীদের সেবা করা অনেক ভাল। গরীবদের যখন দেওয়া হয় তখন বেশির ভাগ সময় দাতা মনে করে আমি তাকে কৃতার্থ করছি। সাধুদের যখন দেওয়া হয়, তখন ও-রকম ভাবার সাহস হবে না। আগেও একটা ঘটনার কথা বলেছিলাম। বম্বের এক বড় শেঠজী মঠের কাজে কিছু দান করবেন। শেঠজীর কাছে মঠের একজন মহারাজ গেছেন। শেঠজী বলছেন, 'ওখানে টাকা আছে তুলে নিন'। মহারাজ খুব কড়া ভাবে বললেন, 'We are beggars but we are royal beggars। ওখান থেকে তুলে নিন, কি বলতে চাইছেন? আমি ভিখারী নাকি, আমরা রয়েল বেগারস্, আমরা নিলে আপনি ধন্য হয়ে যাবেন'। এরপর ঠাকুর চলে যাচ্ছেন, জ্ঞান ও ভক্তিপথের আলোচনায়।

এই যে বলা হল লীলাও সত্য, আবার জ্ঞানপথে এই লীলাই মিথ্যা হয়ে যায়। জ্ঞানপথ, ভক্তিপথ এগুলো উঁচু কথা। আমরা অতি সাধারণ মানুষ, আমরা সাধারণ জিনিস নিয়ে থাকি। তাহলেও, ঠাকুর যখন বলেছেন, তখন সেখানে আমাদের একটা ব্যাখ্যা করা দায়ীত্ব এসে যায়। বস্তু রূপ আর ব্রহ্ম রূপ বলা হল। ভক্ত ব্রহ্মরূপে চলেন, ইতি ইতি পথ নেন। জ্ঞানী বস্তুরূপে চলেন, জ্ঞানপথে সবটাই বস্তু দেখা হয়, সেইজন্য সব কিছু ত্যাজ্য আর ত্যাগ। এটাকেই জ্ঞানপথে নেতি নেতি বলা হয়। যিনি ব্রহ্ম,

সে যেন সীমাহীন সমুদ্র, সেই অনন্ত সমুদ্রে যে ঢেউ উঠছে তা যেন উত্তাল তরঙ্গ; তরঙ্গ দেখেই আমরা মুগ্ধ। কিন্তু সমুদ্র আরও বিশাল। এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, যেটাকে লীলা বলা হয়ে থাকে, এই লীলা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। ফলে এর পিছনে যে বাস্তব, সেটাকে আমরা দেখতে পাইনা। যাঁরা ভক্ত, এটাকে তাঁরা অন্য ভাবে নেন। কবীর দাসের খুব সুন্দর কথা আছে – দরীয়াব্ লহর দরীয়াব্ হ্যায় জী, নদীর ঢেউ আর নদীতে কোন তফাৎ নেই। এটাই ভক্তিপথের দৃষ্টিভঙ্গী। জ্ঞানী বলেন, আমার ঢেউ লাগবে না।

ঠাকুর বলছেন, **জ্ঞান ও ভক্তি দুই-ই পথ। ভক্তিপথে একটু আচার বেশি করতে হয়**। কিছু কিছু গ্রন্থ আছে, যাতে জ্ঞানপথের কথা বলা হয়; সেখানেও বলেন, এই করতে হবে, সেই করতে হবে। কিন্তু যেখানে এই করত হবে সেই করতে হবে আছে, সেগুলোই অত্যন্ত উচ্চমানের কথা। আমাদের একটা বই আছে বেদান্তসার। আমি যখন ট্রেনিং সেন্টারে ছিলাম, তার মানে ১৯৮৫ সালের কথা, তখন আমাদের বেদান্তসার পড়তে হয়েছিল, পরীক্ষাও দিতে হয়। তারপর আর জীবনে বেদান্তসার পড়িনি। শাস্ত্র ছেড়ে বেদান্তসার পড়বে, শাস্ত্র ছেড়ে বিবেকচূড়ামণি পড়বে? এগুলো প্রকরণ গ্রন্থ। বেদান্ত কে পড়তে পারেন? মুমুক্ষুরা। আমি তো মুমুক্ষু নই। ঠাকুরের পায়ে আশ্রয় নিয়েছি এই পর্যন্ত ঠিক আছে। মুমুক্ষু হওয়া কি এতই সহজ? আপনি বলবেন, আপনার একটু তো ঈশ্বরের পথে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। তাহলে মুমুক্ষু কোথায় হল? ঠিক এইজন্যই বলা হয় জ্ঞানপথ সবার জন্য নয়। কার জন্য, সেটাও ঠিক জানি না। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে চারটে যোগই পড়ান হয়। একজন ছাত্র একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'রাজযোগে যেমন খুব সুন্দর ভাবে পর পর সাজানো আছে, কোনটার পর কোন কোন বিঘ্ন আসবে, এই রকম জ্ঞানযোগে কি আছে'? আমি বললাম, 'শুধু জ্ঞানযোগেই না; জ্ঞানযোগেও নেই, কর্মযোগেও নেই'। ভক্তিযোগে ওটা কোন ভাবে নিজের মত ম্যানেজ করে নেওয়া যায়। রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামীজী চারটে যোগের কথা বললেন, একশ বছর ধরে চারটে যোগের উপর মহারাজরা বলে যাচ্ছেন। চারিদিকে দেখবেন চারটে যোগের উপর কত লেকচার, কত ক্লাশ হচ্ছে; অথচ এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার করে যে বলবেন কি কি স্টেপস, সেটা কোথাও পাওয়া যাবে না।

রাজযোগ পর পর বলছেন কিভাবে একটার পর একটা ধাপ আসছে। রাজযোগে প্রথম থেকে বলে যাচ্ছেন কি কি করতে হবে, যেমন যম, নিয়ম, আসনের কথা বলছেন; পর পর এগোচ্ছেন। আবার কি কি বিঘ্ন আসবে, ব্যাধি, স্ত্যান, নিদ্রা ইত্যাদির কথা বলছেন। তারপর সমাধির পর পর কি কি ধাপ আসবে; বিতর্ক, বিচার, আনন্দ, অস্মিতা বিভিন্ন সমাধির কথা বলে যাচ্ছেন। এগুলো সব উন্নতির ধাপ। জ্ঞানযোগে আপনি এগুলো কোথাও পাবেন না। এমনকি ভক্তিযোগেও নেই। তবে ভাগবত আদি পড়লে নবধা ভক্তির কথা পাওয়া যায়। ভক্তিযোগে কিছুটা আছে, তাও এত সুন্দর করে পরিষ্কার করে বলা নেই। একশ বছরে আমরা এটাও করতে পারিনি। খালি চারটে যোগের কথা, সিন্থেসিস অফ ফোর যোগস্ বলেই যাচ্ছি। এই যে ভক্তিযোগ, এর systematic কি হবে পুরোপুরি জানা নেই, জ্ঞানযোগে তো একেবারেই জানা নেই। আর বেদান্তসারে যা কিছু আছে, totally confusing।

তরকারিতে একটু নুন কম হলে আমাদের মেজাজ গরম হয়ে যায় আর অন্য দিকে বলছেন, *ইহ অমুত্র*, এখানে অর্থাৎ সংসারে সর্ব প্রকার সুখ ত্যাগ, তবে নাকি জ্ঞানপথে যাবে। জ্ঞানপথে সাধনা করার জন্য যা যা দরকার সেখানে আমি জীবনে পৌঁছাতেই পারব না। ঋষিরা কক্ষণ কাউকে নিরুৎসাহ করার জন্য এই ধরণের কথা বলবেন না, ঠাকুরও কক্ষণ এ-রকম বলবেন না। যাঁরা ঋষি, যাঁরা অবতার তাঁরাও এ-রকম বলবেন না; কিন্তু মাঝখানে আচার্যরা এসে সব এলেমেলো করে দেন। ঋষি আর আচার্যের মধ্যে বিরাট তফাৎ। এই কারণে এই বইগুলোকে আমি বিশ্বাস করি না। ট্রেনিং সেন্টারে পড়তে হয়েছিল বলে বেদান্তসার পড়েছিলাম, জীবনে আর কোন দিন পড়িনি। এনাদের কথা বিশ্বাসই করা যায় না। কোনটা তুমি শাস্ত্রের কথা বলছ, কোনটা তুমি মনের কথা বলছ, কোনটা তুমি অজ্ঞানের কথা বলছ বলা মুশকিল। শাস্ত্র তা নয়, শাস্ত্র হলেন মা। মা জানে কার পেটে কি সয়, মা তার মত করে বলবে। ঠাকুরের কাছে সাধারণ লোক এসে বলছে, ঈশ্বরদর্শন কিরূপ? ঠাকুর তাঁকেও বলছেন। কিন্তু

সদানন্দ যিনি লিখেছেন, বেদান্তসারে প্রথমেই বলছেন *ইহামুত্রফলভোগবিরাগ*, এই সংসারে, আর মৃত্যুর পর যে ভোগ সব ত্যাগ করতে হবে। সাধারণ লোক বলবে, আমি তো আমার স্ত্রী-পুত্রকে ছাড়তে পারছি না, আমার তাহলে কি হবে? তোমার দ্বারা হবে না। কিন্তু এটাই যখন ঋষিমুখে আসবে, কঠোপনিষদে দেখবেন সেখানে এভাবে বলবেন না, অন্য ভাবে যাবেন। এখানেই ঋষি আর আচার্যের বিরাট তফাৎ হয়ে যায়। যার জন্য আচার্যদের কথা আমি মানতে চাই না। শঙ্করাচার্য কিন্তু আচার্য নন, তিনি ঋষি।

ঠাকুর বলছেন, **ভক্তিপথে একটু আচার বেশি করতে হয়**। এই আচার হল তাঁদের জন্য যাঁরা ধর্ম জীবনে নূতন প্রবেশ করছেন। আমরা ছোটবেলা দেখতাম, আমাদের দিদিমা, ঠাকুরমা, পিসিমা সন্ধ্যেবেলা তুলসীতলায় গিয়ে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিচ্ছেন, ধুপ দিচ্ছেন। ছোট বাচ্চা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাবে, গিয়ে বলবে, আমাকেও করতে দাও। ওটা তখন ওর কাছে একটা খেলা। এই খেলা থেকেই ধীরে ধীরে সে আচার অনুষ্ঠানে প্রবেশ করতে শুরু করে। এই আচার পালন করতে করতে মন একটা প্রস্তুতি নিয়ে নেয়; সেখান থেকে সাধনা শুরু করে। আচার বেশি করতে হয় প্রথম অবস্থায়, একটা অবস্থার পর আর প্রয়োজন হয় না।

জ্ঞানপথে যাঁরা যাবেন তাঁদেরকে ঠাকুর সাবধান করে দিচ্ছেন, **জ্ঞানপথে যদি অনাচার কেউ করে, সে নষ্ট হয়ে যায়**। ভক্তিযোগ সংসারকে মেনে চলেন, ওনারা জানেন আমার পক্ষে ত্যাগ সম্ভব না। আমার স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, ধন, সম্পদ, ঘরবাড়ি সব আছে, সেইজন্য ভক্তিপথে সমস্ত ত্যাগের কথা বলা হয় না। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে সেখানে আবার পরিষ্কার বলছেন, *অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে*, যাঁদের দেহবোধ আছে তাঁদের দ্বারা জ্ঞানপথের সাধনা বা অব্যক্ত সাধন সম্ভব না। জ্ঞানপথে একটু যদি অনাচার করেছেন, শেষ। ঠাকুর এবার শেষ কথা বলছেন –**বেশি আগুন জ্বালালে কলাগাছটাও ভিতরে ফেলে দিলে পুড়ে যায়**। বলতে চাইছেন, আত্মজ্ঞানে পৌঁছে যাওয়ার পর এগুলো আর কোনটাই দরকার পড়ে না।

জ্ঞানীর পথ বিচারপথ। বিচার করতে করতে নাস্তিকভাব হয়তো কখন কখন এসে পড়ে। সবটাই ত্যাগ করে যাচ্ছেন, তখন একটা অবস্থায় গিয়ে নাস্তিকভাব এসে যায়। নেতি নেতি করতে করতে অনেক সময় বৌদ্ধদের শূন্যবাদের দিকে চলে যায়, তখন মনে হবে ত্রিকাল মে জগৎ নেহি; জগৎ মিথ্যা, ভগবানও মিথ্যা। বৌদ্ধরা সব সময় শূন্যবাদের কথা বলে, কিন্তু অনুশীলন করে ঘোর ভক্তির। বেদান্তী সাধুরা বলে জগৎ মিথ্যা, তখন আমার খুব হাসি পায়। জগৎ মিথ্যা হ্যায়, কিন্তু খাবার সময় একটুও ডানদিক বামদিক হওয়া চলবে না। মুখে বড় বড় কথা, জগৎ মিথ্যা হ্যায়। বৌদ্ধরা বলবে, শূন্যবাদ, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ অন্য দিকে বৌদ্ধের কত রকমের রিচুয়ালস যে হিন্দুদেরও হার মানিয়ে দেয়। তবে হ্যাঁ, নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের আদর্শ, উপাচার সব কিছুকে ধরে রেখেছে।

ভক্তের আন্তরিক তাঁকে জানবার ইচ্ছা থাকলে, নাস্তিকভাব এলেও সে ঈশ্বরচিন্তা ছেড়ে দেয় না। এই কথাটা অত্যন্ত দামী কথা। আমাকে এক মহারাজ একটা ঘটনা বলেছিলেন। একবার একজন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন কারণে মহারাজের সামনেই ঝগড়া হয়েছিল, মামলা-মকোদ্দমার কি একটার ব্যাপার ছিল। পরে ওই মহিলাই একটা কথায় বলছেন যে, 'আমি চাই না যে আমার স্বামীর কোন ক্ষতি হোক; যতই হোক মহারাজ এক সময় ভালবেসেছিলাম তো'। অনেক আগেকার কথা, ভদ্রমহিলার কথাটা শুনে আমার এত ভাল লেগেছিল যে, এখনও আমার মনে আছে। সত্যিই তো তাই, আপনি যদি এক সময় কাউকে ভালবেসে থাকেন, তার ক্ষতি আপনি কোন দিন চাইবেন না। তাকে আপনি ছেড়ে দিতে পারবেন না, তার প্রতি আপনার মনে হিংসা ভাব আসবে না; যদি কোন দিন আপনি তাকে ভালবেসে থাকেন। যার জন্য যখনই আমি দেখি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হিংসার ভাব এসেছে, আমি বুঝি নিই, এরা কখন পরস্পর কেউ কাউকে ভালবাসেনি; ভালবাসার ভাণটুকুও পর্যন্ত করেনি। অন্যজন যে, তার মনে হয়েছে যে, সে আমাকে ভালবাসে, কিন্তু তার মধ্যে সেই ভালবাসাটাই ছিল না।

ঈশ্বরকে যে ভালবেসেছেন, প্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের যিনি নামগুণগান করেছেন, চলতে চলতে কোন ভাবে যদি তাঁর মধ্যে নাস্তিক ভাব এসে যায়; জ্ঞানীদের এলে তো সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে, কিন্তু যে ভক্ত, তার নাস্তিকভাব এলে তাও সে ঈশ্বরকে ছাড়ে না, ঈশ্বরকে সে ভালবেসেছে কিনা। আপনারা যাঁরা এই ক্লাশ শুনছেন, আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা ভক্ত, ঠাকুরের প্রতি আপনাদের ভক্তি আছে। আপনাদের মধ্যে যাঁরা দীক্ষা নিয়েছেন, আমি ধরে নিচ্ছি পূজা আদি করার জন্য আপনাদের একটা ছোট্ট ঠাকুরঘর আছে, যেখানে ঠাকুর, মা, স্বামীজী ও আপনার গুরুদেবের ছবি আছে। সেখানে ওনাদের সঙ্গে হয়ত আরও কিছু বিগ্রহ আছে, যেমন শালগ্রাম শিলা, শিবলিঙ্গ আদি। যখন আপনি নিত্যসেবা করছেন, ঠাকুর-দেবতাদের সব পট কাপড় দিয়ে মুছে দিচ্ছেন, গঙ্গাজল ছিটোচ্ছেন, একটু ফুলচন্দন দিচ্ছেন, ধুপধূনো দিচ্ছেন। এইভাবে নিত্যসেবা আপনি দশ বছর পনের বছর ধরে করে যাচ্ছেন। কোন কারণে একদিন মনটা অন্য রকম হয়ে গেছে, তাহলে কিন্তু মোমেন্টাম্ ওটাই আপনাকে দিয়ে করিয়ে নেবে। একটু নমো নমো করে করলেও আপনি করবেন। এই নিত্যসেবাতে কি হয়, ওই যে একটা নাস্তিকতার ভাব কিছুক্ষণের জন্য এসেছিল, ওই ভাব উড়ে যায়, আর আপনার মনটাও আবার ওইখানে জুড়ে গেল। ভক্তিতে একটা আনন্দের ভাব আছে কিনা, একটা দিব্যরস আছে। যাকে ভালবেসেছেন, তার সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ হয়ে যেতেই পারে, পুরোপুরি কিন্তু কখনই ছেড়ে দেওয়া যায় না।

সাধন জীবনে যদি এগোতে হয়, কিভাবে আপনি উপরে উঠবেন, কিসে আপনার ভাল হবে যদি জানতে চান, তাহলে এটা জেনে রাখুন –আপনাকে ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। আমাদের খুব নামকরা ও বড় পণ্ডিত মহারাজ স্বামী আত্মানন্দজী মহারাজ, রায়পুরে ছিলেন। হিন্দি, ইংরাজী ও বাংলা তিনটি ভাষাই খুব ভাল জানতেন। হিন্দি ও ইংরাজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন, বাংলাতে তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধাদি লিখতেন। ওনারা তিন ভাই সন্ন্যাসী, আর-এক তিনি ভাই বিয়েথা করেননি, কিন্তু রামকৃষ্ণ ভাবেই ছিলেন। পরে তিনিও কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে যান। স্বামীজীর আদর্শকে নিয়েই থাকতেন। এক সময় তিনি হৃষিকেশে ছিলেন। সেখানে একজন বড় মহাত্মা থাকতেন, বেদান্তী সন্ন্যাসী। প্রতিদিন সকালে দুজন শিষ্যের কাঁধে হাত রেখে মহাত্মা থপ্থপ্ করতে করতে কোন রকমে এসে মা গঙ্গাকে প্রণাম করতেন। একদিন জ্বর, অসুস্থ, তাও ওই ভাবে থপ্থপ্ করতে আসছেন। স্বামী আত্মানন্দজী মহারাজ ওনার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলছেন –স্বামীজী! আপনার শরীর খারাপ, বয়সও হয়েছে; এত কষ্ট করে একদিন নাই বা এলেন। এই কথা শুনতেই উনি প্রচণ্ড রেগে গেলেন। তুমি কিসের সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী হয়ে তুমি কি-রকম কথা বলছ? এই দু-পয়সা শরীরের জন্য আমি মা গঙ্গাকে দর্শন করা ছেড়ে দেব! এনারাই হলেন ঠিক ঠিক বেদান্তী সাধু। ঘটনাটা সত্যি, ওনাদের মুখেই শুনেছি, খুব inspiring। যেখানে ভালবাসা সেখানে প্রথমে ছাড়াছাড়ি হয় না। কোন কারণে যদি হয়েও যায়, একটা যদি অন্য ভাব এসে যায়, তাহলেও কিন্তু পুরোপুরি ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় না। ঠাকুর এটাই বোঝাতে চাইছেন–তাঁকে আন্তরিক জানার ইচ্ছা থাকলে, ভালবাসা থাকলে, নাস্তিকভাব এলেও সে ঈশ্বরচিন্তা ছেড়ে দেয় না।

যার বাপ পিতামহ চাষাগিরি করে এসেছে, হাজাশুখা বৎসরে ফসল না হলেও সে চাষ করে। আমাদের দেশে জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে কত গালমন্দ করা হয়। জাতিপ্রথাতে কোন দোষ ছিল না, দোষ ছিল বিশেষ সুবিধাভোগের ব্যাপার নিয়ে, দোষ ছিল সম্মান না দেওয়া নিয়ে। যদি সবাইকে সম্মান দেওয়া হত, যদি বর্ণ বিশেষ সুবিধা ভোগ না করত, তাহলে কিন্তু বর্ণব্যবস্থা খারাপ ছিল না। তবে টেকনলজি এত এগিয়ে গেছে যে জাতিপ্রথা থাকত কিনা বলা মুশকিল। কিছু দিন আগে একটা খুব মজার লেখা পড়ছিলাম। ইতালিতে কুড়িটা খুব নামকরা পরিবার আছে। এই নামকরা পরিবার যাঁরা আছেন, তাঁদের প্রচুর পয়সা, ওনারা তাঁদের সাতশ বছরের পুরানো ইতিহাস নিয়ে চর্চা করলেন। তাতে দেখা গেল, সাতশ বছর আগে এই পরিবারগুলো এখন যে ব্যবসাতে আছেন, যে কাজ করছেন, তখনও সবাই তাই করতেন।

ভারতের বর্তমান দুরবস্থার একটা বড় কারণ হল, আমাদের স্কুল-কলেজগুলিতে স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস খুব ধুমধাম করে পালন করা হয়। দেশের স্বাধীনতা, প্রজাতন্ত্র নিয়ে ওই দিন অনেক বড় বড় দেশপ্রেমের কথা ও অন্যান্য নানা রকম কথা বলা হয়। কিন্তু দেশকে ভালবাসা, এই দেশ আমার দেশ, এর ক্ষতি আমি হতে দেব না, মরে যাব, মারব তবুও আমার দেশকে ভালবাসতে ছাড়ব না। এই জিনিস সবারই হয় না, খুব ছোট্ট দেশ হলে হতে পারে। ভারতের মত বড় বড় দেশগুলিতে দেশপ্রেম, দেশের জন্য জান কবুল করার আদর্শ; এই ভাবগুলোকে ধরে রাখা খুব কঠিন। এই ভাবটাই এখন আমাদের উড়ে গেছে। সেখান থেকে যদি আরও একটু নীচে নামেন তখন দেখবেন, একটা জিনিসকে যে ধরে রাখা, একটা সংস্কৃতিকে যে ধরে রাখা, যেটা জাতিতে জাতিতে ছিল, সেটাও আজ চলে গেছে। ঠাকুর যখন ছিলেন, তখনও এটা ছিল –যার বাপ পিতামহ চাষাগিরি করে এসেছে, এরা হল জাত চাষা। যত যাই হয়ে যাক, চাষের কাজ কখন ছাড়বে না। আপনার বাবা পিতামহ ধর্ম পালন করে এসেছেন, আপনিও দেখে থাকবেন, কিন্তু সেগুলোকে কি আপনি এখন পালন করছেন? করছেন না। কারণ এগুলো আপনার মধ্যে ঢোকেনি। সমাজ তখন বেঁধে রেখেছিল বলে হয়ে যেত। কিন্তু আমাদের তত্ত্ব হল, অপরে কি করেছে সেটা আমার দেখার কথা না, আমি কি করছি সেটা দেখতে হবে, সেটাকে নিয়ে ভাবতে হবে। কঠোপনিষদে নচিকেতা তাঁরা বাবাকে বলছেন, *অনুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথা পরে,* আপনার পূর্বজরা আগে আগে কি করেছেন, পরে পরে তাঁরা কি করেছেন সেটার দিকে ফিরে তাকান এবং দেখুন। ভক্তিপথটাও ধরে রাখার পথ।

ঠাকুর তাকিয়ার উপর মস্তক রাখিয়া শুইয়া কথা কহিতেছেন। মাঝে মণিকে বলিতেছেন, 'আমার পাটা একটু কামড়াচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও তো গা'। আগে যেটা বলা হল, তিনি করিয়ে নেন। ঠাকুর অবতার কিনা, তাই মাস্টারমশাইকে দিয়ে একটু সেবা করিয়ে নিচ্ছেন, যাতে মাস্টারমশাইয়ের মঙ্গল হয়। মাস্টারমশাই আস্তে আস্তে ঠাকুরের পা বুলিয়ে দিচ্ছেন আর ঠাকুরের কথা শুনছেন। এই দিনের বিবরণ মাস্টারমশাই এখানেই শেষ করছেন। এরপর ঠাকুর কি বলছেন, সেটা আর তিনি লেখেননি। ৫ই জুনের পর মাস্টারমশাই আমাদের ৮ই জুন, ১৮৮৩ তারিখের বর্ণনায় নিয়ে যাচ্ছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে –শ্রীযুক্ত রাখাল, রাম, কেদার, তারক, মাস্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

আমরা ৫ই জুনের বর্ণনা দেখলাম। আজ ৮ইজুন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ (পৃঃ ২০৬)। এতদিন কথামৃত আপনারা অনেকেই নিজেরা পড়েছেন। আজকাল অনেকেই কথামৃতের ব্যাখ্যা করছেন, সেগুলোও শুনছেন। তবে মনে রাখবেন কথামৃত শুধু শুনলে বা পড়লে হবে না, এগুলো অনুধ্যানের বিষয়, একটু অনুধ্যান করতে হয়, অনুধ্যান মানে নিজের মনের মত করে চিন্তন করা। শ্রীমৎ স্বামী ধীরেশানন্দজী আমাদের খুব নামকরা মহারাজ ছিলেন। দেওঘর বিদ্যাপীঠে আমি প্রথম জয়েন করার পর ওনার অনেক সঙ্গ করেছিলাম। মহারাজ দেওঘরে গরমের সময়, এক মাস, দু মাস করে থাকতেন। উনি আমাদের বলেছিলেন, তোমরা দু-চারজন কি পাঁচ-ছয়জন মিলে রোজ বসবে আর একজন কিছু শাস্ত্র পাঠ করবে। কথামৃত আপনি নিজের মত পড়ছেন ঠিক আছে, কিন্তু তার সঙ্গে কয়েকজন মিলে পাঠও করতে হয়। একজন যখন পাঠ করছেন, তখন চোখ বুঝে ওই স্থান, দৃশ্যগুলিকে চিন্তন করতে হয়; যেমন –ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আছেন, তাঁর ঘরের ছোট খাটে বসে ভক্তদের সাথে কথা বলছেন।

তখন আমাদের বয়স কম ছিল, মহারাজের ওই কথা শুনে আমার খুব ভাল লেগেছিল। আপনারা বন্ধুরা মিলে, বাড়ির লোকেরা এক জায়গায় বসে পাঠ করবেন। শুধু পাঠ, কোন ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। আর যদি সে-রকম সুযোগ না হয়, তাহলে জপধ্যান করার পর কথামৃতের যে অংশটা পড়েছেন, ওই অংশের দৃশ্য ও কথাগুলোকে চিন্তন করা। তার সঙ্গে আর-একটা জিনিস খুব জরুরী,

সেটা হল, যেমন আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেল আছে যেখানে আমরা হিন্দু ধর্মের যতগুলি মূল শাস্ত্র আছে, মোটামুটি সব শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুরু করে দিয়েছি, অনেকগুলো পুরো ব্যাখ্যা করা হয়ে গেছে। যেমন বেদ, গীতা, পুরাণ, কিছু উপনিষদ, তন্ত্র, চণ্ডী সবটাই ব্যাখ্যা করা আছে। সেগুলোও মাঝে মাঝে শুনবেন। কিন্তু কথামৃত পুরো আলাদা জিনিস। আমি যদি ঠাকুরের কাছে না আসতাম, ঠাকুরের ভাবধারা যদি না পেতাম, সাধুসঙ্গ যদি না পেতাম, আর কথামৃত যদি না পড়তাম, তাহলে আমার কি হত জানা নেই। কম বয়স থেকেই আমি এক পাতা দু পাতা কথামৃত পড়ে আসছি। কিন্তু এখানে রামকৃষ্ণ ভাবধারায় যেটা হয়, হিন্দু ধর্মের শাস্ত্র থেকে আমরা যে ধারণাগুলি পেয়েছি, সেটাকে ছাপিয়ে এই ভাবধারা আমাদের অনেক দূরে নিয়ে চলে যায়।

আপনারা অনেকে অদ্বৈত এই শব্দটা শুনে থাকবেন। ঠাকুরও বলছেন, অদ্বৈত শেষ কথা। পাশ্চাত্য দুনিয়া যা করে আমরা তার নকল করি। ইদানিং কালে পাশ্চাত্যে বৌদ্ধরা খুব পপুলার হয়েছে। এখন বৌদ্ধদের কি করে উত্তর দেবে? আমাদের এখানে খোলকরতাল নিয়ে উত্তর দেবে। সেইজন্য ইদানিং ওখানে অদ্বৈত বেদান্ত খুব পপুলার হয়েছে। সবাই এখন অষ্টাবক্র গীতা শুনতে চাইছে। অষ্টাবক্র গীতার ঠাকুরদা হলেন উপনিষদ, যেখান থেকে এগুলো বেরিয়েছে সেই উপনিষদ অধ্যয়ন করুন। কিন্তু তার সঙ্গে যেটা, যদি আপনারা এগুলো শোনেন তাহলে কোথাও গিয়ে হয়ত আপনাদের ধারণা হতে পারে যে, অদ্বৈত শেষ কথা, অদ্বৈতে চলে গেল দেবী, দেবতা, প্রতিমা, রূপটুপ এগুলো আর থাকবে না। সত্যিই কি তাই হয়? না, তা নয়; তখন সবটাই সত্য হয়ে যায়। একদিকে ঠাকুর বলছেন, রূপটুপ উড়ে যায়, তার মানে ওই উচ্চ অবস্থায় পৌঁছালে সবারই রূপটুপ সব উড়ে যায়; উড়ে যাওয়া মানে, এগুলোর আর দরকার হয় না।

এখানে আমরা খুব উচ্চমানের তত্ত্বকে নিয়ে আলোচনা করছি, অনেকে হয়ত ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন না। বুঝতে না পারলেও কোন অসুবিধা নেই, শুনে যান; শাস্ত্রের কথা শুনে রাখতে হয়। এই যে বলা হল, দেবীদেবতা সত্য, এই সত্যকে একদিকে যেমন ব্রাহ্মরা মানবে না, আবার কিছু কিছু যে পলিটিক্যাল ফিলজফি আছে, কিছু ধর্মীয় সংগঠন আছে, যারা দেবীদেবতা যে সত্য এটাকে মানবেন না। আর্য সমাজও মানতেন না। সবারই এত মুর্তিপূজার বিরোধিতা কেন? কারণ খ্রীশ্চনরা মুর্তি মানেন না। অথচ ক্যাথলিক চার্চগুলিতে গিয়ে দেখুন, সব জায়গায় মুর্তিতে ছড়াছড়ি। ওদের যে চ্যাপেলগুলো আছে সব জায়গায় নানা রকমের পেইন্টিংএ ভর্তি। এদিকে হিন্দুদের বলে পৌত্তলিক। আদৌ মুর্তি ওরা মানে কি মানে না, এটাও ঠিক পরিষ্কার নেই, অন্তত আমার কাছে পরিষ্কার নেই ওরা মানে কিনা। ওরা নিজেরা নিশ্চয়ই কোন না কোন উত্তর দিয়ে দেবে। এগুলো সব উড়ো উড়ো কথা, সেটা বাদ দিয়ে দিন; কিন্তু আমাদের কঠোপনিষদে যখন অদ্বৈত নিয়ে বলছেন তখন কি সুন্দর বলছেন, যেখানে দুটো মিলে এক হয়ে যাচ্ছে। ওই একের জ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর ওখান থেকে যখন নামবেন তখন কি হবে?

একটা যেমন বলা হয়, কিছু কিছু সাধু-মহাত্মাদের আমরা বলতে শুনেছি, যেমন রমণ মহর্ষির কথা আমরা শুনেছি; এমন কি তোতাপুরি, ওনারা রূপটুপ মানতেন না। কিন্তু ঠাকুর, যিনি হলেন হিন্দু ধর্মের পুরো ইতিহাস, যিনি পুরো হিন্দু ধর্মের যে অধ্যাত্ম, তার মুর্তরূপ, এই পরিচ্ছেদ তাঁকে নিয়ে শুরুই হচ্ছে এই বলে –

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ সন্ধ্যারতির পর দক্ষিণেশ্বর-কালীমন্দিরে দেবী-প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন ও চামর লইয়া কিয়ৎক্ষণ ব্যজন করিতেছেন।

ঠাকুরকে আপনি কোন একটা রূপে তো মানবেন; ঠাকুরকে আপনি ভগবান মানুন, ঠাকুরকে আপনি অবতার মানুন, ঠাকুরকে আপনি একজন সাধু মানুন, ঠাকুরকে আপনি একজন উচ্চ সাধক রূপে মানুন; কিছু তো একটা মানবেন। কিন্তু ঠাকুরের এই দৃশ্যটা কোনটাতেই মেলে না। কিভাবে মেলে না? অবতার, যিনি ভগবান, তিনি নিজে চামর দিয়ে মা-কালীকে ব্যজন করছেন। ভগবান নিজে প্রতিমাকে

ব্যজন করছেন। আর আমাদের এখানে সবাই হিন্দুদের পৌত্তলিক বলে বেড়াচ্ছে। এরা নিজেদের হিন্দু বলতে লজ্জা পায়, হিন্দুদের ধর্মীয় ক্রিয়া-আচরণাদি করতে লজ্জা পায়। আবার গর্ব করে বলে, I am not religious, I am spiritual। এরা কি আদৌ কিছু বোঝে রিলিজিয়ান কি জিনিস, স্পিরিচুয়াল কি জিনিস? তাহলে এই যে ঠাকুর মা কালীকে চামর ব্যজন করছেন, যিনি পুরো হিন্দু ধর্মের গত দশ হাজার বছরের মুর্তরূপ, তিনি নিজে এটা করছেন। রোমা রোঁলা ঠাকুরের জীবনী রচনা করতে গিয়ে এটাই লিখছেন, পুরো হিন্দু ধর্মের যে ইতিহাস, তার মুর্তরূপ এক জায়গায় এসে মিলিত হয়েছে। পুরো হিন্দু ধর্ম ঠাকুরকে কেন্দ্র করে আজ দাঁড়িয়ে আছে।

ঠাকুরকে যদি একজন সাধক রূপে দেখি, তাহলে তখন এটাই দেখতে পাই যে, তিনি অদ্বৈত সাধনা করেছেন, অদ্বৈতের জ্ঞান তাঁর হয়েছে; এতে কোন সন্দেহ নেই। তাহলে সত্যটা কি? এটাও সত্য ওটাও সত্য। ঠাকুর যেমন বলছেন, সন্ধ্যে হলে হাততালি দিয়ে হরিনাম করতে হয়। আবার দেখলে হাসি পায় যে, ব্যক্তিগত ভাবে যাঁদের জানি, যাঁরা কোন দিন ধ্যান করলেন না, তাঁরাও ইদানিং ধ্যান শেখাচ্ছেন। লোকেরাও দলে দলে তাঁদের কাছে ধ্যান শিখছে। আমাদের একজন খুব নামকরা মহারাজ ধ্যানের উপর একটা বই লিখেছেন। তাঁকে একজন খুব সিনিয়র মহারাজ ডেকে বলছেন, 'হ্যাঁরে তুই জীবনে ধ্যান করলি না, তুই আবার ধ্যানের উপর বই লিখেছিস'? আমরা সবাই একই জায়গার লোক কিনা, সবাই সবারটা জানি কে কি রকমের। ধ্যান-ট্যান কিছু করার দরকার নেই, হাততালি দিয়ে বড় করে ঠাকুরের নাম করুন, তাতেই মঙ্গল হবে, এ-ছাড়া আর কোন কিছুতে হবে না। খুব করে হাততালি দিয়ে, পারলে নেচে নেচে ঠাকুরের নাম করুন, কোন অসুবিধা নেই। কেউ দেখলে হাসবে, সেইজন্য দরজা জানালা বন্ধ করে তারপরে করুন। ঠাকুরের নাম করে ভেতরটাকে আনন্দে ভরিয়ে নিন।

সেদিন ঠাকুরের কাছে অনেকে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে কেদার আছেন; ঠাকুরের থেকে বয়সে বড়ই হবেন, কি সমবয়সী হবেন। কেদারের চরিত্র আমার কাছে একটা খুব মজার চরিত্র, ভাল লাগে। তিনি প্রথমে ব্রাহ্ম সমাজে যেতেন, সেখান থেকে কর্তাভজা, সেখান থেকে নবরসিক; এই ধরণের অনেক রকম সম্প্রদায়ে গেছেন। দিল্লিতে যেমন বড়লোকের বাড়ির মহিলারা বলে, ম্যয়নে তো আর্ট লিভিং কি, যোগা ভি কি, রেইকি ভি কি, সব রকমই করা হয়ে গেছে। কেদারও সেই রকম অনেক সম্প্রদায়ে যেতেন। এখন উনি ঠাকুরের কাছে এসে নোঙর ফেলেছেন। আমাদেরও এই অবস্থা। কি রকম? আগেকার দিনে যেমন রাজা তেমন প্রজা হত। কিন্তু প্রজাতন্ত্র আসার পর থেকে তার উল্টোটা হয়ে গেছে এখন প্রজা যেমন রাজা তেমন। আপনি যে কোন রাজ্যের রাজাকে দেখ নিন সেখানে কে রাজা। ওই রাজাকে দেখে আপনি বুঝতে পারবেন ওই রাজ্যের প্রজারা কি রকম। যদি দেখেন রাজা একটা মুর্খ, বুঝে নেবেন ওখানকার প্রজারাও মুর্খ। রাজা পাগল, বুঝবেন ওখানকার লোকেরা সব পাগল। যেমন আপনার যে মত, ঠিক তেমন মতের জায়গায় আপনি চলে যাবেন। সাহিত্য আপনি সেই রকম পড়বেন, রাজনীতি আপনি সেই রকম করবেন, খেলাধূলা আপনার সেই রকম হবে আর সবচেয়ে বড়, ধর্মও আপনার সেই রকম হবে। আপনি যদি খেলো প্রকৃতির হন, আপনার ধর্মের প্রতি যে ভাব সেটাও খেলো হবে; ফলে আপনার যাতায়াত ব্রাহ্ম সমাজ থেকে শুরু করে এগুলোর মধ্যে চলতে থাকবে। কিন্তু কেদারের কোথাও একটা নিষ্ঠা আছে। ঠাকুর বারবার বলছেন –নিষ্ঠা থাকলে তিনি তাকে ঠিক নিয়ে চলে আসবেন। আর সত্যিই দেখুন তিনি শেষমেশ ঠাকুরের আশ্রয়ে চলে এলেন। ব্যক্তিগত ভাবে কেদারের চরিত্র আমার খুব ভাল লাগে।

কেদারের সঙ্গে তারকও এসেছেন। এই তারকই পরবর্তিকালের আমাদের পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ, পরে রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। মাস্টারমশাই তারকের সম্বন্ধে বলছেন –**শ্রীযুক্ত তারকের বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর হইবে। বিবাহ করিয়াছিলেন –কিছুদিন পরে পত্নীবিয়োগ হইল। তাঁহার বাটী বারাসাত গ্রামে। তাঁহার পিতা একজন উচ্চদরের সাধক –ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে অনেকবার দর্শন করিয়াছিলেন। তারকের মাতৃবিয়োগের পর তাঁহার পিতা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন।**

বারাসতে মহাপুরুষ মহারাজের জন্মভিটায় আমাদের আশ্রম হয়েছে। এক সময় আশ্রমের অধ্যক্ষ আমাকে প্রত্যেক বছর ডাকতেন। টানা পাঁচ বছর ওখানে ভাষণ দেওয়ার জন্য গিয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে খুব ভাল লাগত।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘর হইতে বহির্গত হইয়া চাতালে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাকে প্রণাম করিলেন। দেখিলেন, রাম, মাস্টার, কেদার, তারক প্রভৃতি ভক্তেরা সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর তারককে দেখে খুব খুশি, **তারকের চিবুক ধরিয়া আদর করিতেছেন**, পার্শ্বদ কিনা; ঠাকুর তাঁর সব শিষ্যকেই খুব ভালবাসতেন। ঠাকুরের মহাসমাধির পর সব শিষ্যরাই বলতেন, ঠাকুর আমাকেই বেশি ভালবাসতেন। আমাদের এখানে পুরো উল্টোটা হয়, কেউ যদি পাঁচজনের সঙ্গে মেশে তো বলবে, পার্শিয়ালিটি করছে, ওকে বেশি ভালবাসে। মানুষের ভালবাসা, আর ঈশ্বরীয় ভালবাসার মধ্যে এটা একটা বিরাট তফাৎ।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া নিজের ঘরে মেঝেতে বসিয়া আছেন; পা দুখানি বাড়াইয়া দিয়াছেন –রাম ও কেদার নানা কুসুম ও পুষ্পমালা দিয়া শ্রীপাদপদ্মে বিভূষিত করিয়াছেন। ঠাকুর সমাধিস্থ।

কেদারের নবরসিকের ভাব। শ্রীচরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিয়া আছেন। তাহা হইলে শক্তি সঞ্চার হইবে –এই ধারণা। ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন, "মা, আঙুল ধরে আমার কি করতে পারবে"? বলতে চাইছেন ঠাকুরের আঙুল ধরে কেদারের কি কিছু হবে? শেষমেশ নিজের সাধনা চাই, এর পা, ওর আঙুল ধরে কিছু হয় না। এটা বোঝান খুব মুশকিল, শেষমেশ নিজেকেই সব কিছু করতে হয়। **কেদার বিনীতভাবে হাতজোড় করিয়া আছেন**। এরপর ঠাকুর যা বলছেন, এর দুটি বাক্য খুব সুন্দর। কেদারের এত ভক্তি, ঠাকুরের কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঠাকুর কিন্তু বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারের প্রতি, ভাবাবেশে) –কামিনী-কাঞ্চনে মন টানে (তোমার)। মুখে বললে কি হবে যে আমার ওতে মন নাই। ঠাকুর এই কথাগুলো ভাবাবেশে বলছেন, সাধারণ অবস্থায় বলছেন না। আমাদের বুদ্ধি বলে দেয় কোন কথা বলতে হবে, কোন কথা বলা যাবে না। আমাদের জাগ্রত অবস্থায় এই বুদ্ধিটা সজাগ থাকে। কিন্তু আপনি যদি ড্রাগস নিয়ে থাকেন, মদ খেয়ে থাকেন, নেশা করে থাকেন, তখন বুদ্ধিটা নড়ে যায় এবং কথাগুলো নিজের মত চলতে থাকে। ঠাকুর এখন ভাবাবস্থায় আছেন, এই অবস্থায় যে জিনিসটা যেমন একেবারে পুরো তেমনটা মুখ থেকে বেরোচ্ছে। ঠাকুরের এই কথাটা আমাদের অনেকের নেতিবাচক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বাক্যটা একটু বোঝা দরকার। ঠাকুর এখানে কিন্তু কেদারের নিন্দা করছেন না। কেদার শেষ দিন পর্যন্ত ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। সমস্যাটা হল, কেদারের মধ্যে এখনও ঢং-ঢাং আছে। অনেক জায়গা থেকে ঘুরে ঠাকুরের কাছে এসেছেন কিনা। এই যে নবরসিকের ভাব, তার মানে একটু ঢং ঢাং থেকে গেছে। আমাদের কাছে তো সব ধরণের ভক্তরাই আসতে থাকেন। কোন কোন ভক্তকে দেখি ঠাকুরের নাম শুনেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দেবে। ইচ্ছে হয় বলে দিই –ঢং-ঢাংটা বন্ধ করুন, ন্যাকামো দেখাবেন না তো।

মনে রাখবেন কেদারের তখন বয়স পঞ্চাশের উপর বা কাছাকাছি, তাঁকে ঠাকুর বলছেন, তোমার এখনও কামিনী-কাঞ্চনে মন টানে। তার সঙ্গে বলছেন, তুমি মুখে বললে কি হবে যে তোমার ওতে মন নাই। মনে রাখবেন কামিনী-কাঞ্চন বলতে যে সব সময় শুধু নারী-শরীর আর টাকা-পয়সাকেই বলা হয়, তা নয়। কামিনী-কাঞ্চন হল এই পুরো সংসার। আমরা যে আশ্রম করে সাধু-সন্ন্যাসীরা আছি, আমাদের এটা সংসার। তবে আপনাদের তুলনায় আমাদের সংসারটা ছোট, কিন্তু সংসার। আমাদের মনও একটু আমোদ-আহ্লাদ চায়, কিন্তু আমরা একটা সীমাতে বাঁধা। ফলে আমাদের শোওয়া-বসা, পড়াশোনা, হাসি-ঠাট্টা সবটাই একটা মর্যাদার মধ্যে থাকে। এই মর্যাদাকে ধরে রাখতে হয়। আমাদের ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ, তিনিও আমাদের সাথে অনেক হাসিমজা করতেন। কিন্তু পাঁচ

মিনিট কি সাত মিনিট ওনার কথা যদি শোনেন, দেখতে পাবেন ওরই মধ্যে কখন যে ওনার মন দুম্ করে ঈশ্বরীয় কথায় বা উপনিষদের কথায় চলে যাবে কেউ বুঝতেই পারবেন না। একদিকে হাসছেন, মজা করছেন হঠাৎ সঙ্গে সঙ্গে মনটা উপরে চলে গেল। এটাতে বোঝা যায় যে, ওনার মনের মূল ভাব হল তত্ত্ব। আপনার সংসার জীবনে কিসের দুঃখ? দুঃখ কম-বেশি সবারই থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে দুঃখের কথা সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে কেন বলা? সংসারের দুঃখ সংসারেই সামলান, সংসারের জিনিস সন্ন্যাসীর কাছে কেন প্রকাশ করছেন। নিজের মনকে নামতে দিতে নেই।

অন্য দিকে কি হয়, আমাদের মত সাধারণ যাঁরা আছেন, আমরা মাঝে মাঝে কোন রকমে কষ্ট করে ঈশ্বরীয় কথায় মন দিই, বাকি সময়টা মন সংসারে নেমে থাকে, যেটা আমরা বুঝতেও পারিনা। আমাদের যেটা মনের সংসার, যেটা প্রকৃতির সংসার, যেটা মায়ার সংসার, সেই সংসারটা পুরোটাই কামিনী-কাঞ্চন। আমাদের বেশির ভাগ শ্রোতা বা বক্তা যাঁরাই আছেন, আমাদের মন আসলে কামিনী-কাঞ্চনে, আমরা এটা বুঝতেও পারব না। স্বপ্নে আমি কত ঘন ঘন ঈশ্বরীয় স্বপ্ন দেখেন লক্ষ্য করুন। যদি সত্যিকারের আপনার মন ঈশ্বরে থাকে তাহলে রোজই আপনি ঈশ্বরীয় স্বপ্ন দেখবেন। অন্য স্বপ্নও আসবে, কিন্তু এই দৈবী স্বপ্ন বেশি আসবে। যখন আপনি খুব ব্যস্ত থাকেন, তখন মাঝে মাঝে কতবার ঠাকুরের কথা আপনার মনে আসে? এই ধরণের অনেক কিছু ব্যাপার আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় হল, যখন আপনি হাসি, মজা, ঠাট্টা করছেন তখন আপনি তাতে কতটা রোমে যাচ্ছেন?

দেওঘরে একবার একজন নূতন ব্রহ্মচারী জয়েন করেছিলেন। জয়েন করার পর নূতন ব্রহ্মচারীকে নিয়ে মজা করে একজন মহারাজ খুব সুন্দর কথা বলেছিলেন, কথাটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। তিনি বলছিলেন –স্বামীজী বলছেন, যিনি শিক্ষক, তাঁর যে ছাত্র, সেই ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষকে ওই ছাত্রের স্তরে নেমে আসতে হবে এবং সেখান থেকে তাকে তুলে আনতে হবে। ওনার এক সঙ্গী ব্রহ্মচারী মহারাজ মজা করে তখন বলছেন, ‘উনি খুব ভাল মহারাজ, উনি বাচ্চা ছেলেদের স্তরে একেবারে নেমে যান। কিন্তু উনি আর ওদের ওখান থেকে তোলেন না, নিজেও ওখানেই ওদের সাথে থেকে যান’। বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন, ওদের সঙ্গে খেলছেন, মজা করছেন, তখন আপনার মনটা ওদের মতই হয়ে গেল। এবার দেখতে হবে আপনার মনটা কোথায়? ওদের স্তরে আছে, নাকি ওদেরকে আপনি উপরে তুলছেন? বলা খুব মুশকিল। মুখে বলে দেওয়াটা সহজ, খুব কঠিন জিনিস।

আমাদের বেশির ভাগেরই এই সমস্যাটা থাকে। আসলে আমাদের মনটা সংসারেই ঘুরঘুর করতে থাকে। সব সময় যে মানব শরীরের প্রতি আকর্ষণ, টাকা-পয়সার প্রতি আকর্ষণ, তা নয়। আপনার কমফর্ট লেভেলটা কি দেখতে হবে। আপনার সময়ের বেশির ভাগ সময়টা কিসের উপর দিচ্ছেন? কোন জিনিসটা করতে পারলে আপনি সবচেয়ে বেশি খুশী হন। আগেও আমরা বলেছি, পরেও বলব। এই যে ঠাকুর বলছেন, মুখে বললে কি হবে যে, আমার ওতে মন নেই। আমরাও ঠিক ওভাবেই বলি, ওতে আমার মন নেই। ওতে মানে –কামিনী-কাঞ্চনে।

এগিয়ে পড়। চন্দন কাঠের পর আরও আছে–রূপার খনি–সোনার খনি–হীরে-মাণিক। একটু উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে করো না যে, সব হয়ে গেছে।

আমি যখন ক্লাশ সিক্স কি সেভেনে পড়ি তখন ঠাকুরের ‘কথা ও গল্প’ পড়তাম, খুব সুন্দর লাগত। সেখানেই প্রথম এই ‘এগিয়ে পড়ার’ গল্পটা পড়েছিলাম। পঞ্চতন্ত্রেও এই গল্পটা পাওয়া যায়, কিন্তু অন্য ভাবে, ওর ভাবটা আলাদা। রামকৃষ্ণ মিশনে যাঁরা জয়েন করেন, তাঁদের ব্রহ্মচারী বলা হয়; আমাদের সিনিয়র মহারাজরা থেকে থেকে নূতন ব্রহ্মচারীদের বলতেন –ব্রহ্মচারী এগিয়ে পড়। মাঝখান থেকে আমার মাথায় তখন ঢুকে গেল যে, ঠাকুর এটাই বলছেন যে, ব্রহ্মচারী এগিয়ে পড়, কিন্তু তা না।

আবার কাঠুরের গল্প বলছেন। কথামৃতে অনেকবার এই গল্পটা এসেছে। এমনকি দেখবেন, এখান থেকে দু-তিন পাতার পরেই আবার পাবেন। এই গল্পের বিশেষ যে ভাব, হিন্দু ধর্মের এই ভাব অনেক রয়েছে। আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, হিন্দু ধর্মের সার কি? হিন্দু ধর্মের তত্ত্ব কি? এগিয়ে পড়। অহং ব্রহ্মাস্মি হিন্দু ধর্মের তত্ত্ব নয়, এগুলো মহাবাক্য, আচার্য শঙ্কর দিয়ে গেছেন। হিন্দুদের যদি এক কথায় উত্তর দিতে বলা হয়, আমাদের আদর্শ কি? হিন্দু ধর্মের তত্ত্ব কি? এগিয়ে পড়, হিন্দিতে বলতে হলে বলবে –আগে বাড়ো। নেতাজী যেমন বলেছিলেন –দিল্লি চল। কিন্তু এখানে হল এগিয়ে পড়। এটাই হল হিন্দুদের ঠিক ঠিক ধর্ম জীবনের আদর্শ।

কঠোপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন, *উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত*, স্বামীজী এটাকে নিজের মত করে বললেন, আমি এর নাম দিয়েছিলাম –Cultural Transference। স্বামীজী যেটা করছিলেন, ওটা ঠিক অনুবাদ না, ওটা ছিল একটা cultural transference। Cultural Transference হয় যখন একটা জিনিসকে আরেকটা জিনিসের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়, এটা হচ্ছে সাংস্কৃতিক চাপিয়ে দেওয়া। *উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত* যখন বলা হচ্ছে, তখন সেখানে বলতে চাইছেন, গুরুর মুখে শাস্ত্রের কথা শুনে নিজের আত্মাকে জাগিয়ে নিয়ে এগিয়ে পড়। কোথায় এগিয়ে যেতে হবে? নিবোধত, আত্মজ্ঞানের প্রতি। স্বামীজী এটাকেই cultural transference করে বলছেন, Arise awake and stop not till the goal is reached। এগিয়ে পড়, হিন্দু ধর্মে goal বলে কিছু হয় না।

আমি যখন ‘পরম’ বই লিখলাম তখন পাবলিশার আমাকে বললেন, ‘এর একটা সাব-টাইটেল দিন যাতে লোকেরা বুঝতে পারে এটা একটা স্পিরিচুয়াল বুক’। আমি বললাম, ‘না থাক; স্বামীজীর এই কোটেশানটা দিই –স্বামীজী বলছেন, Life is a great chance’। ঠাকুর যখন বলছেন, এগিয়ে পড়, life is a great chance, জীবন যেটা পেয়েছেন একটা বিরাট বড় সুযোগ পেয়েছেন। তারপর বলছেন, seek for the highest, জীবনে যেটা শ্রেষ্ঠতম হতে পারে সেটাকে চাও, aim at the highest, তারপর এই বলে শেষ করছেন –and you shall reach the highest। লক্ষ্য শেষ কথা। আপনাদের সবার এটাকে জীবনের আদর্শ করে নেওয়া দরকার।

এই প্রসঙ্গে ঠাকুর কিছু নিজের কথা বলবেন। স্বামীজী যখন বলছেন, Each soul is potentially divine, শ্রোতাগণ, আপনারা বিশ্বাস করুন, আপনার মধ্যে অসীম ক্ষমতা, আপনার মধ্যে অনন্ত জ্ঞান, আপনার ভিতরে অনন্ত ঐশ্বর্য। আপনাদের যে এই কথাগুলো বলছি, কোন ইমোশান নিয়ে আমি বলছি না, আমার মধ্যে কোন ইমোশান নেই। এই যে বলছি, আপনার ভিতর অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ঐশ্বর্য; শুধু চাপা পড়ে আছে। কিসের দ্বারা চাপা আছে? আপনার মনের অজ্ঞানটা আপনার নিজের সৃষ্টি; নিজে ওটাকে ঢেকে রেখে বলছেন –আমি এটা সরাব না। আপনি বলছেন, আমি বাড়ির জানলা খুলব না, আমি কৈকেয়ীর মত কোপ ভবনে পড়ে থাকব। কৈকেয়ী যখন শুনলেন রামকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করা হবে, শুনে তিনি কোপ ভবনে গিয়ে সব অলঙ্কার খুলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চুপচাপ মাটিতে শুয়ে পড়লেন। রাজা দশরথ এসে দেখছেন পরিস্থিতি খুব গভীর। তিনি কত মিষ্টি করে বলতে শুরু করলেন –সুন্দরী তুমি ওঠো, কেন কান্নাকাটি করছ? কৈকেয়ী বলছেন, না আমি উঠব না।

আমাদেরও সেই এক অবস্থা, নিজে কল্পনা করে কোপ ভবনে গিয়ে মাটিতে পড়ে থাকব; আমি জানলা খুলব না, দরজা খুলব না, আমি খাব না, আমি উঠব না, আমি এখানেই পড়ে থাকব। তুমি কি চাইছ? জগতের সুখ। জগতের সুখ চাওয়া মানেই, বাইরের জানলা দরজা সব বন্ধ করে দিতে চাইছেন। জীবনে যদি কোন ধাক্কা লাগে, তখন দেখবেন আপনারই ভিতরের শক্তি একটু একটু করে স্ফুরিত হতে শুরু করবে। আপনি নিজেই চমকে বলবেন – এ কি! এ কি! এই যে স্বামীজী বলছেন, this life is a great chance, এটাই ঠাকুর বলছেন, এগিয়ে পড়।

যদি আপনার মনে প্রশ্ন ওঠে, দুটো মধ্যে কি সম্পর্ক? সম্পর্কটা হল, this life is a great chance হল চুটিয়ে কাজ করার কথা বলছেন, হাড় ভাঙা পরিশ্রম। আমরা সাধু-সন্ন্যাসীরা যখন কম বয়সে থাকি, তখন ব্রহ্মচারী অবস্থায় কিছুই না, আট বছর নয় বছর সে শুধু স্পঞ্জের মত টেনে যাচ্ছে। আমাদের একজন গুরুজন খুব সুন্দর কথা বলেছিলেন –দেখ, রামকৃষ্ণ মিশনে যাঁরা কাজ করেননি, তাঁরা সারা জীবন সবাই কোথাও ভিতরে একটা অশান্তির বোঝা নিয়ে থেকে গেছেন। যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের জীবনে অনেক শান্তি থাকে। যদিও লোকেদের ধারণা অন্য রকম। কাজ করলে কি হয়, অনেক আবর্জনা পুড়ে যায়, কামনা-বাসনা এগুলো অনেক পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাই কাজ করতে হয়। যাঁরা মনে করেন, এসব কিছু না করে হিমালয়ে গিয়ে ধ্যান করবেন, তপস্যা করবেন; তাই যদি হত তুমি আগে থেকেই এই রকম হতে। বলার কি আছে, বেরিয়ে পড় না, দেখি না কদিন থাকতে পার। বেশির ভাগই দেখা যায়, সব কিছু থেকে যাঁরা এই রকম সরে গিয়ে তপস্যায় চলে যান, কদিন পরে সবাই তামসিক হয়ে যান। সাত্ত্বিক ভাব ধরে রাখা খুব মুশকিল।

সংসারে যাঁরা আছেন, চুটিয়ে যখন কাজ করবেন তখন অর্থ আর কাম, অর্থাৎ টাকা-পয়সা, ভোগ-বাসনা আপনার এত বেশি এসে যাবে যে, একটা সময় আপনার মনে হবে, আমার আর এগুলো লাগবে না। সেখান থেকে ইচ্ছে হয়, একটু সেবা করতে হবে, একটু নিষ্কাম হতে হবে। ঠাকুরও বারবার বলছেন, কর্মকাণ্ড আদিকাণ্ড। দ্বিতীয় আসে সেবা ভাব, একটু নিষ্কাম হওয়া। এরপর তৃতীয় যেটা সেখান থেকে আসে –ভক্তির স্ফুরণ। আপনি চুটিয়ে কাজ করেননি, অর্থ-কাম আপনার মন থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে যায়নি, আর এরপরেও যদি দেখেন আপনার মধ্যে ভক্তিভাব এসেছে, বুঝবেন আসলে এটা আপনার তামসিক ভাব। এই ভক্তিভাব বেশি দিন টিকবে না।

আমার নিজের জীবনে কপাল আমার খুব ভাল ছিল, আমি যখন জয়েন করেছিলাম তখন আমার খুব কম বয়স। বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ তখন তিনি দেওঘরের বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপাল ছিলেন। তখন কাজের লোকের দরকারও ছিল। সেইজন্য প্রথম পাঁচ বছর এত কাজ করতে হয়েছিল যে কোন হুঁশ থাকত না। ফলে ব্যক্তিত্বের একটা আকার হল। আর আমার ব্রহ্মচারী ভাইয়েরা যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কয়েকজন গা বাঁচিয়ে থাকলেন, আজও তাঁরা গা বাঁচিয়ে থাকছেন। অনেকের হয়ত তার মধ্যে কিছু ক্ষমতা হয়েছে, কিন্তু যেমনটি ছিলেন তেমনটি থেকে গেলেন, গ্রোথটা আর হল না। যে গ্রোথ হওয়াটা জরুরী, কাজ না করলে ওই গ্রোথ হয় না। আপনি কেঁদে-কুকিয়ে কাজ করুন, হাসি মুখে কাজ করুন, কাজ আপনাকে করতে হবে। কাজ না করলে এগোবেন না। ঠাকুর এখানে বলছেন –এগিয়ে পড়। এগোন মানেই হয় কাজ। দুটো বাক্যে লিঙ্ক পাওয়া গেল?

ভক্তি যে জাগবে, ভক্তির বীজ যে অঙ্কুরিত হবে, এটার জন্য আপনাকে আগে কাজ করতে হবে। কাজ –সেবা –নিষ্কাম কর্ম পর পর হলে তখন কি হয়, মাঠ পরিষ্কার হয়ে একটু ভক্তির উদয় হয়। কিন্তু যাঁরা মনে করেন বাতাসা প্রসাদ আর খিচুরি খেয়ে ভক্তি হবে –দুঃখিত, তা হবে না, সে গুড়ে বালি। একটু ইমোশানালিজম্ হবে ঠিকই, কিন্তু বারোটা বাজিয়ে দেবে; কারণ ঠাকুর বলছেন না, নিজেকেও ঠকায় পরকেও ঠকায়। এই ভক্তিতে আপনি নিজেকেও ঠকাবেন পরকেও ঠকাবেন। ঠাকুরের কৃপায় আমার নিজের কোন উপলব্ধি নেই ঠিক আছে, কিন্তু প্রচুর সাধুসঙ্গ করেছি। আমার ব্যাপারে কেউ কোন দিন না করতে পারবে না। কোন একজন দুজন সাধুর সঙ্গ করেনি, অনেক সাধুর সঙ্গ করেছি। ঢপবাজি ভক্তিতে নিজেকে পড়তে দেবেন না। ভক্তির জন্য আগে কাজ করতে হবে, কাজ করে ভিতরে একটা শক্তি আনতে হয়।

গাড়ির পাওয়ারফুল ইঞ্জিন, সেখান থেকে স্টিয়ারিং, এটা হল নিষ্কাম। গাড়ি এবার চলতে শুরু করল, এসে গেল আপনার ভিতরে ভক্তির ভাব। এই ভক্তির ভাব যখন আসে, এগিয়ে পড়া যখন শুরু হবে, সেখান থেকে আপনি জপে প্রতিষ্ঠিত হবেন। কতটা দিনে? টানা চব্বিশ ঘন্টা। যতক্ষণ চব্বিশ ঘন্টা

জপ না হয়, ততক্ষণ সাধন জীবন শুরু হবে না। আপনি দেখবেন গভীর মনযোগ সহকারে কাজ করে যাচ্ছেন, মনের ভিতর জপ হয়ে যাচ্ছে। ঘুম ভাঙলো, দেখবেন জপ হচ্ছে। স্নান করছেন, দেখবেন জপ হচ্ছে। এই চব্বিশ ঘন্টা জপ থেকে হয় সাকার দর্শন। চব্বিশ ঘন্টা জপের আগেই যদি আপনার ইষ্ট দর্শন হয়, বুঝবেন ওটা মনের একটা খেলা মাত্র, মন আপনাকে খেলাচ্ছে। আপনি যে কোন সন্ন্যাসী যিনি জপধ্যান করেছেন, এই জিনিসগুলিকে যাঁরা গভীর ভাবে জীবনে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে দেখুন, তাঁরাও একই কথা বলবেন –চব্বিশ ঘন্টা। এই চব্বিশ ঘন্টা জপ করার জন্য আগে দিনে চার থেকে ছয় ঘন্টা জপ করতে হয়। তবে গিয়ে চব্বিশ ঘন্টা জপের মধ্যে নিজেকে নিয়ে আসা যায়, আর এর পরেই হয় সাকার দর্শন।

ঠাকুর যখন মা কালীর দর্শন করলেন, তার আগে তিনি কত জপ করেছেন, কত সাধনা করেছেন। ঠাকুর দীক্ষিত ছিলেন, কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে তিনি শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তারপরে ওনার ছটফটানি শুরু হয়ে, এরও কত পরে তাঁর মায়ের দর্শন হতে শুরু হয়। এই সাকার দর্শনের পর হয় নিরাকার দর্শন। এরপর যেগুলো বলব সেসব কথা আপনি কিছু বুঝতে পারবেন না, কিন্তু আমি শিক্ষক আমার কাজ হল বলে যাওয়া। এই সাকার দর্শন লাভের পর অনেক ভক্ত বলেন, আমার আর লাগবে না।

কিন্তু এখানে বিষয়টা হল –এগিয়ে পড়, যদি আমরা এই বিষয়টাকে নিই, তাহলে কেমন হয়? ঠাকুর যেমন বলছেন, চন্দন কাঠ, রূপার খনি, সোনার খনি, হীরে-মাণিক। নিরাকার দর্শন যখন হয়ে গেল, অদ্বৈত জ্ঞান যখন হয়ে গেল, আমাদের বেশির ভাগই যে বর্ণনাগুলি আছে, বিশেষ করে অষ্টাবক্র-সংহিতার মত আদি গ্রন্থগুলি ওই অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়েই সব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ধর্ম জীবন তখনও শেষ হয়ে যায় না, কারণ তখনও ঠাকুরের এই কথা থেকে যাবে –এগিয়ে পড়। এরপর যেটা হয়, সেটা হল –*সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। ঠাকুর চেতন সমাধির কথা বলছেন, যেখানে ওই সমাধিতে যে জ্ঞান হচ্ছে তা না, জাগ্রত অবস্থাতেও আপনি দেখছেন সব কিছু চৈতন্য। তারপরে কি হবে? তারপর এই ঠাকুরের মত মা কালীর বিগ্রহের সম্মুখে চামর ব্যজন করে যাচ্ছেন। তার সাথে ঠাকুর বলছেন, মা এখনও আমাকে নূতন নূতন অনুভূতির মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কথাটা কি সাংঘাতিক একটা কথা। ঠাকুর সাকার সাধনার সময় এত কিছু দর্শন করেছেন, যাঁর অদ্বৈত জ্ঞান হয়ে গেছে; কিন্তু তারপরেও কত রকম দর্শন, কত নূতন নূতন অনুভূতি। পুরো লীলাপ্রসঙ্গ যেন শুধু দিব্য দর্শনের বর্ণনা। তাঁকে এখন অনেকে অবতার বলে মানতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বলছেন, মা আমাকে এখনও নূতন নূতন অনুভূতির মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কারণ ঈশ্বর অনন্ত, তাঁর জ্ঞান অনন্ত, অনুভূতিও তাই অনন্ত হবে। আপনি যদি অনন্তকাল ধরে চলতে থাকেন, তাহলেও কিন্তু এই চলা শেষ হয়ে যাবে না। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন –এগিয়ে পড়। আমাদের সমস্যা হল, অনন্তকে আমরা বুঝি না, আমরা অনন্তের ধারণা করতে পারি না। অনন্ত বলতে আমরা সমুদ্রের মত মনে করি, কি আকাশের মত বিরাট বড় মনে করি। এই পৃথিবী কত বিশাল, সেই পৃথিবীর উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একদিন সব পথ শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু অনন্তের পথ কোন দিন শেষ হয়ে যাবে না। কারণ যিনি অনন্ত, তাঁর কাছে পৌঁছানর পথও অনন্ত হবে।

দেবলোকে গিয়ে কিভাবে আপনি ঈশ্বরকে দেখেন? ব্রহ্মালোকে গিয়ে ঈশ্বরকে কিভাবে দেখান? কঠোপনিষদের মন্ত্রে বলছেন, *যথা দর্শে তথাত্মনি*। এই মন্ত্রে বর্ণনা করছেন, আত্মাকে বিভিন্ন জায়গায় কি রূপে ও কি ভাবে দেখা যায়। যেমন একটা বলছেন, *যথদর্শে তথাত্মনি*। আবার বলছেন *ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে*, ব্রহ্মলোকে আলো আর তার ছায়ার মত আত্মার দর্শন হয়। কোন লোকে কিভাবে দর্শন হয়, এগুলো আমরা শাস্ত্র থেকে যতটুকু জানতে পারছি। কিন্তু ঠাকুর এই শরীরে, এই মন দিয়ে কিভাবে কিভাবে কত রকমের দর্শন পেয়েছিলেন, সেটা মোটামুটি নথিবদ্ধ হয়ে আছে। এই সবগুলিকে মাত্র দুটি শব্দে বলা যায় –এগিয়ে পড়। এই 'এগিয়ে পড়' জিনিসটা, যারা স্কুলে পড়াশোনা করছে, এটা তাদের জন্যও দরকার। একটা ভার্টিকাল লিমিট থাকে। আপনার ছেলে হয়ত খুব

ইন্টেলিজেন্ট, সেও পরীক্ষায় কত নম্বর পাবে? একশতে একশ পাবে। কিন্তু সে ওখানেই থেমে যাবে না, কারণ তার হরাইজেন্টাল এ্যক্সপানসানের শেষ নেই।

দিল্লিতে আমার একজন বন্ধুর সাথে দেখা হল, সে খুব সুন্দর বলল, ‘সেভেন্টি পারসেন্ট পেয়ে আমি খুব ভাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। আর আজকে সেই কলেজে, সেই সাবজেক্টে নিরানব্বই পারসেন্ট, একশ পারসেন্ট নম্বর পেয়ে এ্যডমিশান নিচ্ছে। এই ছেলেরা আমার থেকে কি আহামরি ভাল হয়ে গেছে যে একশ পারসেন্ট নম্বর পাচ্ছে আর আমি সেভেন্টি পেয়েছিলাম’? কিছুই না, বরঞ্চ আরও মুর্খ। আপনি একশতে একশই পেতে পারেন, তার বেশি না, কিন্তু হরাইজেন্টাল এ্যক্সপানশান, বিভিন্ন লেখকের বই পড়া, বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান পাওয়া, এখানে কেউ আপনাকে আটকাতে পারবে না। আপনার বিবাহ হয়ে গেছে, আপনি এখন গৃহিণী হয়ে গেছেন, আপনার ভার্টিকাল লিমিট শেষ। আপনি এখন আর রাজনীতিতে যেতে পারবেন না, এমএলএ, এমপি হতে পারবেন না, চিফ মিনিস্টার হতে পারবেন না, কিন্তু আপনার হরাইজেন্টাল এ্যক্সপানশানকে কে থামাবে? আপনি চারটে লাইব্রেরির মেম্বার হয়ে যান, প্রচুর বই পড়ুন, ভাল সঙ্গ করুন, অনেক উচ্চ চিন্তা-ভাবনা করুন। শুধু ওই বস্তা পচা কয়েকটা নাটক, উপন্যাস না পড়ে, টিভি সিরিয়াল না দেখে এগিয়ে পড়।

সব কিছুতে একটাই মূল কথা আমি বলি, শ্রোতাগণ, দিনের শেষে একবার শুধু ভাববেন গতকালের তুলনায় আজকে আমি নূতন কিছু শিখলাম কিনা, নূতন কিছু করলাম কিনা, আমি আরও এগিয়ে পড়েছি কিনা। আজ যদি না করে থাকেন, আগামীকাল আপনি অবশ্যই এটা করুন। কারণ আপনি যদি এটা না করেন, তাহলে আপনি কিন্তু ঠাকুরের ভাব গ্রহণ করতে পারেননি। দ্বিতীয়, আপনি ভাল হিন্দু নন। যদি আপনি ভাল হিন্দু হন, আপনি থামবেন না, থামার প্রশ্ন নেই। আপনি বলতে পারেন, এটা তো যে কোন ধর্মেই হতে পারে। না, যে কোন ধর্মে হবে না। যে কোন ধর্মে কি হয়, একটা জায়গায় গিয়ে থেমে যায়। মৃত্যুর পরে স্বর্গে যাবে, ওখানেই ওই ধর্মের সব কিছু থেমে গেল।

যদিও এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, তাও বলা যেতে পারে। আমার একজন প্রিয় চরিত্র হলেন আল গাজালি। উনি একজন সুফি পণ্ডিত ও দার্শনিক ছিলেন। আল গাজালি বিরাট বড় পণ্ডিত লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁর মতগুলো এমন ছিল যে, যা হয়ে থাকে, মুসলিম রাজারা গজালিকে পছন্দ করত না। মুসলিম রাজারা তর্কাতর্কি করতে যাবে না, যদি মতের সঙ্গে না মেলে, যদি পছন্দ না হয় গলাটা কেটে রেখে দেবে। কিন্তু আল গাজালি এতটাই পপুলার ছিলেন যে রাজারা ওনার গলা কাটতে পারেনি, বদলে ওনাকে জেলের ভিতর পুরে রাখত। সেইজন্য উনি বেশির ভাগ সময় জেলেই কাটিয়েছেন। আল গাজালি যখন জেলে থাকতেন তখন উনি জেলের ভিতরেই ধ্যান করে কাটাতেন। আর ওনার বইতে ধ্যানের যে বর্ণনাগুলি দিচ্ছেন, কি সাংঘাতিক সব বর্ণনা। যেমন বলছেন, জ্যোতি দর্শন কেমন হয়। আপনার মনে হবে আপনি আমাদের কোন সাধু-সন্ন্যাসীর কথা পড়ছেন। উনি যখনই জেলের বাইরে থাকতেন, তখন আশেপাশে যত লাইব্রেরি ছিল সব লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশোনা করে যেতেন, জেলখানাও ওনার কাছে কোন বাধা ছিল না।

শ্রোতাগণ, এগুলো সব শুনছেন, শোনার পর বলবেন, মহারাজ কি সুন্দর সুন্দর সব গল্প বলেন; এর সঙ্গে মহারাজ যদি একটু গান করে দিতেন, কি সুন্দর জমে যেত আহা! এগোন, এগিয়ে পড়ুন; ঠাকুরের মূল মন্ত্র –এগিয়ে পড়। হিন্দু ধর্মের চির আদর্শ –এগিয়ে পড়। একবার অন্তত নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন আর ভাবুন, গতকালের তুলনায় আজকে আপনি কতটা উন্নতি করেছেন, কিভাবে নিজেকে উন্নত করেছেন। আধ্যাত্মিক জীবনে হোক, আপনার বৌদ্ধিক জীবনে হোক, সাংসারিক জীবনে হোক, দেখুন কতটা এগিয়েছেন। সংসার শব্দটা এসেছে সৃপ্ ধাতু থেকে, যেটা সরে সরে যায়। সংসারে কোন কিছু স্থির নেই, আপনি যদি এর মধ্যে না এগিয়ে থাকেন, তার মানেই আপনি পিছোচ্ছেন। একটা ঢালু রাস্থায় গাড়ি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, হয় সে সামনের দিকে যাবে, নয়ত

পিছনের দিকে ঢালু রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে নিচে নেমে আসবে। গাড়িকে জোর করে ঠেলতে থাকলে গাড়ি এগোবে, যদি না ঠেলেন, গাড়ি পিছিয়ে গড়িয়ে নিচে চলে যাবে। তাই যাঁরা মনে করছেন, বুড়ো বয়সে গিয়ে ধর্মকর্ম করবেন, তাঁদের এগিয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। ততক্ষণে আপনি এত ব্যাক মেরে দিয়েছেন যে, ওখান থেকে আর এগিয়ে গিয়ে নিজের অবস্থানে যাওয়া অসম্ভব। তবে শুরু করাটা খারাপ কিছু না, তা যেখান থেকেই শুরু করুন না কেন।

ঠাকুর আবার বলছেন –**একটু উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে করো না যে, সব হয়ে গেছে**। আপনি বেলুড় মঠ থেকে দীক্ষা নিয়েছেন, উৎসবের দিনগুলিতে এসে খিচুরি প্রসাদ খেয়ে যান, তাই বলে যে আপনার সব হয়ে গেল, তা না। দু-বার আপনি ঠাকুরকে স্বপ্নে দেখে নিয়েছেন, এটা কি একটা কোন কথা হল! ঠাকুরের নাম নিতে গিয়ে একটু রোমাঞ্চ হয়েছে, এটা একটা কথা হল! আর সবচেয়ে বড় কথা হল যে, আগেকার দিনে যে সম্প্রদায়গুলো ছিল, যেমন ধরুন বৈষ্ণব সম্প্রদায়; কি উচ্চমানের সম্প্রদায়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বইতে চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন কত সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের সব খুঁটিনাটি এত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে; এটার পর কি হয়, সেটার পর কি হয়; কথামৃতের মত এমন সুন্দর পুরো পরিষ্কার করে বর্ণনা করা হয়েছে, যা কিনা আর কোথাও পাওয়া যাবে না; থামাথামির কোন ব্যাপারই নেই। কারুর সঙ্গে আপনার কোন প্রতিযোগিতা নেই, এই নয় যে সবাই একই জায়গায় যাবে, প্রশ্নই নেই, কোন দিন যাবে না, কারণ এটা অনন্ত। মা আপনাকে আরও নূতন নূতন অনুভূতির মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন। যখন আপনি দেখবেন *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, তার আগে নির্বিকল্প সমাধি। ঠাকুর নরেনকে বলেছেন, নির্বিকল্প সমাধির কথা বলছিস, তার থেকেও উঁচু অবস্থা আছে। থামাথামির ব্যাপার নেই। এর আগে কথামৃতেরই এক জায়গায় ঠাকুর বলেছিলেন, ব্যবসাতে একটু একটু করে ব্যবসাকে বড় করতে হয়। থামতে নেই। একটু অন্তর্বীক্ষণ করতে হয়, গতকাল আমি যা ছিলাম আজকে আমি আরও বড় হয়েছি কিনা।

ঠাকুর ভাবে এখনও মার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছেন। **বলিতেছেন, "মা, একে সরিয়ে দাও"**। এখানে ঠাকুরের এই কথা শোনার পর কেদারের মনের অবস্থা ভেবে আমাদের অনেকরই হয়ত ভাল লাগবে না। আর সত্যিই শোনার পর আতঙ্কে কেদারের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। তবে কেদার কিন্তু কোন দিন ঠাকুরকে ছাড়লেন না। যেটা বলতে চাইছেন, ঠাকুর কেদারের ঢং-ঢাং পছন্দ করছেন না। ওখানে তারক (স্বামী শিবানন্দ) আছেন, উনি একজন পুরোপুরি নিষ্ঠাবান, পাশেই কেদার, নিষ্ঠাতে যাঁর এখনও ঘাটতি আছে, হয়ত সেইজন্য বলছেন বা অন্য কোন কারণে বলছেন, বলা মুশকিল।

কেদার শুষ্ককণ্ঠ। রামকে সভয়ে কহিতেছেন, 'ঠাকুর একি বলছেন'? কেদার ভয় পেয়ে গেছেন। কেদারের ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক, কারণ যাঁকে তিনি ধরেছেন, তিনি এভাবে মায়ের কাছে প্রার্থনা করে বলছেন, একে সরিয়ে দিতে। ঠাকুর কি বলতে চাইছেন পরিষ্কার নেই। কিন্তু আমরা জানি যে, কেদার ঠাকুরের একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন।

এদিকে আবার রাখাল এসেছেন, ঠাকুরের মানসপুত্র। রাখালকে দেখে ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট। **ভাবে রাখালকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন** –

'আমি অনেকদিন এখানে এসেছি! –তুই কবে এলি? সত্যি, এই জিনিসগুলিকে ব্যাখ্যা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এগুলো ভাবের কথা। এই জিনিসগুলিকে যাঁরা ব্যাখ্যা করবেন, জানবেন ব্যাখ্যাকার নাটকীয়তা করছেন। কারণ এর কি অর্থ হতে পারে একমাত্র ঠাকুরই জানতেন। মাস্টার মশাই অবশ্য এখানে একটা আভাস দিচ্ছেন –**ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি ঈশ্বরের অবতার, আর রাখাল তাঁহার একজন পার্ষদ –অন্তরঙ্গ?** ঠিক আছে, মাস্টারমশাই যেটা ভেবেছেন বলছেন। কোন দরকারই নেই কিছু বলার। যখন ঠাকুর ভাবে আছেন, তার মানে এই নয় যে সমস্ত কথা ঠাকুর যেটা বলছেন ওটা ঈশ্বরীয় কথা। কারণ; কি হয়, কথার উপর যে লাগাম, ওই অবস্থায় অতটা

থাকে না। ফলে কি হয়, ঠাকুরের মনে হয়ত তখন তিনটে কথা চলছে, বলতে গিয়ে এটার সঙ্গে ওটা চেপে যাচ্ছে। কারণ ঠাকুরের তখন অন্তর্দশা, অন্তর্দশায় যে কথাগুলো আসছে, সেগুলো যে সব সময় মিলবে, সব সময় যে সঠিক হবে, তার কোন মানে নেই। কিন্তু এটা ঠিক যে, ঠাকুর ওটা নিজের ব্যাপারে বলছেন, আর রাখালের ব্যাপার বলছেন। কি অর্থে বলতে চাইছেন, বলা খুব মুশকিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে মণিরামপুর ও বেলঘরের ভক্তসঙ্গে

(শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত নিজ চরিত)

৮ই জুনের পর আসছে ১০ই জুন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। এতক্ষণ আমাদের বক্তব্যের বিষয় ছিল – এগিয়ে পড়। এই জিনিসটা আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে ঘুরে ঘুরে আসে। স্বামীজীও বলছেন, এগিয়ে পড়। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, হিন্দু ধর্মের মূল মন্ত্র কি –এগিয়ে পড়। এগোতে শুরু করুন, বাকি তিনিই দেখিয়ে দেবেন। যে কোন জায়গায় যদি স্থির হয়ে যাওয়া হয়, তাহলে বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। স্থির একমাত্র ওই এক অবস্থায়, যখন অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সঙ্গে আপনি এক হয়ে গেলেন। তার আগে যদি কোথাও স্থির হয়ে যাওয়া মানেই কোথাও কিছু ভুল হয়ে যাচ্ছে।

আমার বয়স যখন কম ছিল তখন আমাদের একজন মহারাজ স্বামী ভর্গানন্দ মহারাজকে দেখেছিলাম। তিনি সংস্কৃতের বড় পণ্ডিত ছিলেন। মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর আশ্রমে অনেক দিন ছিলেন। আমাকে ছোটবেলা থেকে জানতেন, খুব ভালও বাসতেন। সাধু জীবনে অনেকের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে হয়। এগিয়ে পড় ব্যাপারটা বলতে গিয়ে ওনার একটা খুব সুন্দর কথা মনে পড়ছে। খুব সুন্দর কথা আমাকে বলেছিলেন। 'দেখ, ঘরবাড়ি ছেড়ে এসেছ; এটাই একটা বিরাট বড় মুক্তি'। আমাকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, সন্ন্যাসী হয়ে কি পেলে? সংসার থেকে বেরিয়ে এসেছি। ওরে বাবা! সংসার! এখনও ভাবলে আতঙ্ক লাগে, সংসার থেকে বেরিয়ে আসাটা এর থেকে বেশি কিছু পাওয়ার আছে আগে আমি বুঝতাম না। যাই হোক, মহারাজ খুব সুন্দর কথা বলেছিলেন, 'দেখ, ঘরবাড়ি ছেড়ে এসেছ, এটা সত্যিই একটা বিরাট পাওয়া'। এই কথা বলার পর আর-একটি মূল্যবান কথা বললেন – 'তবে এখন যেখানে আছো, এখানে সত্যিকারের খুব ভাল মানুষ, সাধু সজ্জন মানুষ আছেন। কোন ঝুট্ ঝামেলায় পড়লে না, খুব ভাল ভাল লোকের সঙ্গ করলে; এটাকে কখন জীবনের শেষ কথা মনে কর না'। উনি এমনি ভালবেসে আমাকে দুটো কথা বলছিলেন। কিন্তু তখন আমার এটাই মনে হত যে, এর থেকে বেশি আনন্দের আর কি আছে। সংসার জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়েছেন, বেলুড় মঠের মহারাজদের সঙ্গে আছেন আর এনারা যে কত উচ্চমানের সাধু, বাইরে থেকে কল্পনা করা যায় না, যাঁরা ভিতরে আছেন তাঁরাই শুধু জানেন। নিন্দুকরা তো শ্রীরামচন্দ্রকেও ছাড়ে না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও ছাড়ে না; নিন্দুকদের কথা বাদ দিন, আমরা ভিতরে আছি আমরা জানি কোনটা ঠিক। মহারাজ আমাকে তখন এগিয়ে পড় এই কথাটা বলেননি, কিন্তু এটাই বলতে চাইছিলেন।

আমার ব্লগে উপেন মহারাজের নামে একটা আমার লেখা দেওয়া আছে। উনিও আমাকে ছোটবেলা থেকে জানতেন। ওনার যখন একশর উপর বয়স, আমি নিয়মিত ওনার সাথে দেখা করতে যেতাম। আমাকে দেখেই রোজ এক প্রশ্ন করতেন, 'কেমন আছ'? আমিও যথারীতি বলি, 'ভাল আছি মহারাজ'। উনি তখন ঠিক এই কথাই বলতেন –'কচু ভাল আছ। এখনও তোমার ঈশ্বরদর্শন হলো না, এখনও জীবনমুক্ত হলে না, তারপরেও বলছ 'ভাল আছি'? কথামৃতে এই ধরণের কথা থাকলে বোঝা যায়, লেকচার দেওয়ার সময় এই উপদেশ দেওয়া তাও চলে। কিন্তু একজন একশ বছরের উপর বয়স হয়ে যাওয়া সন্ন্যাসী ভীষ্ম পিতামহের মত শয্যায় পড়ে আছেন। ভীষ্ম শরশয্যায় আর ইনি বার্দ্ধক্যের শয্যায়, যদিও তখন তিনি একটু চলাফেরা করতে পারতেন, কিন্তু বেশির ভাগ সময় শয্যায় পড়ে থাকতেন; ওই অবস্থায় তিনি এই কথাগুলো বলছেন। নরেন যেমন ঠাকুরের নামে বলছেন, শেষ শয্যায়

যদি উনি বলেন 'আমি অবতার' তাহলে মানব। তার মানে মৃত্যুর সময় সবারই দেহবোধটা বেড়ে যায়, আর সেই সময়েও তখনও কেউ যদি আধ্যাত্মিক ভাবে ঠিক ঠিক থাকতে পারেন, তখন এটাকেই বলা হয় আধ্যাত্মিক পুরুষ হওয়া।

তিনি দেহ ছাড়ার পরে পরেই 'কেমন আছ?' এই নাম দিয়ে মহারাজের উপর একটা article লিখলাম। 'ভাল আছি' বলাটাই ঠিক আছে। নিজের দুঃখের কথা, কষ্টের কথা কেন আমি অপরকে বলতে যাব। কিন্তু আপনি বসে গেলেন মানে ধসে গেলেন। কারুর যদি এই ভাব থাকে যে, এত দূর এসে গেছি আমার সব হয়ে গেছে, না, কিছুই শেষ হয়ে যায় না।

মাস্টারমশাই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ৮ই জুনের দুদিন পর রবিবার ১০ই জুনের বর্ণনা শুরু করছেন। সেদিন ঠাকুরের কাছে অনেকেই আছেন –রাখাল আছেন, মাস্টার নিজে আছেন, লাটু, কিশোরী, রামলাল, হাজরা আরও কেউ কেউ আছেন। মাস্টারমশাই সকাল সকাল এসে গেছেন।

ঠাকুর নিজের চরিত্র, পূর্বকাহিনী বর্ণনা করিতেছেন।

আমাদের ঠাকুর কেমন ছিলেন? একবার এক ভদ্রলোকের সাথে দেখা হল, ভদ্রলোক বড়লোক। উনি স্কুলে আমার সঙ্গে পড়তেন। ওনার সাথে ওনার মেয়ে ছিল। বেলুড় মঠে এসেছেন, আমার সাথে দেখা হয়ে গেল। বাচ্চা মেয়েটি যেমনি শুনল বাবার সাথে আমি পড়তাম, খুব উত্তেজিত হয় উঠে সে আমাকে জিজ্ঞেস করছে, 'মহারাজ আমার বাবা স্কুলে যখন ছিলেন তখন কেমন ছিলেন'? এই ব্যাপারটা অতি মধুর, আমি যাকে ভালবাসি, যার উপর আমার অস্তিত্ব, তার ব্যাপারে জানতে সবারই খুব ইচ্ছে হয় –ছোটবেলায় বা অল্প বয়সে উনি কেমন ছিলেন।

মেয়েদের স্বভাবের মধ্যেই একটু বেশি মধুর ভাব থাকে, ছেলেরা একটু কাঠখোট্টা হয়। ভগবান কৃষ্ণের জীবনেও দেখবেন, শ্রীকৃষ্ণ মথুরাদি চলে গেছেন; গোপীরাই জিজ্ঞেস করছেন। কারণ প্রত্যেকে মেয়ের মধ্যে মায়ের স্বভাব থাকে; মাতৃত্বের ভাব থাকে বলে মেয়েরা বেশি খোঁজখবর নেয়। আর তার সাথে মেয়ে মানেই তার ভিতর স্বাভাবিক একটা ভালবাসা থাকে। সেইজন্য ছেলেদের শক্তি যদি না থাকে তখন দু-দিক থেকেই মার খেয়ে যায় –ভালবাসাটাও নেই আর শক্তিটাও থাকে না। আর মেয়েদের মধ্যে শক্তি থাকে, তাহলে মেয়েরা দুটো পেয়ে যায় –ভালবাসাটাও আছে আর শক্তিটাও আছে। জন্ম থেকেই মেয়েদের ভালবাসা থাকে, একটা সাংঘাতিক শক্তি নিয়েই এনারা জন্মান।

এই যে জিজ্ঞেস করছে, আমার বাবা কেমন ছিলেন, তেমনি আমাদেরও জানার ইচ্ছে করে আমাদের ঠাকুর কেমন ছিলেন, আমাদের শ্রীশ্রীমা কেমন ছিলেন। কারণ তাঁদের নিয়েই আমাদের অস্তিত্ব, তাঁদের নিয়েই আমাদের জীবন। আমরা যখন ধর্মশাস্ত্রগুলো দেখি তাতে আমরা এই ধরণের অবতার পুরুষের বর্ণনা খুব বেশি পাইনা। বাইবেলে যীশুকে নিয়ে কিছু কিছু বর্ণনা পাই, খুব বেশি না। ভগবান বুদ্ধেরও কিছু কিছু পাই, তবে অনেক পরে ওগুলো লেখা হয়েছিল বলে কিছু এলেমেলো জিনিসও ঢুকে গেছে। বৌদ্ধরা কাহিনী বানাতে খুব ওস্তাদ।

যে হিন্দুরা বিভিন্ন কারণে হিন্দু ধর্ম ছেড়ে বৌদ্ধ ধর্মে চলে গেল, কোন কারণে ওদের মনে একটা খেদ থেকে গেল, হয়ত ছিল না। কিন্তু বক্তব্য হল, ওরা তখন হিন্দুদের যে দেবদেবী, হিন্দুদের যে আচার, হিন্দুদের যে ব্যবস্থা, সব কিছুকে হেয় করার জন্য বৌদ্ধ ধর্ম আর ভগবান বুদ্ধকে নিয়ে বিভিন্ন ভাবে প্রচার করতে শুরু করল। আজকে হিন্দু ধর্মে যত এলেমেলো জিনিস দেখবেন, এগুলো সব বৌদ্ধদের অবদান। ভারতবর্ষে যাঁরা আছেন সবাই হিন্দুই ছিল। কিন্তু এরাই হিন্দু ধর্ম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর হিন্দু ধর্মকেই পাল্টা আক্রমণ করতে শুরু করে। ভগবান বুদ্ধকে নিয়ে ওরা এমন এমন কাহিনী তৈরী করে দিল, তাতেও তারা থামল না। জাতক কথাতে এমন এমন ঘটনা সাজিয়ে দিল,

সেটাকে আবার অনেকে সত্য বলে মনে করে। এইসব কারণে ভগবান বুদ্ধের প্রকৃত জীবনী রূপে এগুলোকে নেওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের কথা ভাগবতে অল্প একটু আমরা পাই। আর বাকিগুলো সব ভাবজগতের জিনিস। অনেক পরে শ্রীশ্রীমা বলছেন, এই দেখ ঠাকুর এলেন, এখন অবতারের ছবি পর্যন্ত নেওয়া যাচ্ছে। কারণ তখন ফটোগ্রাফি এসে গিয়েছিল। ভগবানের চোখের চাহনি কেমন হয়, সমাধিতে ভগবান কেমন দেখান; সবটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। ঠিক তেমনি তাঁর ব্যবহার কেমন ছিল, তারও একটা ছবি পাই। এখানে একটা কথা বলে দিই, যখন আমরা ঠাকুরের জীবনী, মায়ের জীবনী দেখি, এনাদের জীবনের সবটাই কিন্তু অনুকরণীয় নয়, এটাকে দয়া করে মাথায় রাখবেন। আমাদের যে ওনার মতই হতে হবে তা না। আচার্য রূপে তিনি যা যা বলেছেন, সেগুলোকে আমাদের নিতে হবে। আর ওনার যেগুলো ভাল জিনিস, যে জিনিসগুলো আপনার ব্যক্তিত্বের সাথে খাপ খাচ্ছে, সেগুলোকে নেওয়া যায়, ওটাতে আরও জোর বাড়ে। মোদ্দা কথা হল, নিজের স্বাভাবিক যেটা, নিজের স্বভাব ছেড়ে অন্য কিছু অনুকরণ করতে নেই, ঠাকুর করতেন বলে আমিও করতে শুরু করে দেব, তা কখনই নয়। ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্বে তফাৎ থাকে। ঠাকুর এখানে নিজের সম্বন্ধে যা বলছেন, খুব মিষ্টি লাগে পড়তে, বেশি ব্যাখারও দরকার নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) –ও-দেশে ছেলেবেলায় আমায় পুরুষ মেয়ে সকলে ভালবাসত। ঠাকুরকে সেই সময় ভালবাসার অনেক কারণ ছিল। প্রথম কথা বয়স কম ছিল, মিষ্টি ছিলেন।

আমার গান শুনত। আবার লোকদের নকল করতে পারতুম, সেই সব দেখত ও শুনত। নকল করা একটা জিনিস, আর ভ্যাঙানো আর-একটা জিনিস। নকল করার জন্য প্রচুর বুদ্ধি দরকার। ভ্যাঙানো সবাই করতে পারে, যার কোন বুদ্ধি নেই সেও অন্যকে ভ্যাঙাতে পারে। দুটো পুরো আলাদা জিনিস। আমাদের দেশের নাটক, সিনেমায় কিছু কিছু অভিনেতা আছেন, যাঁরা খুব উচ্চমানের অভিনেতা। অত্যন্ত উচ্চমানের অভিনেতা বাংলা নাটকে, সিনেমায়, হিন্দি নাটক ও সিনেমায় পাওয়া যাবে। ফরাসী অভিনেতাদের মধ্যে অনেক উচ্চমানের অভিনেতা আছেন। এনাদের বৈশিষ্ট্য হল, এনারা নকল করেন। যেমন একজন অভিনেতা মৃত্যুর একটা দৃশ্যের অভিনয় করছেন। তিনি আগে কোথাও কাউকে মরতে দেখেছেন, এবার তিনি ওটাকে নকল করছেন, মৃত্যুর নকল করছেন। এই যে মরছেন এটাকে কত ভাবে নকল করছেন। আমাকে যদি কেউ মরে যাওয়ার নকল করতে বলে, আমি এক রকম নকল করতে পারব। ওটাকে যদি খুব উচ্চমানের অভিনেতা নকল করতে বলা হয়, তিনি ছয় রকম কি সাত রকম ভাবে নকল করে দেবেন। অভিনয়ে বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে পারেন, এটা হল sign of intelligence। কোন নামকরা অভিনেতা হয়ত কোন শিক্ষকের চরিত্রের অভিনয় করবেন। যদিও তিনি নিজের স্কুল-কলেজ জীবনে শিক্ষকরা কিভাবে পড়ান দেখেছেন, তারপরেও ওনারা কোন শিক্ষককে দেখবেন তিনি কিভাবে ক্লাশে পড়াচ্ছেন, কিভাবে ছাত্রদের সাথে ব্যবহার করছেন, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন; পরে অভিনয়ে ওটাকেই নকল করেন। কিংবা রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালাদের ভাল করে দেখেন, যেটা দেখলেন ওটাকেই এবার নকল করবেন। এটা হল খুব হাই লেভেল অফ ইন্টেলিজেন্স, সবাই নকল করতে পারেনা। সিনেমা জগতে যত নায়ক-নায়িকা আছে, দেখবেন একটা দুটো সিনেমাতে অভিনয় করতে করতেই ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যায়। কারণ এরা আসলে নকল না করে ভ্যাঙাচ্ছে, ভ্যাঙানোটা আরেকটু স্থূল। ঠাকুর ছিলেন নকল করার ওস্তাদ। স্বামীজী কিন্তু এই জিনিস পারতেন না। এখানে সেখানে স্বামীজী একটু আধটু নকল করতেন, কিন্তু ভাল পারতেন না। ঠাকুর এটাতে ওস্তাদ ছিলেন। নকল করাটা একটা type of intelligence, তার মানে এই নয় যে, যিনি নকল করাতে পারদর্শি তিনি সব কিছুতেই ওস্তাদ হবেন। তবে যাঁরা খুব ভাল নকল করতে পারেন, ওনারা সবাইকে খুব আনন্দ দেন। যারা ভ্যাঙায় তাদের লোকেরা পছন্দ করে না। যদি আপনি কারুর ভাল নকল করতে পারেন, সেই লোকটাও আপনাকে সম্মান দেবেন। কিন্তু যদি ভ্যাঙান, তখন একটা বাচ্চাও আপনার উপর রেগে যাবে।

তাদের বড়ির বউরা আমার জন্য খাবার জিনিস রেখে দিত। কিন্তু কেউ অবিশ্বাস করত না। সকলে দেখত যেন বাড়ির ছেলে।

কামারপুকুর তখন খুব গরীব দেশ, পুরো দেশটাই সেই সময় গরীব ছিল। ঠাকুরের বাড়ির লোকেরা তো বিশেষ ভাবে গরীব ছিলেন। এই যে বলছেন, সকলে দেখত যেন বাড়ির ছেলে; এটা একটা খুব সুন্দর কথা। আমাদের ভাইস-প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী ভজনানন্দজী মহারাজ, একজন বড় জ্ঞানী ও ত্যাগী সন্ন্যাসী। অনেক আগে তিনি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন। ছাত্রাবস্থায় ব্যঙ্গালোর মঠে উনি যখন আসা-যাওয়া করতেন, সেই সময়কার খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন। আমারও তখন বয়স কম ছিল, শুনে আমার খুব ভাল লেগেছিল। 'যে স্বামীজীরা তখন ব্যঙ্গালোর আশ্রমে ছিলেন, ওনারা আমাদের বাড়ির ছেলের মত দেখতেন'। কথাটা তখন আমার এত সুন্দর লেগেছিল যে কি বলব। এটা বলেই তিনি বললেন, 'কিন্তু এখন সব পাল্টে যাচ্ছে'। আমাদের আশ্রমে দেখবেন একটা শব্দ খুব প্রচলিত –ভলেণ্টিয়ার। ভলেণ্টিয়ার কেন? তুমি আমাদের আশ্রমের ছেলে, সবটাই বাবা তোমার জন্য খোলা।

আমাদের জন্য একটা খুব লজ্জার কথা। প্রথম দিকে আমি দেওঘর বিদ্যাপীঠে ছিলাম, পরে অন্যান্য জায়গাতেও ছিলাম; নরেন্দ্রপুরে ছিলাম, কানপুরে ছিলাম; তবে ওখানকার ছেলেদের সঙ্গে দেওঘরের তুলনায় কম মিশেছি। একবার একটা দুষ্টু ছেলেকে বললাম, 'তোমরা এখানে যে বদমাইশিগুলো করছ, বাড়িতেও কি এই জিনিস কর'? ছেলেটি আমাকে বলল, 'আপনারা কি আমাদের বাড়ির ছেলের মত মনে করেন'? শোনার পর মনে হল কে যেন আমার গালে একটা চড় মারল। ছেলেটি তো ঠিক কথাই বলেছে।

বিভিন্ন করপোরেট কোম্পানিগুলিতে দেখবেন, ওরা আপনাকে বলবে, এটা তোমারই কোম্পানি, তোমার বাড়ির মত। পর দিনেই আবার আমাকে যে কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে কোম্পানি থেকে বার করে দেবে। কিসের বাড়ির মত হল? যখন কেউ আপনাকে বাড়ির ছেলের মত, বাড়ির মেয়ের মত ব্যবহার করে, তখন আপনার ব্যক্তিত্ব খুব মজবুত ও দৃঢ় হয়। এতে কি হয়, যাঁরা বাড়ির ছেলে বা মেয়ের মত ব্যবহার করেন, তাঁদেরও ব্যক্তিত্ব মজবুত হবে, যাঁদের সঙ্গে এরূপ সম্পর্ক রাখেন তাঁদেরও ব্যক্তিত্ব মজবুত হবে। কারণ পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাসটা সুদৃঢ় হয়।

গুরু-শিষ্যের একই সম্পর্ক। গুরু যখন দেখেন শিষ্য বাড়ির ছেলে; শিষ্য যখন দেখে গুরুগৃহ আমার গৃহ, তখনই এই সম্পর্ক মজবুত হয়। শিক্ষার জগতে, ধর্মের জগতে, চিকিৎসা জগতে এই সম্পর্ক তৈরী হচ্ছে কিনা দেখতে হয়। তা নাহলে সবাই সবাইকে লুটেপুটে খেতে চাইবে, সবাই নিজের সুবিধা নেওয়ার জন্য উভয় উভয়কে চুষে নেওয়ার চেষ্টা করে যাবে।

স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ, উনিও ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন, বর্তমানে গত হয়েছেন। আমাদের যখন বয়স কম ছিল, এনারা তখন আমাদের আচার্য ছিলেন। উনি আমাকে বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের পার্সোনালিটির উপর একটা রিসার্চ ওয়ার্ক করতে; করা আর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ঠাকুরের এই কথাগুলো এত সুন্দর, এখানেই বোঝা যায় ঠাকুর কেমন ছিলেন। কিন্তু তারপরেই বলছেন –

কিন্তু সুখের পায়রা ছিলুম। বেশ ভাল সংসার দেখলে আনাগোনা করতুম। যে-বাড়িতে দুঃখ বিপদ দেখতুম সেখান থেকে পালাতুম। এই বাক্যটাই ভবিষ্যতে গিয়ে, যখন নিন্দুকরা ঠাকুরের নিন্দা করার জন্য আসবে, আর ঠাকুরের খুঁতগুলো যারা বার করার চেষ্টা শুরু করবে, তখন ঠিক এই জায়গাটেকেই তারা ধরবে। আপনারা আগেও এই বাক্যটা পড়েছেন, কিভাবে দেখেছেন জানিনা, কিন্তু বাক্যটা অত্যন্ত গভীর; যত সহজ মনে হয়, ততটা সহজ না।

ঠাকুর বলছেন, যে-বাড়িতে দুঃখ বিপদ দেখতুম সেই বাড়ি থেকে পালাতুম। আমরা এই বাক্যটাই যদি ধরি তাহলে তো বলতে হয়, ঠাকুরের নিজের বাড়িতেই তো অভাব ছিল। কই তিনি তো পালালেন না। কিন্তু তার থেকেও বড়; ঠাকুরের যখন উপনয়ন হয়, সেই সময় তিনি ধনী কামারিনীকে কথা দিয়েছিলেন যে তিনি উপনয়নের প্রথম ভিক্ষা তাঁর কাছ থেকেই নেবেন। তখনকার দিনে জাতপাত খুব মানা হত। নিজের মায়ের কাছ থেকে না নিয়ে একটু নিচু জাতির মেয়ের কাছ থেকে তিনি প্রথম ভিক্ষা নিতে চাইলেন, এবং নিলেনও। এমনি এমনি একদিন আলাপেই তিনি ধনী কামারিনীর কাছ থেকে ভিক্ষা নিলেন না। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর আগে থেকেই ভাল পরিচিতি ছিল, একটা সম্পর্ক তৈরী হয়ে গিয়েছিল। গদাইয়ের বাড়িতে অবশ্যই আসা-যাওয়া করতেন।

তাহলে ঠাকুর এখানে যে সুখের পায়রা ছিলেন বলছেন, কেন বলছেন? আমি রামকৃষ্ণ মিশনে নূতন জয়েন করার পর শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ মাঝে মাঝেই আমাকে ঠাকুরের জীবন থেকে কিছু কিছু ঘটনা বলতেন। সেই সময় 'সুখের পায়রা' কথাটা তাঁর কাছেই প্রথম শুনেছিলাম; আমার ভাল লেগেছিল। পায়রা যেখানে সুখ আছে দেখে সেখানেই সে থাকে। অভাব একটা জিনিস, অভাব থেকে যখন দুঃখ-দারিদ্র জন্ম নেয়, তখন সেটা আর-একটা জিনিস। অভাব যে কোন লোকেরই হতে পারে, একজন সন্ন্যাসীরও হতে পারে।

উত্তরকাশীতে আগে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের একটা কুঠিয়া ছিল। বর্তমানে সেখানে আশ্রম হয়েছে। মহারাজরা তপস্যাদিতে গেলে কুঠিয়াতে থাকতে দেওয়া হয়, আর একটা কমণ্ডলু দিয়ে দেওয়া হয়। ওই কমণ্ডলু নিয়ে দেড় থেকে দু-কিলোমিটার দূরে কয়েকটা অন্নসত্র রয়েছে, সেখানে আপনাকে ভিক্ষা দিয়ে দেবে। দু-কিলোমিটার যেতে দু-কিলোমিটার আসতে মোট চার কিলোমিটার হাঁটা। তার মানে আপনি যে দুপুরে রুটি ডাল খাবেন, আমাদের যা শরীর ওই রুটি ডাল খাওয়াও যাবে না। ওই ডালকে আর-একবার সেদ্ধ করতে হবে, একটু মশলা দিতে হবে, তা নাহলে আপনারা খেতেই পারবেন না। আমাদের রোজ তাই করতে হত আর তাই খেতে হত।

আমাদের যাঁরা নূতন সন্ন্যাসী হতেন, তাঁরা চারধাম করার জন্য উত্তরকাশী যেতেন। উত্তরকাশীতে আমিও অনেকদিন ছিলাম। একবার আমার সঙ্গে আমাদের দুজন মহারাজ ছিলেন, দুজনই এখন অত্যন্ত নামকরা মহারাজ। দুজনেরই তখন নূতন সন্ন্যাস হয়েছে, দুজনকে নিয়ে আমি যাচ্ছি। আমি মনে মনে ভাবছি, আমরা তিনজন হাতে পাত্র নিয়ে উত্তরকাশীর বাজারের মাঝখান দিয়ে ড্যাং ড্যাং করতে করতে চলেছি। যে দুজনকে আমি নিয়ে যাচ্ছি, এনারা সন্ন্যাসী না হয়ে বাইরে থাকলে তখনকার দিনেই লক্ষ লক্ষ টাকা মাসে আয় করতেন আর লোকেরা সবাই সেলাম দিত। অবশ্য এখন আরও বেশি লোক সেলাম দেয়। কোথায় যাচ্ছি তিনজন? ভিক্ষা করতে। অন্নসত্রে সময়ের মধ্যে না পৌঁছালে ওদের জানালা বন্ধ হয়ে যাবে, আর সেদিন পুরো দিনটা না খেয়ে থাকতে হবে।

কপাল এমন, যে ঘটনার কথা আপনাদের বললাম, তার ঠিক তিন মাস পরে তিনজনই কলকাতায় ছিলাম। কোন কারণে একটা কনফারেন্সে আমাদের তিনজনকেই ইনভাইট করা হল, তিনজনই একসাথে গেলাম। কোথায় হবে কনফারেন্স? কলকাতার একটা নামকরা ফাইভ স্টার হোটেলে। আমরা তিনজনই ফাইভ স্টার হোটেলে বুফে খাচ্ছিলাম। আর হঠাৎ উত্তরকাশীর কথা মনে পড়তে তিনজনই হাসছি। তিন মাস আগে এই তিনজন কমণ্ডুলু নিয়ে উত্তরকাশীর রাস্থা দিয়ে রুটি ডালের ভিক্ষা করতে যেতেন। তিন মাস পর পরিস্থিতি এমন হয়ে গেল যে, একটা ফাইভ স্টার হোটেলে ওই তিনজনকে কনফারেন্সের জন্য যেতে হল। বুফেতে পঞ্চাশ ষাট রকমের খাবারের আইটেম দিয়ে সাজানো। যার যা খুশি, যত খুশি খেয়ে যাও। এই যে উত্তরকাশীতে একটা অভাব ভাব এসেছিল, সেখান থেকে কেমন একটা পরিস্থিতি হয়ে গিয়ে আবার অন্য রকম হয়ে গেল। সন্ন্যাসীর যে অভাব, এই অভাবে দারিদ্রতা নেই। সন্ন্যাসীর এই যে অভাব, এটা সত্ত্বগুণে আশ্রিত, তার মানে ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত।

যাঁদের বয়স হয়েছে তাঁরা দেখে থাকবেন, আগেকার দিনে যে সমাজে আপনারা বড় হয়েছেন, সেখানে ব্রাহ্মণরা, শুধু ব্রাহ্মণরা কেন, বেশির ভাগ মানুষই শাস্ত্র পড়তেন। অভাব আছে, কোন অসুবিধা নেই, হয়ত না খেয়ে থাকবেন কিন্তু নিত্যপূজা, নিত্যকর্ম, নিত্য শাস্ত্রপাঠ একদিনের জন্যও বন্ধ থাকবে না। কিন্তু ঠাকুর এখানে যে দুঃখ বিপদের কথা বলছেন, এগুলো তমোগুণ থেকে আসে। আপনারা দেখে থাকবেন, আপনাদের আশেপাশে কিছু লোক আছে যাদের সব কিছুতে কেবলই দুঃখ। অপরকে শুধু নিজের দুঃখের কথা, শুধু কান্নার কথা বলতে থাকবে। আগেকার দিনের অভাবগ্রস্ত লোকেদের আত্মসম্মান ছিল। আমাদের মহাভারতের ক্লাশের একজন লোক কমেন্ট বক্সে লিখল –দেশে জিনিসপত্রের এত দাম বেড়ে যাচ্ছে, আর আপনি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ নিয়ে লেকচার দিচ্ছেন? আরে ভাই, দাম বেড়ে যাচ্ছে এটা দেখার জন্য সরকার আছে, বিরোধিতা করার জন্য বিরোধীরা রয়েছে; এটা তো আমার কাজ না। কেন আমি এগুলো নিয়ে বলতে যাব?

এই যে দুঃখ বিপদের কথা বলছেন, যাদের দেখবেন পদে পদে দুঃখ বিপদ, তার মানে এরা জীবনটাকে খেলো করে নিয়েছে। অভাব মানেই যে তার আত্মসম্মান হারিয়ে যাবে, তা না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীরা কোরিয়াতে ঢুকে গিয়েছিল। সেখানে এক মহিলার আমি বর্ণনা পড়েছিলাম। যা হয়ে থাকে, যুদ্ধের সময় কেউ আইন নিয়ম মানে না। জাপানীরা বেঁটে খাটো হয়, এক জাপানী একজন মহিলাকে লাইনে দাঁড় করিয়ে চড় মারতে গেছে। সেই মহিলাটি ঠিক করলেন, মার যখন খেতেই হবে পুরো সম্মানের সাথে মার খাব। মহিলাটা হঠাৎ একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। জাপানী সৈন্য ওর গাল পর্যন্ত হাত নিয়ে যেতে পারছে না, মারার জন্য একটা টুল আনতে হল। লোকটিকে মহিলা হাসির পাত্র বানিয়ে ছাড়লেন। এটাকেই আপনি মৃত্যুকে হাসির পাত্র বানাতে পারেন না? রোগ, ব্যাধি, ক্যান্সার, হার্টব্লক এগুলোকে হাসির পাত্র বানিয়ে দিতে পারেন না? সম্মান নিয়ে দাঁড়িয়ে যান, দেখবেন সবাই হাসির পাত্র হয়ে যাবে।

কেন মিছিমিছি দুঃখবোধ করছেন, দারিদ্রবোধ কেন করছেন? কারণ নিজের আত্মসম্মানকে বিসর্জন দিচ্ছেন, নিজেকে ঘোর তমোগুণের মধ্যে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। ঠাকুর এই রকম জায়গায় থাকতেন না, থাকেন না, থাকবেন না। আপনাকে কোন দুঃখ থেকে ঠাকুর উদ্ধার করবেন না, কেউ করতেন না, কেউ করবেনও না। এক আধটা কাহিনী আছে, শঙ্করাচার্য কিভাবে তাকে ওটা দিলেন, তাকে ওটা করে দিলেন, এগুলো একটা-দুটো আছে। ঠাকুরও এক আধটা করেছেন, ধনী কামারিনীকে করেছেন। কিন্তু যেখানে তমোগুণ থাকবে, সেখানে ঈশ্বরের শক্তি পৌঁছাবে না। যেখানে দুঃখ দারিদ্র নিয়ে মানুষ চোখের জল ফেলছে, সেখান থেকে ঈশ্বর অনেক দূরে থাকেন। ভগবান বুদ্ধের কাহিনীতে আছে, এক বৃদ্ধা মহিলার কিছু নেই, তিনি নিজের বস্ত্র দিয়ে গাছের পিছনে লুকিয়ে আছেন। এটাই তাঁর দেওয়ার। তার মানে, দারিদ্র জিনিসটা তাকে ছুঁতে দিল না। আবার লজ্জাকে যে হারিয়ে দিচ্ছেন সেটাও না, গাছের আড়ালে লুকিয়ে যাচ্ছেন। নিজের আত্মসম্মানকে হারাচ্ছেন না, কাপড় হল নিজের ডিগনিটি রক্ষা করার জন্য। আজকের সমাজে লোকেরা স্বল্পবাস নিয়ে যাই বলুক, তারকা-তারিকারা যা করছে; না বলাই ভাল। কিন্তু আসল জিনিসটা হল আত্মসম্মান, পোশাক-আশাক ডিগনিটিকে রক্ষা করে। আজকাল বলে, আমার ইচ্ছা আমি যেমন খুশি ড্রেস পরব। অবশই, তোমার ইচ্ছা তুমি ডিগনিটি নিয়ে খেলা করবে কি করবে না। লোকেদের কি আর করার আছে, যতক্ষণ আইন না থাকে ততক্ষণ বলার কিছু নেই।

ঠাকুর সুখের পায়রা ছিলেন, যেখানে সত্ত্বগুণের প্রকাশ, একমাত্র সেখানেই ঠাকুর থাকবেন। যেখানে তমোগুণের প্রকাশ সেখানে ঠাকুর থাকবেন না। ঠাকুর তাই বলছেন, যেখানে দুঃখ বিপদ দেখতুম সেখান থেকে পালাতুম। হাল্কা করে বলছেন ঠিকই। অন্য দিকে নরেন্দ্রনাথ, তাঁর এত দুঃখ কষ্ট, অথচ ঠাকুর সর্বদা নরেনের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, এক মুহূর্তের জন্য তাঁকে ছেড়ে দিচ্ছেন না। কারণ নরেন্দ্র হলেন সেই সত্ত্বগুণের একাধারে প্রকাশ ও আধার। আপনারা যাঁরা মন দিয়ে শুনছেন, এই জিনিসটার প্রতি যেন নিষ্ঠা থাকে, এটাকে মাথায় রাখা। যে জিনিসগুলিকে মানুষ ভয় পায়, দুঃখ, বিপদ,

দারিদ্র, মৃত্যু, রোগ, শোক; হেসে উড়িয়ে দিতে হয়। মনে রাখবেন, কান্নাকাটি করলেও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবেন না, কান্নাকাটি করলেও আপনি রোগ শোক থেকে রেহাই পাবেন না।

ছোকরাদের ভিতর দু-একজন ভাল লোক দেখলে ভাব করতুম। দেখুন ঠাকুর কি বলছেন? ভাল লোক দেখলে। ঠাকুরের তখন বয়স কম, তাঁর কাছে তখন ভালর মাপকাঠি কি ছিল আমাদের জানা নেই। কিন্তু যারা অপরের ক্ষতি করছে না, অন্য দিকে হেসে-খেলে-মজা করে, আনন্দে থাকে। **কারুর সঙ্গে সেঙাত পাতাতুম**। সেঙাত পাতানো মানে, নিজের মনের মত কারুকে জুড়ি বানিয়ে নেওয়া, বিশেষ বন্ধু রূপে পরিগম্য। গ্রাম দেশে এগুলো খুব দেখা যায়। **কিন্তু এখন তারা ঘোর বিষয়ী**। কিছু করার নেই, বলারও নেই; সবাই তো আর ঠাকুরের মত নন। ঠাকুর নিজের দু-একজন বন্ধুর কথা এখানে সেখানে বলেছেন। **এখন তারা কেউ কেউ এখানে আসে, এসে বলে, ও মা! পাঠশালেও যেমন দেখেছি এখানেও ঠিক তাই দেখছি**। সেই অল্প বয়সে ঠাকুর যেমন সরল ছিলেন এখনও তেমনটিই আছেন। অথচ ভিতরের সব কিছু পাল্টে গেছে। ঠাকুর নাম শুনে এনারা এখন তাঁদের ছোটবেলার সেই গদাইকে দেখতে আসছেন। কেউ বলছে গদাই পাগল হয়ে গেছে, কেউ হয়ত বলছে, গদাইয়ের নাম হচ্ছে। কি সুন্দর কথা –পাঠশালে যেমন দেখেছি এখানেও ঠিক তাই দেখছি; মনটা একটুও কলুষিত হয়নি।

পাঠশালে শুভঙ্করী আঁক ধাঁধা লাগত! কিন্তু চিত্র বেশ আঁকতে পারতুম; আর ছোট ছোট ঠাকুর বেশ গড়তে পারতুম। এগুলো এক-একটা ট্যালেন্ট।

সদাব্রত, অতিথিশালা –যেখানে দেখতুম সেখানে যেতুম, গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতুম।

কোনখানে রামায়ণ কি ভাগবত পাঠ হচ্ছে, তা বসে বসে শুনতুম, তবে যদি ঢঙ করে পড়ত, তাহলে তার নকল করতুম, আর অন্য লোকেদের শুনাতুম। আমাদের এটা সংস্কৃতি, যেখানেই কোন পৌরাণিক কাহিনী পাঠ হত গ্রামের ছেলেবুড়ো সবাই শুনতে যেত। আমরাও ছোটবেলায় গ্রামে রামায়ণ মহাভারত পাঠ কিংবা যাত্রা হলে শুনতে যেতাম। কিন্তু ঠাকুরের এটাই কাজ ছিল, সারাদিন এটাই করে বেড়াতেন। আমাদের মত পার্ট টাইমার ছিলেন না। আমরা যেমন কোথাও যাত্রাদি হলে সময় পেলে দেখতে যাই, সেই রকম না, সব সময় এটাই করতেন।

মজার ব্যাপার হল যীশু খ্রীষ্টও এ-রকম ছিলেন। বাইবেলে পাসওভারের কথা আছে, পাসওভার ওদের একটা উৎসব। যীশুও মা-বাবার সঙ্গে গেছেন। উৎসব শেষে মা-বাবা ফিরে আসবেন, দেখছেন যীশু নেই। খুঁজতে লাগলেন, খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গেছেন। জেরুজালেমে গিয়ে দেখছেন একটা মন্দিরে ধারের পণ্ডিতরা তর্ক করছে, যীশুও সেখানে অংশ নিচ্ছেন। তখন তিনি দশ-বারো বছরের। বাবা-মা প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেলেন, 'আমরা তোমাকে কোথায় কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছি, এখানে তুমি কি করছ'? যীশু খুব সুন্দর উত্তর দিচ্ছেন, 'তোমরা কি জানতে না যে, আমাকে খুঁজতে হলে আমার বাবার বাড়িতে গিয়ে খুঁজতে হবে'?

যাঁরা খুব নিষ্ঠা সহকারে আমাদের এই ক্লাশগুলো শুনে যাচ্ছেন, দেখবেন তাঁদের আর নাটক, নভেল এগুলো পড়তে ভাল লাগবে না; সিনেমা, টিভি সিরিয়াল দেখতে ভাল লাগবে না; পাড়ার লোকেরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে যে পরনিন্দা-পরচর্চা করে সেগুলো আর শুনতে ভাল লাগবে না। পুরনো অভ্যাসে একটা দুটো সিনেমা নাটক দেখলেন ঠিক আছে, কিন্তু ওর মধ্যে মনটা আগের মত যেমন মজে যেত, সে-রকম আর হবে না। ঠাকুরের তো কোন প্রশ্নই নেই। সেখানে যদি কেউ ঢং করে রামায়ণ পড়ছে দেখতেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওই ঢং ঢাংগুলো নকল করতে শুরু করতেন। এই হিউমারটা আমরা কোথাও কোন অবতারের জীবনে পাইনা। শুধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনীতে আমরা পাই, যখন তিনি বাল্যাবস্থায় গোকুলে ছিলেন, সেখানে তিনি এগুলো করতেন; কিন্তু তখন উনি নেহাতই বাচ্চা।

মেয়েদের ঢঙ বেশ বুঝতে পারতুম। তাদের কথা, সুর নকল করতুম। কড়েরাঁড়ী বাপকে উত্তর দিচ্ছে 'যা-ই'। কড়েরাঁড়ী একটা গ্রাম্য শব্দে, অর্থ খুব ভাল না, আলোচনা না করলেই ভাল। 'যা-ই' কথাটা খুব লম্বা করে বলছে মানে, সে শুধু বাবাকে উত্তর দিচ্ছে না, আশেপাশে যারা আছে তাদেরকেও তার উপস্থিতি জানান দিয়ে দিচ্ছে। Sense of desire for recognition, এটা অনেকের থাকে, লোকে আমাকে জানুক; সেইজন্য আশেপাশে যারা আছে তাদেরকেও শুনিয়ে দিচ্ছে। ঠাকুর এটাকে ভাল চোখে দেখতেন না।

বারান্দায় মাগীরা ডাকছে, 'ও তপ্‌সে-মাছওলা'! এগুলো কামারপুকুরের বর্ণনা। **নষ্ট মেয়ে বুঝতে পারতুম**। কামারপুকুরে কোথায় নষ্ট মেয়ে পেতেন ভগবান জানেন। **বিধবা সোজা সিঁথে কেটেছে, আর খুব অনুরাগের সহিত গায়ে তেল মাখছে। লজ্জা কম, বসবার রকমই আলাদা**। এসব কথা অনেক সময় অনেকের কাছে আপত্তিকর কথা বলে মনে হবে। আমি একবার ট্রেনে যাচ্ছিলাম। একজন ভদ্রলোক, ঠিক ভক্ত না, তবে ঠাকুরের ব্যাপারে জানেন। উনি আমাকে চেপে ধরলেন, 'শ্রীশ্রীমা কেন বিধবা বেশ ধারণ করেছিলেন? তিনি যদি এটা না করতেন, তাহলে আজকে কত শান্তি হত'। বুঝলাম ওনার মায়ের হয়ত এই রকম কোন কষ্ট আছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'দেখুন, তাও তো মা সোনার বালা পরতেন, বিধবারা তো তাও পরত না। কিছুটা তো লাইসেন্স দিলেন। আজকের দিনে বিধবারা সিঁদুর শাঁখা পরা ছাড়া সবই তো করেন। আর যাদের বয়স কম, তারা অতটাও মানে না'।

একটা সাধারণ কথা বলি, আমাদের মনে রাখতে হবে পরে ঠাকুরের এই কথাগুলোকে নিয়ে পরে নিন্দুকরা সমালোচনা করবে। কিন্তু একটা কথা খুব জরুরি, যে কোন অবতার যখন আসেন, তিনি কখনই তৎকালীন সমাজের কোন কিছু ভেঙে চুরমার করে দেন না। সমাজ যেমন আছে তেমনটাই তাঁরা থাকতে দেন। সেখান থেকে ধীরে ধীরে সমাজকে একটা আধ্যাত্মিক ভাবে নিয়ে চলে যান। গীতায় ভগবানও বলছেন, *ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ*, অজ্ঞানীদের বুদ্ধিভেদ কখন করবে না। বুদ্ধিভেদ মানে, যেখানে তুমি আছ, সেখানকার লোকেরা যে চিন্তা-ভাবনা বুদ্ধি নিয়ে আছে, সেই চিন্তা-ভাবনার বিরুদ্ধে গিয়ে 'তোমাদের এটা ভুল, এটা কোন কাজের জিনিস নয়', এ-সব বলে বুদ্ধিভেদ করতে নেই। সেইজন্য যাঁরা সমাজের পরিবর্তন করতে চান, যেটা তখন ব্রাহ্মসমাজ করতে চেয়েছিল, এভাবে করতে গেলে হিতে বিপরীত হয়ে যায়। এখন ইয়ং ছোকরারা জন্ম নিয়েই বলছে, এই সমাজকে আমরা পাল্টে দেব। অবতার যাঁরা আসেন, তাঁরা কখনই এ-রকম কাজ করবেন না। ভগবান কি বলছেন? *জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি*, ওরা যেমনটি করছে, তুমিও তেমনটি করবে। এই কথা কাদের জন্য বলছেন? যাঁরা শিক্ষক, সমাজকে যাঁরা শিক্ষা দেবেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বলছেন। কেন বলছেন? *বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্*, যাঁরা সত্যিকারের বিদ্বান্, যাঁরা সত্যিই ভাল করতে চান, তাঁরা এভাবেই কাজ করেন। আপনি যদি সত্যি কারুর ভাল করতে চান, আপনাকে তার মতই থাকতে হবে, আচার-ব্যবহার তার মতই করতে হবে।

একটা ঘটনার কথা বলা যেতে পারে, যদিও এর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক নেই। জিম করবেট ছোটবেলায় স্কুলে পড়ার সময় ছাত্রদের বন্দুক চালানোর ট্রেনিং দেওয়া হত। একবার ছাত্রদের ট্রেনিং দেখার জন্য একজন বড় আর্মি অফিসার এসেছিলেন। আর্মি অফিসারকে কানে কানে বলে দেওয়া হল যে, জিম করবেটের নিশানা সবচেয়ে ভাল। আর্মি অফিসার জিম করবেটকে নিশানা দিয়ে বললেন, চালাও তোমার বন্দুক। প্রথমবার বন্দুক মারল, গুলি লক্ষ্যে লাগল না। আবার চালালো, লাগল না। জিম করবেটের গুলি চালানো দেখে বাচ্চাগুলো খুব হাসছে। আর্মি অফিসার বুঝে নিয়েছেন, ওর কোথায় সমস্যা হচ্ছে। লক্ষ্য যেটা একশ মিটার দূরে রয়েছে, সেটাকে বাচ্চা ছেলেটা ভাবছে পঞ্চাশ মিটার দূরে। আর্মি অফিসার জিম করবেট মাটিতে শুয়ে যেখানে রাইফেল শ্যুটিং করছে, সেখানে ওর পাশে শুয়ে পড়লেন আর ওর হাত থেকে বন্দুকটা নিলেন, নিয়ে বন্দুকের eye sightটা ঠিক করে দিলেন, বন্দুকটা আবার ওকে ধরিয়ে দিলেন। এবার বন্দুক চালালো, ধাঁই করে গুলি লক্ষ্যে বিঁধে গেল। এই হলেন

শিক্ষক, এই হল যিনি গাইডেন্স দেন। মানুষের বুদ্ধিভেদ করবে না, বলতে নেই যে, তুমি পারবে না; বদলে তুমি ওর মতই আচরণ কর।

সেইজন্য আমরা যে জিনিসগুলো এখানে পড়ছি, শুনছি; ঠাকুর এভাবেই করবেন। কেন করবেন? এইজন্যই করবেন, হিন্দুদের ধর্ম-আদর্শ হল সন্ন্যাসী, তিনি সব কিছু ত্যাগ করে, সমস্ত রকমের ভোগ-বাসনা ত্যাগ করে পুরোপুরি ঈশ্বরে মন দেবেন। মেয়েদের ক্ষেত্রেও একই জিনিস। তোমাকে একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, বিবাহ দেওয়া হল। কিন্তু বিবাহ টিকল না, বা স্বামী মারা গেল। ঠিক আছে, কি আর করবে; তুমি এখন আধ্যাত্মিক ভাব অবলম্বন করে একটা উচ্চ জীবনের দিকে চলে যাও। ছেলেদের সংখ্যাও তখন কম ছিল সমাজে। এখান এই সমস্যাটা নেই, ছেলেদের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। তাই সবাই দু-বার, তিনবার, চারবার করে বিয়ে করছে। আর সন্ন্যাসীর আদর্শও আজ অনেক নিচে নেমে গেছে। ভারতের যত বড় বড় ধর্মগুরুরা আছেন, সবাই শত কোটি, হাজার কোটি টাকার মালিক। সেখানে ছেলেমেয়েদের কি করে বলবে, তোমার ত্যাগের আদর্শ অবলম্বন কর? সেইজন্য এই জিনিসটাকে বুঝতে হয়।

বিধবাদের জন্য এখানে পরিষ্কার দুটো জিনিসকে নিয়ে আসা হয়েছে –একটা হল, একটা সুযোগ তোমাকে দেওয়া হয়েছিল; ছেলের অভাব তাই দ্বিতীয়বার তোমাকে বিয়ে দিতে পারা যাচ্ছে না। দ্বিতীয়, ভারতের আধ্যাত্মিক সমাজের আদর্শ হল ত্যাগ। যখন তোমার সুযোগ হল না, এবার তুমি ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিকে এগিয়ে যাও। একবার একজন টিটকারি মেরে আমাকে বলল, বাড়িতে খেতে পায় না, তাই সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। আমিও তাকে বললাম, খেতে না পেলে লোকে ভিখারীও তো হয়। ভদ্রলোক কথাটা ঠিকে ধরতে পারল না। বাড়িতে যদি আপনি খেতে না পান, তাতে আপনি যদি সন্ন্যাসী হয়ে যান, ভালই তো হল; আপনি ত্যাগের আদর্শটা নিয়ে নিলেন। যেমন খেতে না পেলে মানুষ ভিখারীও তো হয়। বিধবা নিজের স্বামীকে চিরদিনের মত হারিয়েছে, এখন সে পর পুরুষকে নিয়েও তো থাকতে পারে, থাকতও, থাকত না যে তা না। সমাজ কিন্তু বলছে, মিটে গেছে, এবার তুমি চল উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের দিকে।

এই যে বলছেন, গায়ে তেল মাখছে। লজ্জা কম, বসবার রকমই আলাদা। স্বাভাবিক, শরীরের প্রতি এমন টান, ইন্দ্রিয়ের টান এমন যে, বিধবা হোক, বাল বিধবা হোক তাদেরও কিছু করার নেই। সমাজ বলছেন, আমাদের কাছে ছেলে নেই যে, তোমাকে আর-একটা সুযোগ দেব। অনেকের মধ্যে একটা ভুল ধারণ হয়ে আছে যে, হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহ ছিল না। হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রথা পুরোদমে ছিল। বেদেই আমরা একটা বর্ণনা পাই, যেখানে বলছেন, একজন যোদ্ধা মারা গেছে, তার স্ত্রী কান্নাকাটি করছে। বাড়ির কেউ একজন হবে, দেওর বা কোন আত্মীয় হবে, ছেলেটি সদ্য স্বামী হারা স্ত্রীকে ডেকে বলছে –জীবনে ফিরে এসো; যাকে তুমি ভালবেসেছিলে, যাকে ভালবেসে সব ছেড়ে চলে এসেছিলে, সে এখন শব হয়ে পড়ে আছে; আর ওকে নিয়ে থেকো না, তুমি চলে এসো।

মনুস্মৃতিতেও *পুনর্ভুর* কথা বলা আছে, *পুনর্ভু* শব্দের অর্থ যার দ্বিতীয়বার বিয়ে হয়। এই জিনিসগুলোকে কেউ জানে না, জানতেও চায় না। পরে পরে সমাজে কিছু ক্ষমতাবান লোকেদের জন্য অনেক কিছু হয়ে গিয়েছিল, তাই বলে পুরো হিন্দু ধর্মকে গালাগালি দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। একবার একজন বক্তা খুব করে বলছিলেন, ভারতবর্ষ হল নারী নির্যাতনকারী দেশ, এখানে বিধবাদের পুড়িয়ে দেওয়া হত। আমি ভদ্রলোককে বললাম, একবার আমাদের শাস্ত্রগুলো খুলে দেখুন না। কোথায় দু-চারটে বদমাইশ সম্পত্তি হাতাবার লোভে বিধবাদের অত্যাচার করেছিল, আর তার পুরো দায় আপনি হিন্দু ধর্মের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন? কয়েকটা ঘটনা যে ঘটেছিল ঠিকই বলছেন, কিন্তু তাই বলে সারা দেশ জুড়ে নারীদের নির্যাতন করা হত বলে দিচ্ছেন? পুরো হিন্দু সমাজ কি তাই হয়ে গিয়েছিল? রানী লক্ষ্মীবাঈকে তো বিধবা বলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়নি। রানী অহল্যাবাঈকে তো সতীদাহ

করা হল না। বাংলায় রানী রাসমণীকে তো সারা জীবন রাণীর আসনে বসিয়ে রাখা হল। রাণীরাসমণিই না, বাকি সবাই রাণীই থেকে গেলেন।

আসলে হিন্দুরা তাদের শাস্ত্র জানে না, যেটুকু জানে সব উপর উপর। ইউটিউবে আমাদের কমেন্ট বক্সে যা যা সব কমেন্টস দেখি, দেখে হতাশ লাগে। আমাদের হিন্দি ক্লাশের একটা লেকচারে কমেন্টে একজন লিখলেন, আপ্ কুছ্ নহি জানতে, আপ্ পাখণ্ডী হ্যায়, বন্ধ্ কি জিয়ে বকওয়াস্। কি বলব, রামচরিতমানসের চারটে চোইপাঈ পরে জ্ঞানী হয়ে গেল। বিধবাদের যে বিবাহ হত না, এটা ভুল ধারণা। আর সতীদাহের নামে বিধবাদের পুড়িয়ে দেওয়া হত, এগুলো আমাদের কোথাও ছিল না। বেদেই পুনর্বিবাহের কথা আছে, মনুস্মৃতিতেও পরিষ্কার পুনর্ভূর কথা বলছেন। যাই হোক, এ-সব কথা বলেই ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন –**থাক বিষয়ীদের কথা**।

ঠাকুর বিষয়ীদের কথা পছন্দ করতেন না। ঠাকুরের আগমন মানুষকে পুরোপুরি আধ্যাত্মিক আদর্শের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তার জন্য যদি একটু ভোগ করতে হয় তো করে নিক। শ্রীশ্রীমায়ের জন্য সোনার বালা গড়িয়ে দিলেন; তার জন্য কত খরচ হবে জেনে টাকার জোগাড় করলেন। রাখাল বিয়ে করেছে, স্ত্রীকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন; মাকে ঠাকুর বলে পাঠালেন যেন টাকা দিয়ে বউএর মুখ দেখে। যাই হোক ওখান থেকে সরে এসে ঠাকুর রামলালকে গান গাইতে বললেন। রামলাল একটার পর একটা গান করছেন। গানের মাধ্যমে ভগবানের লীলার বর্ণনা করা হচ্ছে। অক্রূর রথ নিয়ে এসেছে শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে যাবেন বলে। গোপীরা এসে কান্নাকাটি করছেন। গানের মধ্যে খুব সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে।

ধোরো না ধোর না রথচক্র, রথ কি চক্রে চলে,
যে চক্রের চক্রী হরি, যাঁর চক্রে জগৎ চলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) –গোপীদের কি ভালবাসা, কি প্রেম। শ্রীমতি স্বহস্তে শ্রীকৃষ্ণের চিত্র এঁকেছেন, কিন্তু পা আঁকেন নাই; পাছে তিনি মথুরায় চলে যান।

এই বর্ণনা ভাগবতে নেই। পরবর্তি কালে যাঁরা ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁরা এই জিনিসগুলো সংযোজন করেছেন। ভাবটা হল কৃষ্ণ আমার, আমাকে ছেড়ে কৃষ্ণ যেন কোথাও না চলে যান। সেইজন্য কৃষ্ণের ছবি আঁকছেন, কিন্তু কৃষ্ণের পা আর আঁকছেন না, পাছে তিনি মথুরায় চলে যান। আমি যখন প্রথম এটা পড়েছিলাম, সেদিনই আমার খুব মিষ্টি লেগেছিল। এই বর্ণনা আগে আমি কোথাও শুনিনি, বৈষ্ণব পরম্পরায় যাঁরা আছেন তাঁরা হয়ত জেনে থাকবেন। কিন্তু জিনিসটা আমার খুব কিউট লেগেছিল, কি মধুর লাগছে।

আমি এ-সব গান ছেলেবেলায় খুব গাইতাম। এক-এক যাত্রার সমস্ত পালা গেয়ে দিতে পারতাম। ঠাকুরের স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিল কিনা। কেউ কেউ বলত, আমি কালীয়দমন-যাত্রার দলে ছিলাম। এই পর্যন্ত ঠাকুর নিজের সম্বন্ধে কিছু কথা বললেন।

একজন ভক্ত নূতন উড়ানি গায়ে দিয়া আসিয়াছেন। রাখালের বালক স্বভাব, কাঁচি এনে তাঁর চাদরের ছিলা কাটিতে যাইতেছেন। ঠাকুর বলিলেন, 'কেন কাটছিস? থাক না, শালের মত বেশ দেখাচ্ছে। হ্যাঁগা এর কত দাম? এই জিনিসগুলো আমার খুব সুন্দর লাগে। ঠাকুর কেমন ঈশ্বরীয় কথা বলতে বলতে জগতের ছোটখাটো জিনিসের দিকেও নজর দিচ্ছেন। একটা সুন্দর জিনিস দেখে খুব সাধারণ ভাবে জিজ্ঞেস করছেন, হ্যাঁগা, এর কত দাম?

তখন বিলাতী চাদরের দাম কম ছিল। ভক্তটি বলিলেন, এক টাকা ছয় আনা জোড়া। ঠাকুর বলিলেন, 'বল কি গো! জোড়া! এক টাকা ছয় আনা জোড়া।

তখন আমাদের দেশী জিনিসের দাম বেশি হত, কারণ হাতে কারুকার্য করা থাকত। বৃটিশরা এখান থেকে কাঁচামাল নিজেদের দেশে নিয়ে যেত; সেখানে মিলে তৈরী করে নিয়ে এসে ওই জিনিসই আমাদের কাছে বিক্রি করে প্রচুর টাকার মুনাফা করত। এ-সব কারণেই বাল গঙ্গাধর তিলক স্বরাজ্য শুরু করেছিলেন। পরে গান্ধীজী এটাকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেলেন।

ঠাকুর ভক্তকে বলছেন –**যা, গঙ্গা নাওগে**। কাউকে বলছেন –**এঁকে তেল দে রে!**

স্নানান্তে তিনি ফিরিয়া আসিলে, ঠাকুর তাক হইতে একটি আম্র লইয়া তাঁহাকে দিলেন। বলিতেছেন, এই আমিটি একে দিই; তিনটা পাশ করা। মাস্টারমশাই একজন গুণীলোক, গুণীলোককে সবাই সম্মান করে। ভক্তটিকে জিজ্ঞেস করছেন, **আচ্ছা, তোমার ভাই এখন কেমন?**

ভক্ত –হাঁ, তাঁর ঔষধ ঠিক পড়েছে, এখন খাটলে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ –তার একটি কর্মের যোগাড় করে দিতে পার? বেশ তো তুমি মুরুব্বি হবে।

ভক্ত –ভাল হলে সব সুবিধা হয়ে যাবে। এরপর শুরু হয় নবম পরিচ্ছেদ। এতক্ষণ ঠাকুর নিজের সম্বন্ধে বলছিলেন, এখান থেকে ঠাকুর আবার পুরো আধ্যাত্মিক ভাবে চলে যাচ্ছেন।

নবম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিরামপুর ভক্তসঙ্গে

আমরা এখনও ১০ই জুন তারিখে আছি। ঠাকুরের দুপুরের আহার হয়ে গেছে, কিন্তু বিশ্রাম করার অবসর পাননি। অনেক ভক্তের সমাগম হয়েছে। বলছেন, **প্রথমে মণিরামপুর হইতে একদল ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন পি.ডব্লিউ.ডি-তে কাজ করিতেন, এখন পেনশন পান**। কি আশ্চর্য তখনও পি.ডব্লিউ.ডি ছিল। মণিরামপুর ব্যারাকপুর অঞ্চলের একটি জায়গার নাম। পেনশান পান মানে তাঁর বয়স হয়েছে। **ক্রমে বেলঘরে হইতে একদল ভক্ত আসিলেন। শ্রীযুক্ত মণি মল্লিক প্রভৃতি ভক্তেরাও ক্রমে আসিয়াছেন**।

মণিরামপুরের ভক্তগণ বলিতেছেন, আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'না, না, ও-সব রজোগুণের কথা –উনি এখন ঘুমুবেন'।

অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, আমরা জানি ঘুম তমোগুণের লক্ষণ, তাহলে ঠাকুর রজোগুণ কেন বলছেন? ঠাকুর এটা দুপুরের বিশ্রামের কথা বলছেন। দুপুরে যে বিশ্রাম নেওয়া হয়, এই বিশ্রাম রজোগুণীরাই নিয়ে থাকে। রজোগুণী মানে যারা প্রচুর কাজকর্মে লিপ্ত। তাছাড়া কোন ঘুমটা সত্ত্বগুণ, কোন ঘুমটা রজোগুণ, কোন ঘুম তমোগুণের ঘুম, বলা খুব মুশকিল। কারণ আমরা অন্যান্য জায়গায় এর কোন উল্লেখ পাই না। যোগনিদ্রার কথা আমরা জানি; ভগবান যখন শয়নে থাকেন, তখন তিনি যোগনিদ্রায় থাকেন। আবার যোগীদের ক্ষেত্রে কি হয়, ধ্যান করতে করতে নিদ্রার একটা অবস্থা আসে; ওই নিদ্রার মধ্যে অনেক দর্শনাদিও হয়। এই নিদ্রা দুটো কারণেই হতে পারে, একটা তমোগুণের জন্য হতে পারে। যাঁরা খুব ভোরে উঠে জপধ্যান করেন, দেখবেন জপ করতে করতে অনেক সময় ঘুম পেয়ে যায়। এই ঘুম পাওয়াটা স্বাভাবিক, দোষের কিছু না। কিন্তু যোগীরা, যাঁরা সত্যিকারের যোগ সাধনা করেন তাঁরা অনেক সময় গভীর ধ্যানে চলে গেলে সেখানে একটা তন্দ্রার মত ভাব আসে, এটাকেও যোগনিদ্রা বলেন আর এই যোগনিদ্রাতে অনেক দর্শনাদিও হয়। ঠাকুর বলছেন, এ-সব রজোগুণের কথা। ঠাকুরের কি ঘুম ছিল না? থাকতেই হবে। অবতার হন আর যাই হন, একবার শরীর ধারণ করলে তমোগুণ, রজোগুণ, সত্ত্বগুণ সবটাই কম-বেশি থাকবে। দেখতে হয় কোন গুণের আধিক্য বেশি।

চানক মণিরামপুর –এই কথা শুনিয়া ঠাকুরের বাল্যসখা শ্রীরামের উদ্দীপন হইয়াছে। ঠাকুর বলিতেছেন, "শ্রীরামের দোকান তোমাদের ওখানে। ও-দেশে শ্রীরাম আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়ত। সেদিন এখানে এসেছিল"।

অনেক সময় লোকেরা মনে করে, যাঁরা সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন, যাঁরা সাধন-ভজন, জপ-ধ্যান নিয়ে আছেন, তাঁরা যেন তাঁদের জীবনের অতীতগুলো ভুলে যান। তা কেন হবে? কোন কিছুই ভুলে যান না। ঠাকুর যিনি অবতার, আর এত রকম সমাধি আর এত রকমের আধ্যাত্মিক অনুভূতির মাঝখান দিয়ে গেছেন, তারপরেও তিনি সবাইকে মনে রেখেছেন। আমি কাউকে আমার পুরনো কোন কথা বললে বলবে, 'সে কি আপনার এখনো সব কথা মনে আছে'? আমিও বলি, 'আপনার যদি মনে থাকতে পারে, আমার কেন মনে থাকবে না? আমার স্মৃতিবিভ্রম হয়েছে নাকি'? আধ্যত্মিক ভাবের মধ্যে ডুবে গেলে পুরনো দিনের স্মৃতি মুছে যায় না, সব স্মৃতিই থাকে। কিন্তু স্মৃতিগুলির সাথে এতদিন যে একটা ইমোশানের ভাব থাকত, সেই ইমোশানটা কেটে যায়। অনেক সময় দেখবেন, আপনার পুরনো পরিচিত যাঁরা আছেন, তাঁরা হয়ত আপনাকে ভুলতে পারছেন না। অনেক সময় বলতে শোনা যায় –পুরনো প্রেম ভুলতে পারে না। অনেক আছেন যাঁরা ওখানেই থেকে গেছেন, আপনি এগিয়ে গেছেন, কিন্তু কুড়ি পচিশ বছর আগে তিনি যে চিন্তা-ভাবনার জগতে ছিলেন, সেখনেই থেকে গেছেন। দেখা হয়ে গেলে হয়ত তিনি এটাই বলবেন –কি ব্যাপার তুমি তো ভুলেই গেলে দেখছি। ভুলে যাওয়ারই তো কথা। যে যতটা পারবে পুরনো চিন্তার জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে, সব ভুলে এগিয়ে যেতে হবে। যখন বলছেন, তুমি তো ভুলেই গেলে দেখছি, এই কথার মূল বক্তব্য হল, আমাদের যে সম্পর্কটা ছিল, তুমি আমাদের সেই সম্পর্কের কথা ভুলে গেলে কি করে? ভুলে কি করে যাবে, ওই স্মৃতি তো থেকে গেছে।

এই জায়গাটাও খুব মিষ্টি লাগে, ঠাকুরের বাল্যসখা, ঠাকুর তাঁকে মনে রেখেছেন। এবার এখান থেকে আলোচনা শুরু হচ্ছে।

মণিরামপুরের ভক্তেরা বলিতেছে, কি উপায়ে ভগবানকে পাওয়া যায়, একটু আমাদের দয়া করে বলুন।

কথামৃতে ১৮৮৩ সালের বর্ণনা চলছে। ইতিমধ্যে কেশব সেন ঠাকুরের ব্যাপারে লিখতে শুরু করে দিয়েছেন, খবর কাগজেও এক-আধটা লেখা বেরোচ্ছে। এইভাবে চারিদিকে ঠাকুরের নাম ছড়িয়ে গেছে। ঠাকুর বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, মাইকেল মধুসূদনও দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। অনেকেই শুনেছেন যে, দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে একজন অদ্ভুত লোক আছেন। এখানে যেটা আমার খুব সুন্দর লাগে, আপনাদেরও নিশ্চয় চোখে পড়েছে। মণিরামপুর তখন পাড়াগাঁ ছিল, দক্ষিণেশ্বরই পাড়াগাঁ ছিল। সেই পাড়াগাঁ থেকে এনারা এসেছেন। দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দির। যে কোন মন্দিরে একজন পূজারী থাকেন। আজ পর্যন্ত আপনারা কোন মন্দিরে গিয়ে কোন পূজারীকে কি জিজ্ঞেস করেছেন, কি উপায়ে ভগবানকে পাওয়া যায়? কখনই না। এনারা এই যে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন, এত সুন্দর এই লাইনটা। আমরা যখন কোন দোকানে যাই, আগেকার দিনে ছিল, এটা মুদি দোকান, এটা কাপড়ের দোকান, এটা স্টেশনারি দোকান, এটা মিষ্টির দোকান। মুদি দোকানে গিয়ে কেউ মিষ্টির কথা, মিষ্টির দোকানে গিয়ে মুদি দোকানের জিনিসের কথা কেউ জিজ্ঞাসা করত না। এই যে মণিরামপুরের ভক্তরা, বা আরও যাঁরা যাঁরা ওখানে দক্ষিণেশ্বরে আসতেন; তাঁদের মধ্যে এই কথাটা ছড়িয়ে গেছে –শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কন।

আমাদের কাছে এসে মানুষ কি জিজ্ঞেস করে? আপনারা সমাজে আছেন, সমাজে আত্মীয়-স্বজনরা আছেন, পাড়া-প্রতিবেশীরা আছেন, বন্ধু-বান্ধবরা আছেন। রাস্তাঘাটে দেখা হলে প্রথমে হয়ত জিজ্ঞেস করবেন, কেমন আছেন? সেটা না হয় একটা হয়ে গেল। কিন্তু তারপরে বেশির ভাগ লোক কি

জিজ্ঞেস করে? একটা খুব জরুরী কথা মনে রাখা দরকার। মাঝে মাঝে লোকে জিজ্ঞেস করে, ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করলেন? কিংবা জিজ্ঞেস করবে, জগতে এত দুঃখ কেন? মূল বক্তব্য হল, আমাদের মনে জগতের প্রতি একটা প্রশ্ন চিহ্ন রয়েছে –এটা কেন, ওটা কেন, আমার সঙ্গে কেন এ-রকম হল? কিন্তু আসল কি জানেন? সত্য কি জানেন? সত্যটা পুরো বিপরীত।

আমরা যারা এই জগতে আসি, আমরা একটা প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে আসি। আমি, আপনি, ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী সবাই একটা প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে আসি। ইনি কে? উনি কে? উনি বড় হয়ে কি করবেন? মা-বাবার মনে সন্তানকে নিয়ে অনেক আশা-আকাঙ্খা থাকে, সবারই মনে অনেক আশা-আকাঙ্খা থাকে। আমরা অনেক সময় আশা-আকাঙ্খার পূরণ করতে পারি, অনেক সময় পারিনা। কিন্তু মূল জিনিসটা কখন পাল্টাবে না। বাচ্চারা নূতন কোন ফল দেখল বা কোন নূতন সবজী দেখলে জিজ্ঞেস করবে, মা এটা কি, মা ওটা কি। ঠিক তেমনি আমাদের ব্যাপারে লোকেরা জিজ্ঞেস করে, ইনি কে? দ্বিতীয়, এনার দাম কি? এই দুটি জিনিস, আপনি কে আর আপনার মূল্য কি? উত্তরটা আপনাকেই দিতে হবে। এমন কর্ম আপনাকে করতে হবে যে, তাতেই লোকেরা উত্তর পেয়ে যাবে। পাবলিসিটি দিয়ে এটা হবে না। ঠাকুর কখন পাবলিসিটির দিকেই যাননি। এটা যে কোন আত্মশ্লাঘা, একেবারেই তা না। সিনেমা তৈরী হয়ে গেল, তারপর কত রকমের বিজ্ঞাপন, কত রকমের খবর দিয়ে সিনেমার প্রচার। রিলিজ করার পর এক সপ্তাহ না যেতেই ফ্লপ করে গেল। বিজ্ঞাপন, পাবলিসিটি দিয় হয় না, ভিতরে জিনিস থাকতে হয়। হয়ে হয়ে একটা জায়গায় পৌঁছে আপনি এমন হয়ে যাবেন যে, আপনাকে লোকে আর প্রশ্ন চিহ্ন রূপে দেখবে না, সমাধান রূপে দেখবে।

আপনাকেই দেখতে হবে সমাজের কাছে, বিশ্বের কাছে আপনি কি প্রশ্ন না সমাধান? সমাধান, শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধান। ঠাকুরকে এসে জিজ্ঞেস করছে, উপায় কি? একবার ক্লাশে আমি বলেছিলাম, বাইরের সাধুদের সাথে আমি খুব বেশি মিশিনি। ১৯৯৭ সালে একবার অমরনাথ যাত্রায় গিয়েছিলাম। আমাকে একজন বললেন, জম্মুতে একজন সুফি আছেন, উনি অনেক সাধনা করেছেন, আপনি গিয়ে দেখা করতে পারেন। আমরা কয়েকজন সন্ন্যাসী মিলে গেলাম দেখা করতে। দেখলাম উনি একটা মাজারে থাকেন। মনে ইচ্ছা হল, ওনার সঙ্গে একটু কথা বলি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভক্তি কিসে হয়? উনি বললেন, জমিদারি যেভাবে অর্জন করা হয়, ভক্তি সেই ভাবে খেটে অর্জন করা হয়। এই ঘটনা আমি অনেক ক্লাশে বলেছি, কারণ কথাটা আমার মনকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। এই সুফি একজন সমাধান হয়ে গেছেন, ঠিক সেই রকম ঠাকুর একজন সমাধান। ঠাকুরকে লোকে এসে জিজ্ঞেস করছে, কি উপায়ে ভগবানকে পাওয়া যায়? কথাটা এত সুন্দর, ঠাকুর আর প্রশ্ন চিহ্ন নন, ঠাকুর এখন সমাধান। যে আসছে সে বুঝতে পারছে, এনার সঙ্গে যদি কথা বলতে হয়, তাহলে ঈশ্বরকে নিয়ে কথা বলতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ –একটু সাধন-ভজন করতে হয়।

দুধে মাখন আছে শুধু বললেই হয় না, দুধকে দই পেতে, মন্থন করে মাখন তুলতে হয়। এই কথা ঠাকুর অনেকবার বলেছেন। এই ধরণের পুরুষ যাঁরা, তিনি যীশুই হন, ভগবান বুদ্ধই হন, শ্রীরাম হন, শ্রীকৃষ্ণই হন, এনারা সবাই হলেন মাখন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই কথামৃত পড়েছেন, গীতা অনুধ্যান করেছেন, জপধ্যান করেন; কিন্তু দেখবেন কোথাও এই ভাব থেকে যায়, জপধ্যান করলেন, শাস্ত্র অনুধ্যান করলেন, জ্ঞান লাভ করলেন, এরপর মনে হবে আমি যেন জগৎ থেকে আলাদা হয়ে গেলাম। না, তা কখন হয় না; শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, যীশু এনারা সবাই এই জগতেই থাকেন। দুধের সার মাখন, মাখন দুধেই থাকে, দুধ থেকে মাখন হয়ে যাওয়ার পরেও মাখন জলেই আছে, কিন্তু আলাদা। তিনি জানেন তিনি আলাদা, তাঁর আশেপাশে যাঁরা আছেন, তাঁরাও বুঝে যান ইনি আলাদা। দূর থেকে যাঁরা দেখেন তাঁরা বুঝতে পারেন না।

ঠাকুর তারপরেই বলছেন – **তবে মাঝে মাঝে নির্জন চাই। দিন কতক নির্জনে থেকে ভক্তিলাভ করে, তারপর যেখানে থাক। জুতা পায় দিয়ে কাঁটাবনেও অনায়াসে যাওয়া যায়**।

কথামৃতে নির্জন বাসের কথা কতবার ঠাকুর বলেছেন। কত দিনের জন্য নির্জন বাস করতে হবে? যত দিন ভক্তিলাভ না করছেন। ঠাকুর কোথাও একদিন বলছেন, কোথাও তিনদিন বলছেন; মন্দের ভাল, তবে একদিন/দু-দিন দিয়ে হয় না। ব্রহ্মচারীরা মঠে জয়েন করার পর সাদা বস্ত্রে নয় বছর থাকেন। আপনাদের সমস্যাটা কোথায় জানেন? এক ঘন্টা, দু ঘন্টা সকাল বিকাল জপধ্যান করছেন, মনে করছেন আপনি এগোচ্ছেন, কিন্তু আপনি এগোচ্ছেন না। আমাদের এক মহারাজ বলতেন, মৃত্যুর সময় যখন আসে বা বৃদ্ধাবস্থা যখন হয় তখন বোঝা যায়, সারাটা জীবন নোঙর ফেলে, নাকি নোঙর তুলে নৌকাটা চালিয়েছে। কম বয়সে এই কথাগুলো শুনতে খুব ভাল লাগত, আহা কি সুন্দর কথা; কিন্তু পরে বুদ্ধি একটু পরিপক্ক হলে বুঝতে পারলাম কত মূল্যবান এই কথা।

ফিজিক্সে ফ্রিকশান্ নিয়ে বলা হয়। একটা কোন জিনিসকে যদি ঠেলা হয়, জিনিসটা নড়তে চায় না। বাড়িতে ভারি কিছু জিনিস, ভারি বাক্সকে ঠেললে নড়তে চায় না। একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ঠেলা দিলে নড়বে না। কিন্তু আপনি শক্তি প্রয়োগ করে যাচ্ছেন, ঠেলতে ঠেলতে হঠাৎ গাড়িটা চলতে শুরু করে দিল। এরপর দেখবেন আপনাকে আর অত শক্তি প্রয়োগ করতে হচ্ছে না। যে মুহূর্তে ওই স্থবিরতা থেকে যে গতি এলো, এটাকে বলা হয় লিমিটিং ফ্রিকশান্। এই যে ফ্রিকশান্ যেটা আটকাচ্ছে, ম্যাক্সিমাম তখন। আপনার আধ্যাত্মিক জীবন যখন চলতে শুরু হবে, তার ঠিক আগে বিপরীত যে শক্তি যেটা ম্যাক্সিমাম থাকে, একবার যখন চলতে শুরু হয়ে গেল, তখন আর তত কষ্ট হয় না। ঠাকুর এই জিনিটাকে বোঝানর জন্য মাঝির উদাহরণ দিয়েছেন। কিভাবে অনেক আঁকে বাঁকে হাল ধরে চলতে চলতে যখন অনুকূল স্রোত পেয়ে গেল তখন শুধু হালটা ধরে থাকে, মাঝি তখন বলে তামাক সাজ। আমার জীবনে, আপনার জীবনে, সবার জীবনে এই লিমিটিং ফ্রিকশানটা সবচেয়ে বিপজ্জনক। আমরা এটা জানিও না, জিনিসটাকে ঠেলে যাচ্ছি, সারা রাত ধরে নৌকা চালিয়ে যাচ্ছি, সকালে উঠে দেখছে আরে নোঙরটাই তো তোলা হয়নি। এই নোঙর তোলার ব্যাপারটা নির্জনে গিয়ে করতে হয়। নির্জনে করলে হয়? আপনি করে দেখুন। কত দিন নির্জনে করতে হবে? যত দিন আপনার বিশ্বাসটা না আসছে। এই কথা ঠাকুর এবার বলছেন।

প্রধান কথা বিশ্বাস। 'যেমন ভাব তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়'। বিশ্বাস হয়ে গেলে আর ভয় নাই।

এই দুটো কথা খুব জরুরী। ঠাকুর প্রথমে নির্জন বাস নিয়ে বললেন, দ্বিতীয় বলছেন বিশ্বাস। এই দুটো ছাড়া আরও কিছু বলবেন। আমাদের জীবনের মূল সমস্যা হল, ধর্মে আমাদের বিশাস নেই; বিশ্বাস করুন সত্যিই আমাদের বিশ্বাস নেই। স্বামীজীকে ঠাকুর বলেছিলেন, একজন চোর যদি জানে পাশের ঘরে সোনা রাখা আছে, তার কি আর রাতে ঘুম হবে। আপনি রাত্রিবেলা ঘরে শুতে গেছেন। এখনও মশারি খাটাননি, জানতে পারলেন ঘরে একটা সাপ ঢুকেছে, আপনি কি আর ঘুমোতে পারবেন? আপনার যদি বিশ্বাস হয়ে যায় ঠাকুর আছেন, আপনার জীবন কি আর এ-রকম চলবে? আচ্ছা না হয় জীবনের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, এই বিশ্বাস আসার পর আপনার সাধন-ভজন কি এ-রকম ঢিমে-তেতালা চলবে? প্রশ্নই উঠছে না।

প্রথম জিনিসটা হল, বিশ্বাস করা –ঈশ্বর আছেন। যে রূপেই থাকুন –ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বর আছেন –সকালে, বিকালে, রাত্রে চব্বিশ ঘন্টা নিজেকে মনে করিয়ে দেওয়া। বাড়ির চার দেওয়ালে এই কারণে দেবী-দেবতা, মহাপুরুষদের ছবি লাগানো হয়। নিজেকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই দিনে দু-বার করে ধুপধুনো দেওয়া, সকালে পূজা করা, ফুল দেওয়া। এগুলো করলে কি হয়, এতে মনের মধ্যে একটা শুভ সংস্কার তৈরী হয়। হিন্দুদের কেউ মারা গেলে বাড়িতে অনেকদিন ধরে শ্রাদ্ধকর্ম চলতে

থাকে। তাই না আবার এক বছর পর বাৎসরিক করতে হয়, তখন আবার পিণ্ডদানাদি কর্ম করতে হয়। এই কাজগুলো আমাদের সর্বক্ষণ মনে করিয়ে দিচ্ছে, ইনি লোকান্তরিত হয়ে গেছেন, আমাদের মধ্যে ইনি আর নেই। এখানেও মনের উপর একটা ছাপ তৈরী করে দিচ্ছে, যিনি চলে গেছেন তিনি তো চলে গেছেন, এভাবে আমাদের সবাইকেই একদিন চলে যেতে হবে, এই বোধটাকে জাগিয়ে রাখা।

এখনকার দিনে বিবাহ ফিল্মি বিবাহ হয়ে গেছে, ফিল্মি বিয়ের কথা বলা হচ্ছে না। আগেকার দিনে যে বিবাহ হত সেই সময় কত রকমের উপাচার পালন করা হত। উপাচারের মাধ্যমে নববধূকে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তুমি আর কন্যা নও, তুমি এখন একজন বিবাহিতা নারী। সাধন-ভজন নিয়মিত করে করে একবার যখন পথটা ধরে নিলেন, এরপর আপনার পথ ভুল থাকুক, তাতে কিছু আসে যায় না। অনেকে এসে আমাদের বলেন, অনেকে মেইল করেন, আমি সত্য সত্য ঈশ্বরের পথে যেতে চাই, একজন যদি কোন enlightened soulএর নাম বলেন। আমি বেশির ভাগ সময় বলেই দিই, আমি enlightened soul, তোমার কেন মনে হচ্ছে যে আমি enlightened নই? কারণ মুর্খদের মুর্খদের মতই উত্তর দিতে হয়। যারা বোমা মারে তাদের বোমাই মারতে হবে, যারা ছুরি চালাতে আসে তাদের ছুরিই চালাতে হয়।

কর্ণ শেষ সময় অর্জুনকে জিজ্ঞেস করছেন, 'অর্জুন! তুমি যা করলে এটা কি ধর্ম'? কৃষ্ণ তখন বলছেন, 'কৌরবরা যে এতদিন এত কুকর্ম করল তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল'? যে যে-রকম তাকে সেই রকমই পূজা দিতে হয়। মুর্খদেরও মুর্খদের মতই উত্তর দিতে হয়। তুমি প্রমাণ কর আমি enlightened নই। প্রবুদ্ধ ব্যক্তি আকাশ পথে উড়ে চলে যাচ্ছেন, তা তো নয়। অল্প বয়সে আমরা শুনতাম, সিদ্ধযোগীরা যখন জপধ্যান করেন তাঁদের আসন নাকি মাটি থেকে ছয় ইঞ্চি উপরে উঠে যায়। আমি ফিস্‌ফিস্ করে একজন মহারাজকে জিজ্ঞেসেও করে ফেলেছিলাম, মহারাজ, জপে বসে আপনার আসন কি মাটি থেকে উপরে উঠে যায়? কারণ আমার এই ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কি সিদ্ধ, কি প্রবুদ্ধ, এগুলো না খোঁজ করে আগে কোথাও শুরু কর। যদি তোমার গুরু অপদার্থ হয়, ফ্রড হয়, কিন্তু তোমার যদি বিশ্বাস থাকে ঈশ্বর আছেন, তিনি ঠিক তোমাকে ঠিক পথে নিয়ে যাবেন।

অনেক আগেকার কথা, আমি একবার আমার এক সন্ন্যাসীভাইকে বললাম, 'এই যে পরিবেশ দেখছেন, গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইত্যাদি যা হচ্ছে, মনে হচ্ছে সৃষ্টিটাই শেষ হয়ে যাবে'। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বললেন, 'দেখুন, ঈশ্বর আছেন আপনি মানছেন তো? যদি মানেন, তাহলে এই সৃষ্টিটা ঈশ্বরেরই, আর ঈশ্বর কখনই সৃষ্টির নাশ হতে দেবেন না। প্রজাতি পাল্টে যেতে পারে'। এটা শোনার পর চিরদিনের জন্য আমার মনটা পাল্টে গেল, আর পরিবেশ সংক্রান্ত কোন কিছুর দিকে ফিরেও তাকাইনি। যদি গ্লোবাল ওয়ার্মিংএর কথা বলেন, এতে আপনি মরবেন। আপনি নিজে মরার ব্যবস্থা করছেন, সুইসাইড করতে যাচ্ছেন, কে আপনাকে আটকাবে। সৃষ্টি কখন নাশ হবে না, আপনার জায়গায় অন্য প্রজাতি আসবে, আবার সৃষ্টি এগোবে। এটা ভগবানের সৃষ্টি এটাকে কেউ নাশ করতে পারে না। ভগবান কি করেন, কি করেন না; এগুলো আমরা ভাল জানিনা, ভগবানের মনের কথা আমাদের জানার কোন উপায় নেই। কিন্তু মূল কথা, যদি আপনার বিশ্বাস থাকে ভগবান আছেন, ভগবানের যে গুণগুলো, এই যে সৎ, চিৎ ও আনন্দ, যার কথা আমরা বারবার আলোচনা করি; এই গুণগুলো কক্ষণ চলে যাবে না। সৃষ্টি হল ওনার সৎরূপ, যার কক্ষণ নাশ হবে না। তিনি যখন চাইবেন, তাঁর যখন ইচ্ছা হবে, তখন তিনি সৃষ্টিটাকে একটু গুছিয়ে নেবেন, এটাকে তো সৃষ্টির নাশ হয়ে যাওয়া বলা যায় না, সৃষ্টি যেমন চলছে, অনাদিকাল ধরে এভাবেই চলতে থাকে, নাশ কক্ষণ হবে না। সেইজন্য, যদি আপনার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে ঈশ্বর আছেন, ঠাকুর আছেন, তাহলে কোন একটা জিনিসকে ধরে চলতে হয়। এটার জন্যই ঠাকুর বলছেন নির্জন বাস।

নির্জনবাসের কথা আমরা আমাদের প্রাচীন মহারাজদের কাছে অনেক শুনেছি। ওনারা বলতেন, হরিদ্বার, হৃষিকেশ, উত্তরকাশী, উত্তরাখণ্ডের কোন এক তীর্থস্থানে গিয়ে যদি ছয় মাস থাকা হয়, তিন মাসও যদি থাকে, আর খুব জপধ্যান যদি করে, তাহলে এই বিশ্বাসটুকু এসে যাবে যে, ঠাকুর আছেন। এই বিশ্বাস তো এসে গেল, এরপর কি হবে? এরপরে এটাই হবে –হে ঠাকুর, আমি তোমার মুরগী, তুমি সামনে দিয়েই কাট আর পিছন দিয়েই কাট। দুঃখ হলে চোখ দিয়ে জল অবশ্যই হয়ত বেরোবে, কিন্তু ঠাকুর আমার ঠাকুরই থাকবেন, আমাকে ছেড়ে ঠাকুর কোথাও যাবেন না। কিন্তু এই বিশ্বাস যদি না হয়ে থাকে, তখন দুঃখ হলে বলবে, ঠাকুর তো আমাকে বাঁচালেন না, দেখি এর থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তখন এই বাবাজী, সেই বাবাজীর কাছে যাবেন, মন চঞ্চল হয়ে যাবে।

আমাদের কাছে অনেকে জানতে চান চণ্ডীপাঠ কিভাবে করব, গীতাপাঠ কিভাবে করব? আরে যেভাবে পারেন আগে শুরু তো করুন। একজন মেইল করে জানতে চাইলেন, ননভেজ খেয়ে আমি কি গীতা পাঠ করতে পারি? আমি লিখলাম, যারা গীতাপাঠ করতে চায় না, তারা গীতাপাঠ না করার জন্য দশখানা বাহানা বার করে নেয়। আচ্ছা মহারাজ, মেয়েদের কি বেদ পড়তে আছে? ইউটিউবে আমাদের সব লেকচার আপলোড করা আছে। ওখানে কি লেখা আছে –for men only? মহারাজ মেয়েরা কি গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে পারে? গায়ত্রীর ব্যাখ্যা ইউটিউবে রাখা আছে। আচ্ছা মহারাজ খাওয়া-দাওয়া করে চণ্ডীপাঠ করতে পারব? আরে করুন তো, কে আপনাকে বারণ করেছে? আপনি তো ভক্তিতে চণ্ডীপাঠ করছেন। যারা রিচুয়াল, যারা পূজারী এই বিধি-নিষেধ তাদের জন্য। আপনার জন্য নয় এগুলো। আপনি যখন খুশি, যেখানে খুশি, ট্রেনে বসে, বাসে বসে যেতে যেতে পড়ুন।

আমাদের অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ, উনি আমাদের অনেক শাস্ত্রের অনুবাদ করেছেন। অধ্যক্ষ থাকাকালীন ট্রেনে উনি কোথাও যাচ্ছিলেন, সঙ্গে দুজন সেবক ছিলেন। সেবকই আমাকে ঘটনাটা বলেছিলেন। ভোর হয়েছে। উনি সেবককে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁরে, ভোর তো হয়েছে, শাস্ত্র পাঠ কি করলি'? সেবক হেসে বললেন, 'মহারাজ আমরা তো এখন রাস্তায়'। মহারাজ খুব অবাক হয়ে বলছেন, 'রাস্তায় আছিস বলে শাস্ত্র পাঠ করবি না'? রাস্তায় ট্রেনে বাসে যেতে যেতে যদি আপনি কথামৃত পড়তে পারেন, তাহলে চণ্ডী কেন পড়তে পারবেন না? কয়েকটা মূল ব্যাপার থাকে, এঁটো হাতে বা এঁটো মুখে শাস্ত্রপাঠ করিনা, চটি পড়ে করি না। কয়েকটা মূল জিনিস মানতে হয়, তা নাহলে ব্যাপারটা খেলো হয়ে যায়। যদি বিশ্বাস থাকে যে মা দুর্গা আমার মা, চণ্ডীপাঠে আমি আমার মাকে মনে করছি, এতে সমস্যা কিসের? যখন খুশি, যেখানে খুশি আপনি শাস্ত্রপাঠ করুন। যার জন্য দেখবেন, বিশ্বাস যখন হয়ে যায়, তখন আর নাড়ানো যায় না।

জাতক-কাহিনীর একটা কাহিনী আছে, ভগবান বুদ্ধ একবার একজন শেঠজীর পরিবারে জন্মেছিলেন। তখনও ওনার জ্ঞান হয়নি। সেই শেঠের প্রচুর পয়সা, কিন্তু ধর্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাস, ধর্মে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত। উনি আর ওনার স্ত্রী দুজনই ধর্মপ্রাণ। ওনার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য দেবতারা ইন্দ্রকে এক ব্রাহ্মণ ভিখারী সাজিয়ে শেঠজীর বাড়িতে ভিক্ষা নেওয়ার জন্য পাঠালেন। শেঠজী সঙ্গে সঙ্গে থালাতে খাবার সাজিয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণের কাছে আসছেন। আসার পথে ইন্দ্র দেবতা একটা আগুনের গর্ত দাঁড় করিয়ে দিলেন। শেঠজীকে বলছেন, ওখানেই থেমে যাও। এরপরেও যদি তুমি এক পা এগোও তাহলে তুমি এই নরকের আগুনে গিয়ে পড়বে। সে শেঠ খুব সুন্দর উত্তর দিচ্ছেন –নরকের আগুনই হোক, আর যেখানকার আগুনই হোক, আমি আমাদের ধর্ম কোন মতেই ছাড়তে পারব না। কারণ, দানধর্মে, সেবাধর্মে আমি প্রতিষ্ঠিত। নরকের আগুনের ভয়ে আমি আমার ধর্মকে কখনই ছাড়ব না।

এই যে বিশ্বাস, আমার সুখ হোক, আমার দুঃখ হোক, যাই হোক আমি তোমাকে ছাড়ব না ঠাকুর। আজকে পুরো হিন্দু জাতির সমস্যা হল এই বিশ্বাসের অভাব, যার জন্য হিন্দু জাতির এই দুরবস্থা। কোন কিছুতে বিশ্বাসটাই নেই। স্বামীজীকে কেউ দেশভক্ত দেখছে, স্বামীজীকে কেউ ফিলজফার

দেখছে, স্বামীজীকে কেউ বিপ্লবী দেখছে, স্বামীজীকে সব কিছু দেখছে, কিন্তু হিন্দু ধর্মের পুনর্জীবনদাতা, যেটা উনি আসলে ছিলেন, সেটা কেউ দেখছে না, কি দুর্ভাগ্য। আবার অনেক সময় স্বামীজীর কথা বলা যেন স্ট্যাটাস সিম্বল হয়ে যায়। কিন্তু রাম, কৃষ্ণ, কালী, শিব এনাদের মানলে কেমন যেন গেঁয়ো গেঁয়ো মনে হয়। আপনি হিন্দু পরিবারে জন্ম নিয়েছেন, অথচ আপনার পরিবার, আপনার ধর্মের যে আদর্শ সেটাতে বিশ্বাস নেই। এটা যে শুধু হিন্দুদের জন্য তা না, যে মুসলমান, যে খ্রীশ্চান, তার নিজের যে ধর্ম, সেই ধর্মের আদর্শকে নিয়ে বিশ্বাস নেই। কাল যদি কোন ম্যাচিউর মন নিয়ে আপনি বিচার করে অন্য পথ নেন, নিন না, কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু সেটাতে বিশ্বাস থাকতে হবে। এতদিন আমি সঙ্ঘে আছি, সাধুদের দেখেছি, ভক্তদের দেখেছি, সব দেখে বুঝতে পারছি, আমাদের মূল সমস্যা হল আমাদের ধর্মে বিশ্বাসের অভাব। বিশ্বাস না থাকলে খুব সমস্যা হয়। আর যতক্ষণ আপনি নির্জন বাস না করে থাকেন, একটা যে দৃঢ় বিশ্বাস হবে, ওটা হয় না। আপনি যতই করুন, উদাহরণটা মনে রাখবেন, একটা ট্রাককে আপনি ঠেলে যাচ্ছেন তো যাচ্ছেনই, ওর চলার কথা কিন্তু চলছে না। আপনি মনে করছেন চলছে, আসলে চলছে না। নির্জনে গিয়ে কিছু দিন সাধন-ভজন করলে বিশ্বাসটা আসে।

মণিরামপুর ভক্ত –আজ্ঞা, গুরু কি প্রয়োজন?

শ্রীরামকৃষ্ণ –অনেকের প্রয়োজন আছে। তবে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। গুরুবাক্য বলতে, মূলমন্ত্র যেটা বলা হয়েছে, সেই মন্ত্রের যে সত্য, যে ভাব, সেটাতে বিশ্বাস। আপনারা যাঁরা শুনছেন, অনেকেই আপনারা দীক্ষিত, অনেক ইয়ং ছেলেমেয়ে যাঁরা শুনছেন, তাঁদের হয়ত দীক্ষা হয়নি, তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ কথামৃতে যা কিছু শুনছেন, এটাই গুরুবাক্য। আমাদের শাস্ত্রগুলো, বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ সবই গুরুবাক্য। কারণ সচ্চিদানন্দই গুরু, সচ্চিদানন্দের কথাই এই শাস্ত্রগুলোতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শাস্ত্রের প্রত্যেকটি কথাকে তাই বিশ্বাস করতে হয়। কোন নাস্তিক, সে হিন্দু ধর্মের হোক, অন্য ধর্মের হোক, এগুলোকে নিয়ে যদি নিন্দা করে, তাতে আপনার কিছু আসে যায় না; আপনার বিশ্বাস দেখে আরও দশজনের যাতে বিশ্বাস জাগে।

গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞান করলে তবে হয়। গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞান, আর যিনি ঈশ্বর তিনি গুরু। আমাদের বেদ, পুরাণ, উপনিষদ যা আছে, রামায়ণ, মহাভারত সবাই বিভিন্ন ভাবে ঈশ্বরের বর্ণনা করছেন। কারণ ঈশ্বর বই আর কিছু নেই। **তাই বৈষ্ণবরা বলে, গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব**। ভক্ত যা, গুরুও তাই, কৃষ্ণও তাই।

তাঁর নাম সর্বদাই করতে হয়। কলিতে নাম-মাহাত্ম্য। অন্নগত প্রাণ, তাই যোগ হয় না। তাঁর নাম করে, হাততালি দিলে পাপপাখি পালিয়ে যায়।

এই কথাগুলো ঠাকুর অনেকবার বলেছেন, পরেও আবার বলবেন। আপনারা নিজেরা এগুলো একটু করে দেখবেন। সন্ধ্যেবেলা পাঁচ মিনিটের জন্য দরজা বন্ধ করে হাততালি দিয়ে 'জয় ঠাকুর' 'জয় ঠাকুর' করুন। কিংবা স্বামীজীর খুব সুন্দর গান আছে, *যামি গুরুং ভববৈদ্যম* এই গান করুন বা শুধু হরে রাম হরে রাম করতে থাকুন। পাঁচ মিনিট অবশ্যই করবেন, একদম নিয়ম করে নিন। আপনাদের বয়স হয়ে গেছে, কত আর টিভি সিরিয়াল, আলতু-ফালতু জিনিস দেখবেন।

একজন মহিলা আমার কাছে এলেন, ওনার স্বামী পুলিশে কাজ করেন। এসে বলছেন, 'আগে ভাবতুম, এই যে বাড়ির কাজকর্ম করছি এতেই চব্বিশ ঘন্টা চলে যাচ্ছে। এখন রোজ এক ঘন্টা আপনার লেকচারগুলো শুনি, তাও দেখছি সময় কুলিয়ে যাচ্ছে'। আমি বললাম, 'আরও যদি বাড়ান তাতেও দেখবেন সময় কুলিয়ে যাচ্ছে'। জীবনে এটা একটা আশ্চর্য, সত্যিকারের কথাগুলো যদি শোনেন, ভাল কথাগুলো যদি শোনেন, এটাকে যদি বিনোদন রূপে না নেন, দেখবেন আপনার মনের শক্তি বেড়ে যাবে। মনের শক্তি বাড়লে কাজকর্মগুলো চটপট গুছিয়ে করে নেওয়া যায়। এই যে বলছেন, হাততালি দিয়ে তাঁর নাম করলে পাপপাখি পালিয়ে যায়, পাপের বোধটাই থাকে না, উড়ে যায়। একবার

করে দেখুন যায় কিনা। আপনাকে মিষ্টি দেওয়া হয়েছে, আপনি জিজ্ঞেস করছেন, মিষ্টিটা কেমন। আপনি নিজে একবার চেখে দেখে নিন না। এক মাস, পাঁচ মিনিট দরজা বন্ধ করে যাতে কেউ বিরক্ত না করে, যে কোন একটা ঈশ্বরের নাম করুন –হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে বা শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম বা যামি গুরুং ভববৈদ্যম্ শরণম্। আমি নিজে একটা গান রচনা করেছি, সেটাও আপনারা এক মাস পাঁচ মিনিট করে করুন –

রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয়, রামকৃষ্ণ শুভনাম।
রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয়, রামকৃষ্ণ ভগবান।।
জয় জয় রামকৃষ্ণ ভগবান, জয় জয় রামকৃষ্ণ শুভনাম।।

কিছু দিন করে দেখুন, দেখবেন মনের যে কলুষ ভাব, মনের যে তমস ভাব সব কেটে বেরিয়ে যাবে। আমাদের যত মহারাজরা আছেন, সবাই এভাবেই করেছেন, আজ তাই দাঁড়িয়েছেন।

সৎসঙ্গ সর্বদাই দরকার। গঙ্গার যত কাছে যাবে ততই শীতল হাওয়া পাবে, অগ্নির যত কাছে যাবে ততই উত্তাপ পাবে।

ঢিমে তেতালা হলে হয় না। প্রশ্ন ছিল, কিভাবে ভগবানকে পাওয়া যায়। একটা হয়, নমো নমো করে নিয়ম রক্ষা করে যাওয়া। গুরু বলে দিয়েছেন, একশ আটবার করে জপ করবে। একশ আটবারই কেন? মন্ত্রটা যাতে ভুলে না যাও। বম্বের একটা অফিসে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে একজন দৌড়ে এসে জানতে চাইল, 'আপনি কি রামকৃষ্ণ মিশনের'? বললাম, 'হ্যাঁ'। 'আমিও রামকৃষ্ণ মিশন থেকে দীক্ষা নিয়েছি'। 'কার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছেন'? 'দাঁড়ান ডাইরি দেখে বলছি'। ডাইরি দেখে গুরুর নাম খোঁজা, কেমন চেলা আমি বুঝে গেছি। নিয়ম রক্ষা করা একটা জিনিস, গুরু বলে দিয়েছেন সকাল-বিকাল একশ আটবার করে জপ করতে, তাই নমো নমো করে কোন রকমে একশ আটবার জপ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। ধর্ম পথে নামতে পুরোদমে নামতে হবে, এখানে ঢিমে তেতালা চলে না।

যাদের সংসারে ভোগের ইচ্ছা আছে তারা বলে, 'হবে, কখন না কখন ঈশ্বরকে পাব'। আপনাদের আশেপাশে যারা আছে দেখবেন, শুধু যে ভোগের ইচ্ছা আছে তা না, ঘোর তামসিক। একটু নজর দিয়ে দেখুন, সবাই কি ভোগ করছে? কুলি-কামারি, জন মজুরদের মত খেটে যাচ্ছে, মনে করছে বিরাট কিছু করছে, আর বলবে, ওনাদের জীবন কত ভাল ছিল। আমাদের একজন লিখলেন, ওনার বাড়ির সামনে কয়েকজন হিন্দিভাষী আছেন, সন্ধ্যেবেলা 'হরে রাম' করে। সারদিন কুলি মজুরের মত খাটছে, সন্ধ্যেবেলা হাত জোড় করে হরিনাম করছে। জীবনে তাদের কোন আর্থিক উন্নতি হতে দেখলাম না, কিন্তু তাও তারা রামকে ছাড়ছে না। আমাদের এখনে উলটো, দুটো পয়সা হয়ে গেল, রামকে ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু বেরিয়ে গিয়ে কি ভোগ করছ তুমি? কিছুই ভোগ করতে পারছ না, একটা মহা তামসিক। সাহেবের পিছন পিছন দৌড়াচ্ছ। ঠাকুর বলছেন, সাহেবের বুটের গোঁজা খায়।

আমি যখন এই ইয়ং ছেলেমেয়েদের দেখি, যারা ভাবছে আমি বিরাট কিছু, তখন প্রথমে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, তুমি কোন অর্থে আমার থেকে ভাল বলতো? দু লাখ, তিন লাখ টাকা মাসে আয় করছ মানছি, কিন্তু আমার থেকে কোন অর্থে ভাল? এমন কিছু কি তোমার আছে যেটাকে নিয়ে তুমি অন্যদের থেকে আলাদা ভাববে? কিছুই নেই। তোমার একটা কোয়ালিফিকেশান আছে, আর ওদের কাজের দরকার, বিজনেসে টাকা ঢালছে, সেখান থেকে তোমাকে কিছু টাকা দিচ্ছে। কিন্তু ভিতর থেকে তুমি বিরাট এমন কি হয়ে গেছ? কালচারালি কি তুমি সুপিরিয়র হয়ে যেতে পেরেছ?

একবার একটা বর্ণনা পড়েছিলাম, বিদেশে একজন আছে, যে মদ শুঁকে বলে দেবে কোন বছরের তৈরী। আমাদের কাছে এখনও মদ মানে তাড়ি, মদের গন্ধের উপর ভাবার বুদ্ধিটাই আমাদের

নেই। আমাদের কাছে ব্রাণ্ডিও যা, হুউসিকিও তাই, রামও তাই; মদের যে আবার আলাদা আলাদা বছর হয়, সেটাও জানা নেই। এও একটা ট্যালেন্ট। এই কালচার ওই বিদেশী ভদ্রলোকের হাতের মুঠোয়, শুঁকে বলে দিচ্ছে এই মদ কোন বছরের তৈরী। আবার অনেকে আছে, শুঁকে বলে দেবে এই মদ কোথায় তৈরী হয়েছে, কোন অঞ্চল থেকে এসেছে। তোমাদের এই কালচারটাও নেই, কি ভোগ করবে তুমি। সব কটা আবার পেটরোগা, খেলে হজম হয় না, সারাদিন শুধু ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর আবার ব্যকুলতা নিয়েই বলছেন।

আমি কেশব সেনকে বলেছিলাম, ছেলেকে ব্যাকুল দেখলে তার বাপ তিন বৎসর আগেই তার হিস্যে ফেলে দেয়।

মা রাঁধছে, কোলের ছেলে শুয়ে আছে। মা মুখে চুষি দিয়ে গেছে; যখন চুষি ফেলে চিৎকার করে কাঁদে, তখন মা হাঁড়ি নামিয়ে ছেলেকে কোলে করে মাই দেয়। এই সব কথা কেশব সেনকে বলেছিলাম।

কলিতে বলে, একদিন একরাত কাঁদলে ঈশ্বর দর্শন হয়।

মনে অভিমান করবে, আর বলবে, 'তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ; দেখা দিতে হবে'।

আমাদের ঈশ্বরেই বিশ্বাস নেই যেখানে, সেখানে এ-সব কথা আমরা বলব কি করে! ভগবান বিষ্ণু আর নারদের উপর খুব সুন্দর একটা গল্প আছে। নারদ বলছেন, আপনাকে এত লোক ভক্তি করে, আপনি দেখা দেন না কেন? ভগবান বললেন, ঠিক আছে, চল, তুমি বিজ্ঞাপন দিয়ে দাও, ভগবান অমুক জায়গায় বসে আছেন, তোমরা এসে ভগবানের সাথে দেখা করতে পার। শুনে নারদ খুব খুশি। উনি সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে-গঞ্জে-সহরে সব জায়গায় খবর রটিয়ে দিলেন। পরে নারদ ফিরে এসে দেখেন, ভগবান যেখানে বসে ছিলেন সেখানে একটা বিরাট মেলা বসেছে। মেলাতে চিৎকার চেঁচামেচি –এসো এসো সার্কাস দেখে যাও, এসো এসো জাদুখেলা দেখে যাও, এসো এসো ফ্রীতে মিষ্টি খেয়ে যাও, ফ্রীতে নাগরদোলা চড়ে যাও। এমন মেলা আর বাজার বসে গেছে যে, যত রকমের ভোগ্য উপকরণ হতে পারে সব এনে পসরা সাজিয়ে বসে গেছে। আর ভগবান দেখা দিচ্ছেন শুনে হাজারে হাজারে লোক এসে সবাই মেলা দেখতে লাগল।

নারদ হতাশ হয়ে ভগবান বিষ্ণুর কাছে বসে আছে। এত বিজ্ঞাপন, এত প্রচার, তা সত্ত্বেও ভগবানের কাছে কেউ এলো না। সকাল থেকে সন্ধ্যা ভগবান বিষ্ণু বসে আছেন। সন্ধ্যে হতে দেখা গেল একজন লোক, ক্ষেতে-খামারে কোথাও সে কাজ করছিল, খবর পেয়েছে ভগবান দেখা করবার জন্য অমুক জায়গায় বসে আছেন। শুনে সব কাজ সেরে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে হাজির। মেলার সব দোকানদাররা তাকে ডাকছে, হাত ধরে টানছে; কিন্তু সে কারুকেই গ্রাহ্য করছে না। দৌড়াতে দৌড়াতে এসে ভগবান বিষ্ণুর পায়ের কাছে এসে পড়ে গেল। ভগবান তখন নারদকে বলছেন, 'এখন বুঝলে তো নারদ, আমি সবাইকে দেখা দিতে চাইলেও আমাকে কেউ দেখতে চায় না। এই একজন ঠিক ঠিক ভক্ত, যে শুধু আমাকেই চায়'। সব দেখে নারদের মুখটা চুন হয়ে গেল।

ভগবান যদি এসে বলেন, আমি ভগবান, প্রথমে কেউ বিশ্বাস করবে না, উলটে পাগলা গারদে নিয়ে পুরে দেবে। ঠাকুরের নামই হয়ে গেল –দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুন। আর তিনি তো এমনি দেখা দেবেন না, লোকেরা যাতে তাঁকে না দেখতে চায় তাই জাদুর বাজার লাগিয়ে দেন। সংসারটা তো তাই; এখানে তিনি জাদুর বাজার লাগিয়ে রেখেছেন। আমরা সবাই ভগবানের দিকে দৌড়ে এসেছি। এসে কি করছি? আপনি মেলার একটা খেলনা নিয়ে ব্যস্ত, আমি একটা খাওয়ার দোকানে বিনামূল্যে মিষ্টি খাওয়া নিয়ে মজে আছি, আপনি নাগরদোলায় বন্‌বন্ করে ঘুরে যাচ্ছেন; খেলনা নিয়ে আমরা সবাই ব্যস্ত।

এগুলো অত্যন্ত সাধারণ জিনিস, একবার যদি একান্ত হয়ে নির্জনে ভাবেন বা বাসে-ট্রেনে যেতে যেতে একটু যদি ভাবেন, তাহলে দেখবেন সত্যিই তো তাই। সমস্ত কিছু ছেড়েছুড়ে যদি হিমালয়ে চলে যান, দেখবেন ওখানেও আপনার একটা খেলনা জুটে গেছে।

ঠাকুর বলছেন, **সংসারেই থাক, আর যেখানেই থাক –ঈশ্বর মনটি দেখেন**। আমার বিশ্বাস আছে কিনা, আপনার বিশ্বাস আছে কিনা, ঠাকুর সেটা দেখেন; ঠাকুর ভিতরটা দেখেন। আপনি বিরাট আড়ম্বর করে পূজা করছেন, না ওতে হয় না; কারণ তিনি জানেন ওই পূজার পিছনে আপনার কি কি কামনা-বাসনা লেগে আছে। ঠাকুর মন দেখেন, তিনি জানেন আপনি ভিতরে ভিতরে আসলে কি চাইছেন। বিষয়াসক্ত মন যেমন ভিজে দেশলাই, যত ঘষো জ্বলে না।

একলব্য মাটির দ্রোণ অর্থাৎ নিজের গুরুর মূর্তি সামনে রেখে বাণ শিক্ষা করেছিল। কারণ যে সত্যি সত্যি সাধনা করতে চায়, যে এগোতে চায়, কেউ তাকে আটকাতে পারবে না। সেইজন্য বলছেন, এগিয়ে পড়।

এগিয়ে পড়; –কাঠুরে এগিয়ে গিয়ে দেখেছিল, চন্দন কাঠ, রূপার খনি, সোনার খনি, আরও এগিয়ে গিয়ে দেখল হীরে, মাণিক। কাঠুরেকে ব্রহ্মচারী বলে দিয়েছিলেন, এগিয়ে যাও।

যারা অজ্ঞান, তারা যেন মাটির দেওয়ালের ঘরের ভিতর রয়েছে। ভিতরে কোন আলো নাই, আবার বাহিরের কোন জিনিস দেখতে পাচ্ছে না। জ্ঞান লাভ করে যে সংসারে থাকে সে যেন কাচের ঘরের ভিতর আছে।

ঠাকুরের এই কথাকে দুটো দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়; একটা তো হল যাঁদের সত্যিকারের জ্ঞান হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয়, নির্জনে গিয়ে কিছু দিন জপধ্যান করে যাঁরা একটা বিশ্বাস লাভ করেছেন। বিশ্বাস লাভ করলে জীবনদর্শন পুরো পাল্টে যায়।

ভিতরে আলো বাহিরেও আলো। ভিতরের জিনিসও দেখতে পায়, আর বাহিরের জিনিসও দেখতে পায়।

এটাই সবার জীবনের উদ্দেশ্য, ভিতরেও আলো বাইরেও আলো। ভিতরে আপনি ঈশ্বরকে দেখছেন, বাইরেও আপনি ঈশ্বরের প্রকাশকে দেখছেন। ভগবান, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি এই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করছেন, তিনিই অন্তর্যামী হয়ে ভিতরে বসে আছেন। যা কিছু চলছে, যা কিছু হচ্ছে সবই তাঁর ইচ্ছাতেই চলছে, তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে –এই জিনিসটাকে তাঁরা পরিষ্কার দেখতে পান।

এই যে বললেন, ঈশ্বর মন দেখেন; এই জায়গাতে আমাদের সবাইকে একটু ভাবতে হবে, আমি কি চাই। কথামৃত পড়ে, শাস্ত্রাদির আলোচন শুনে শুনে মনে হবে, কই আমার মন তো কামিনী-কাঞ্চনে নেই। আপনার মন কামিনী-কাঞ্চনে নেই ঠিকই, কিন্তু অন্য দিকে তো আছে। খেলনা শুধু এক রকমেরই হয় না, অনেক রকমের হতে পারে। আগেকার দিনে রামকৃষ্ণ মিশনের কেউ সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার পর পড়াশোনা করতে চাইলে ওনারা নিষেধ করে দিতেন, আর দরকার নেই; বিদ্যার্জনের স্পৃহা তোমাকে ঈশ্বরবিমুখীতার দিকে টেনে নেবে। যার জন্য আমরা দেখি, সঙ্ঘে যাঁরা বিরাট পড়াশোনা করে এসেছেন, সঙ্ঘের বিরাট কোন কাজে কেউ লাগেননি। এখন পর্যন্ত লাগেননি, ভবিষ্যতে কি হবে জানা নেই। অন্যান্য দিকে মন বেশি চলে গেলে আত্মরম্ভিতার দিকে মনটা বেশি চলে যায়। সবই হয়, ঠাকুরের নাম নেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু থেকে যায় নিজে।

এখান থেকে ঠাকুর আবার অদ্বৈতে ঢুকে যাচ্ছেন। কাদের বলছেন? মণিরামপুরের ভক্তদের; অবাক লাগে। উপনিষদের তত্ত্বগুলো সাধারণদের বলা হত না, উপনিষদই বলা হত না। ঠাকুর সেই

তত্ত্বগুলিকে সাধারণদের জন্য খুলে দিচ্ছেন। কিন্তু আমরা এমনই অভাগা যে ধারণা করতে পারি না, ধারণা করার কোন চেষ্টাও নেই।

এক বই আর কিছু নাই, সত্তা একটি। তারপর শেষে বলবেন, যে একের দুই নাই আর একেবারে শেষে ঠাকুর বলবেন, অদ্বৈতম্। অদ্বৈতম্, যার এক নেই, দুই নেই, শূন্য নেই। আমরা যখনই বলি বা শুনি এক নেই, দুই নেই, শূন্য নেই; তখন মনে হবে যেন কিছুই নেই, এটা বৌদ্ধদের শূন্যবাদ না। সেইজন্য একম্ বলা হয়। একম্ একের জন্য বলা হয় না। ওই রকম এক যদি বলেন, তাহলে মুসলমান, খ্রীশ্চান ধর্ম হয়ে যাবে। এখানে এক মানে যার দুই নেই।

এক বই আর কিছু নেই। আমি নেই, আপনি নেই, এই মাইক্রোফোন নেই, কোন কিছুই নেই। **সেই পরব্রহ্ম 'আমি' যতক্ষণ রেখে দেন, ততক্ষণ দেখান যে, আদ্যাশক্তিরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন**।

কথামৃতের একটা বৈশিষ্ট্য, যেটা আপনারাও লক্ষ্য করে থাকবেন; তা হল, ঠাকুর কেমন নির্বিকার ভাবে ধর্মের যে একেবারে শেষ কথা সবারই কাছে বলছেন। ওটা যে লোককে বোঝানর জন্য একটু সহজ করে বলছেন, তা না। উপমাগুলো অন্য রকম নিচ্ছেন, উদাহরণগুলো এখান ওখান থেকে নিচ্ছেন, কখন নিজের জীবনের কথা বলছেন। আজকে যদি ঠাকুরকে বা ঠাকুরের কথামৃতকে এই বঙ্গভূমি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে স্বাভাবিক ভাবে স্বামীজী রচনাবলীও চলে যাবে। তাহলে এই যে কথাগুলো আমরা পড়ছি, যেখানে ঠাকুর বলছেন, এক বই আর কিছু নাই। এটা হল খাঁটি সরষের তেল, যাতে এতটুকু ভেজাল নেই, ঝাঁঝওলা সরষে তেল।

এবার আপনি মনে করতে চেষ্টা করুন, এই কথা আপনি কোন বইতে পাবেন? বাংলায় রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্যচরিতামৃতে কি এই রকম খাঁটি অদ্বৈতের শেষ কথা পাবেন? এখানে যেন সামনে দাঁড়িয়ে সরাসরি গুলি করা হচ্ছে। এ-রকম সরাসরি পেতে হলে আপনাকে গীতাতে যেতে হবে। একদিকে গীতা তিন-চার হাজার বছর আগে রচিত, অন্য দিকে সংস্কৃত ভাষা। কতটা মানুষ বুঝবে, বুঝবে না, বিশ্বাস হবে কি হবে না, কোন ঠিক নেই। কথামৃতের এটাই বৈশিষ্ট্য। একেবারে মানুষের বুকে একে-৪৭ ঠেকিয়ে গুলি দিয়ে ঝাঁঝড়া করে দেওয়ার মত। কোন পিস্তল কি রাইফেল না, একেবারে একে-৪৭। ঠাকুরের যে কথাগুলো বেরোচ্ছে, এটা হল স্পিরিচুয়াল মেশিনগান। আর আপনার ভারতের পুরো আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য যদি না জানা থাকে; যদি বেদ না জানা থাকে, উপনিষদ যদি না জানা থাকে, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, তন্ত্র এগুলো যদি না জানা থাকে, তাহলে ঠাকুরকে ঠিক ঠিক বোঝা বা ধারণা করা খুব কঠিন হবে। ভাসা ভাসা একটু জানা থাকলেও ঠাকুরকে বোঝা যাবে না। কিন্তু আমরা ঠাকুরকে পুরোপুরি বুঝতে না পারি, কিন্তু এটা বুঝতে পারি যে, ঠাকুরের যে কথাগুলো আসছে, এগুলো যেন বুম্ বুম্ করি গুলি মেরে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। কি বলছেন? এক বই আর কিছু নাই।

ঠাকুর মা কালীর সাধনা করলেন, মায়ের দর্শন পেলেন। মা কালীর সঙ্গে অহরহ কথা বলছেন, মস কালীর সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঠাকুর শ্রীরামের দর্শন পেলেন, শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেলেন, কত দেবদেবীর দর্শন পেলেন। যিনি অদ্বৈত সাধনা করলেন, অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত আবার যিনি রামলালার অষ্টধাতুর মূর্তি নিয়ে তাঁকে নাওয়াচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন, আদর করছেন, তিরস্কার করছেন; যিনি মা কালীকে বলছেন –বেশি দিক্ করিসনে, সেই তিনি কিনা বলছেন, এক বই আর কিছু নাই। "সেই পরব্রহ্ম 'আমি' যতক্ষণ রেখে দেন, ততক্ষণ দেখান যে, আদ্যাশক্তিরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন" ঠাকুরের এই একটি কথা যদি সবচেয়ে ভাল বুঝতে চান তাহলে আপনাকে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যেতে হবে। মা দুর্গা যুদ্ধ করছেন, কাদের সঙ্গে? যেখানে ধূম্রলোচন, চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ, শুম্ভ, নিশুম্ভ ইত্যাদি অসুররা মা দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এসেছে। মা একে একে সব পরাক্রমশালী অসুরদের বধ করতে

লাগলেন। তখন শুম্ভ এসে বলছে, তুমি তো অন্যের শক্তি আশ্রয় করে যুদ্ধ করছ আর নিজেকে খুব বিরাট ক্ষমতার অধিকারিণী বলে মনে করছ? মা তখন শুম্ভকে কি সুন্দর বলছেন –*একৈবাহং জগত্যাত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা*।

আমাদের পৌরাণিক কাহিনীর উদ্দেশ্যই হল, আমাদের বেদ, উপনিষদের আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে কাহিনীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা। বেদান্তের তত্ত্বকথা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য। আমাদের মত লোকেদের জন্য চণ্ডীতে যে বর্ণনাগুলো আছে, *একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয় কা মমাপরা*, আমি ছাড়া জগতে দ্বিতীয় আর কে আছে। চণ্ডীর এই বর্ণনা শুনতে আপনার হয়ত খুব মিষ্টি লাগছে, একটা কেমন নাটকীয়তার ভাব আছে। কিংবা আপনি বলবেন, ঋষিদের যিনি এই কাহিনী রচনা করেছেন, এটা তাঁর নিজস্ব ভাব। ঠাকুর যখন বলছেন, এক বই আর কিছু নাই; এবার পুরো ছবিটাই পাল্টে যাচ্ছে। কেন? এই কথা সেই ঠাকুর বলছেন, যিনি মা কালীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন, যিনি মা সীতার দর্শন পেয়েছেন, মহাবীর হনুমানের দর্শন পেয়েছেন, একাধারে যিনি শিব, বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, সমস্ত দেবদেবীর দর্শন পেয়েছেন, আবার যিনি রামলালাকে নিয়ে খেলা করতেন, তাঁর উপর মান-অভিমান করতেন, তিনি এই কথা বলছেন –এক বই আর কিছু নাই।

এই যে ঠাকুর বলছেন –সেই পরব্রহ্ম 'আমি যতক্ষণ' রেখে দেন, ততক্ষণ দেখান যে, আদ্যাশক্তিরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন; এটাকে ধারণা করা খুব মুশকিল। যাঁরা অনেকদিন প্রচুর জপধ্যান করেছেন, চারজন সাধুর সঙ্গ করেছেন, তাঁরা একটু ধারণা করলেও করতে পারেন; কিন্তু সেই পরব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই, এই জিনিসটাকে ধারণা করা বাকিদের জন্য খুবই মুশকিল।

বলছেন, তিনি 'আমি' রেখে দিয়েছেন। এই 'আমি'টা তিনি কার উপর রাখছেন, তিনি ছাড়া অন্য কেউ তো নেই? তিনি 'আমি' রেখে দিয়েছেন, এই জিনিসটাকে তো ধারণা করা প্রায় অসম্ভব। এখানে আমরা খুব সহজ একটা উদাহরণ দিতে পারি। আপনি মনে করুন –আপনি বিছানায় শুয়ে আছেন, ভগবানের অনন্তশয়নের মত। এবার শুয়ে শুয়ে আপনি ভাবতে শুরু করলেন। চল মন বেড়িয়ে আসি। কোথায়? হিমালয়। চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন, আপনি হিমলয়কে ভাবতে শুরু করলেন। আপনি হরিদ্বার পৌঁছে গেলেন; কলকাতার হুগলী নদী হরিদ্বারে ভাগীরথী, সেই এক মা গঙ্গা। এবার আপনি হিমালয়ের দিকে পদ সঞ্চালন করলেন। সেখানে আপনি কিছু পুরনো স্মৃতি, কিছু কল্পনা, কিছু বাস্তব যেগুলো করেছেন, সব মিলিয়ে ওর মধ্যে ডুবে গেলেন। অনেকক্ষণ ওতেই ডুবে থাকলেন। আপনার ওই চিন্তার জগতে লোকজনও এসে গেল, চিন্তাতে একটা জায়গা এসে গেল, গাড়িঘোড়া, বাড়িঘর এসে গেল। একসঙ্গে অনেক কিছু এসে গেল, অনেক লোক হয়ে গেল, আপনিও ওর মধ্যে ঘুরছেন। এর সঙ্গে কথা বলছেন, তার সঙ্গে কথা বলছেন। এইভাব অনেকক্ষণ চলতে চলতে কোন কারণে আপনার তন্দ্রাটা ভেঙে গেল। কোথায় গেল তারা, কোথায় গেল গাড়িঘোড়া, বাড়িঘর? কোথাও যায়নি। যাবেটা কোথায়, এসে থাকলে তবেই না থাকবে; যে আদপেই আসেনি সে যাবে কোথায়? বোঝার জন্য সবচেয়ে কাছের এই উপমাই নিতে পারি –সেই পরব্রহ্ম 'আমি যতক্ষণ' রেখে দেন, ততক্ষণ দেখান যে, আদ্যাশক্তিরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন।

Lewis Carollএর 'Alice in Wonderland' একটা সাংঘাতিক বই। স্বপ্নজগৎকে নিয়ে অনেকেই বই লিখেছেন, কিন্তু এ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড একটা মাস্টারপিস্‌, অত্যন্ত উচ্চমানের কাহিনী, যেখানে স্বপ্নজগতের এত সুন্দর বর্ণনা যে, এই বইটাকে নিয়ে কত সিনেমা হয়েছে, আবার কত ভাবে লেখা হয়েছে। আর ওর শব্দগুলো আমাদের সাধারণ ভাষায় ঢুকে গেছে। এ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড ঘুমোচ্ছে, কিন্তু ওই ঘুমেতেই পুরো একটা জগৎ সৃষ্টি হয়ে গেছে। শুধু জগৎ সৃষ্টি হয়েই শেষ হয়নি, তার মধ্যে সেও ঢুকে গেছে। তার মধ্যেই সে হাসছে, তার মধ্যেই সে কাঁদছে। এটাই পরব্রহ্ম। এটাকে কেন আমি মানব? কারণ ওই হাসি-কান্নার খেলার মধ্যেই আর-একটি খেলা হচ্ছে।

স্বামীজী তখন বিলে, বিলে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে ধ্যান ধ্যান খেলতেন। ধ্যান ধ্যান খেলতে গিয়ে বিলে মাঝে মাঝে মাথায় হাত দিয়ে দেখতেন, তাঁর মাথায় জটা কতটা বড় হয়েছে। স্বামীজী ছোটবেলা থেকে ধ্যান ধ্যান খেলতে খেলতে বড় হতে থাকলেন। অনেক কিছু হচ্ছে, তার মধ্যে ধ্যান ধ্যান খেলা চলছে, তার মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এলেন, সেখান থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ। এই ধ্যান ধ্যান খেলা কখন যে অন্ত হয়ে গেল, যেখানে তিনি এই জগৎটাকে ছেড়ে দিলেন। স্বপ্নে যেমন হাসিকান্না, স্বপ্নে যেমন শোক-দুঃখ, এই স্বপ্নই হচ্ছে ধ্যান করা, এই স্বপ্নই হচ্ছে জপ করা, এই স্বপ্নই হচ্ছে পূজা করা। এই করতে করতে যার নিষ্ঠা খুব গভীর, তার জন্য ম্যাজিকের মত সব ভেঙে যায়, পর্দাটা ছিঁড়ে যায়। এটা কিন্তু স্বপ্ন না, আমরা বোঝানর জন্য বলছি। আমি দেখেছি লোকেরা প্রায়ই ভুল বুঝে এটাকে স্বপ্ন বলছেন। স্বপ্ন কেন হবে, স্বপ্নে যেমন হয় এটা পরব্রহ্মের স্বপ্ন, পরব্রহ্ম এ-রকম ভাবছেন। তিনি নিজের উপর এগুলো আরোপ করে নেন, *একোহম্ বহুস্যাম্ প্রজায়ামি*, আমি এক আমি বহু হব, এবার শুরু হয়ে গেল। স্বপ্নে আমরা যেমন যে চরিত্রগুলি দেখি, তারা এক অপরের সঙ্গে কথা বলছে, আমরাও তাদের সঙ্গে কথা বলছি। সেইজন্য যিনি ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি। আমরা অদ্বৈত নিয়ে আলোচনা করছি, যদিও এটা কঠিন তাও একটু বোঝা দরকার।

যিনি ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি, যিনি এক তিনিই বহু হয়েছেন। বহু কিভাবে হলেন, নিজের শক্তিতে, অন্য কোন শক্তি তাঁর লাগে না। যিনি পরব্রহ্ম, যিনি ভগবান, তাঁর নিজের শক্তিতেই এবার বহু হয়ে দেখাচ্ছেন।

যিনি ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি। আগের লাইনেই ঠাকুর বলছেন, এই আদ্যাশক্তিরূপে তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। **একজন রাজা বলেছিল যে, আমায় এককথায় জ্ঞান দিত হবে। যোগী বললে, আচ্ছা তুমি এককথাতেই জ্ঞান পাবে। খানিকক্ষণ পরে রাজার কাছে হঠাৎ একজন যাদুকর এসে উপস্থিত। রাজা দেখলে, সে এসে কেবল আঙুল ঘুরাচ্ছে, আর বলছে, 'রাজা, এই দেখ, এই দেখ'। রাজা অবাক্ হয়ে দেখছে। খানিকক্ষণ পরে দেখে দুটো আঙুল একটা আঙুল হয়ে গেছে। একটা আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতে বলছে, 'রাজা এই দেখ, রাজা এই দেখ'। অর্থাৎ ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি প্রথম দুটা বোধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর দুটো থাকে না**!

আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত ঈশ্বর আর জগৎ আলাদা দেখায়। খ্রীশ্চানদের কাছে আবার এটা একটা বিরাট বড় সমস্যা। খ্রীশ্চানিটির একটা সমস্যা হল, খ্রীশ্চান ধর্ম জন্ম নিয়েছে জুহুদি ধর্ম থেকে। আর জুহুদিদের সাথে খ্রীশ্চানদের লাভ-হেট সম্পর্ক, লাভ-হেট মানে, একদিকে ওদের গ্রন্থ থেকে কিছু জিনিস নেবে, আবার ওদেরকে মানবে না। এই ধরণের লোকেদের বেশি ভরসা করা যায় না। হয় তুমি পুরোপুরি নাও, তা নাহলে পুরোপুরি ছাড়। এখন যীশুও খুব বেশি কিছু কথা বলেননি, আমাদের উপনিষদে যেমন তত্ত্বকথা আছে, তিনি সেই রকম শুধু কিছু তত্ত্বকথা বলেছেন। দরকার হল তত্ত্বকথার বিস্তার। বিস্তার করতে গিয়ে ওনাদের যে ঋষিরা ছিলেন, খ্রীশ্চান পরম্পরাতে ঋষিরাও ছিলেন কোন সন্দেহ নেই। ওনাদের ঋষিরা, সত্যিকারের যাঁরা সাধক, তাঁরা আলাদা নির্জনে চলে যেতেন আর খুব কম কথা বলতেন। ফলে যাঁরা দার্শনিক তাঁদের উপর বর্তে গেল তত্ত্বকথা বলার দায়ীত্ব। দার্শনিকরা সব সময় নিজের বুদ্ধিতে চলেন। বুদ্ধিতে চলতে গিয়ে সব কিছু এলেমেলো করে রেখে দিলেন। তাঁরা সেই বুদ্ধি দিয়ে নিয়ে এলেন –ঈশ্বর এক, জগৎ আর-এক। এর কিছু কথা ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে এসেছে। ফলে সব কিছু মিলেমিশে এলেমেলো হয়ে গেল। আমার আপনার বোধে যদি মনে হয়, আমি আছি আর ঠাকুর আছেন; গানেও বলছেন, মা আছেন আর আমি আছি; এখানেই অজান্তায় আমরাও ওই একই ভুল করছি। হিন্দু শাস্ত্র মতে বলছেন, এই যে তুমি যেটাকে জগৎ মনে করছ, যেটাকে তোমার মন মনে করছে; এটা হল আদ্যাশক্তির এলাকা, কিন্তু ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি আলাদা কিছু না, দুটো এক।

এই যে ব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম, শুদ্ধ চৈতন্য; তিনি ভাবছেন, তিনি নিজের মত ভাবছেন। আমরা এটা কল্পনা করে বলছি। মনে রাখবেন, পরমব্রহ্ম কি ভাবেন কেউ জানতে পারবে না, কারণ তিনি মন, বুদ্ধির পারে। আসলে কি হয়, শাস্ত্রে যখনই এই ধরণের কথা বলা হয়, তখন ওনারা ইঙ্গিত ইশারা করে বলেন। ভাব কি জানতে হলে, ধ্যানে গিয়ে আপনাকে ধ্যান ধ্যান খেলা শুরু করতে হবে। খেলা করতে করতে একটু সিরিয়াস হয়ে যান, সিরিয়াস হতে হতে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে যান। ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন যখন হবেন তখন সমাধিতে পর্দাটা ছিড়ে যাবে। তখনই দেখবেন এক বই আর কিছু নাই।

ঠাকুর তাই বলছেন, **কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেলে আর দুটো থাকে না। অভেদ! এক! যে একের দুই নাই! অদ্বৈতম্**। আমরা অনেকবার এই জিনিসটাকে নিয়ে আলোচনা করেছি। আমার এক বন্ধু গতকাল বলছিলেন যে, একদিন এমনি ঘরে বসে টিভি দেখছিলেন। দেখতে দেখতে অবাক হয়ে গেলেন যে, ধর্মের উপর টিভিতে কত চ্যানেল চলছে। একটা চ্যানেলে খ্রীশ্চানিটি থেকে বলে যাচ্ছে, তুমি হোলি স্পিরিটে বিশ্বাস কর, নাহলে নরকে যাবে। আমাদের কেউ যোগের শিক্ষা দিচ্ছে। কত চ্যানেল, আর সবাই ধর্মের শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন, লোকেরাও শুনছে। আপনারাও নিশ্চয় বাড়িতে টিভি দেখেন, তাই এটা স্বাভাবিক যে আপনাদেরও অদ্বৈতের কিছু ধারণা আছে। কিন্তু আমরা যখনই অদ্বৈত নিয়ে আলোচনা করি, আমাদের প্রায় বেশির ভাগ লোকের ধারণা এক হয়ে যায়। কারণ গীতা উপনিষদে এই *একম্* শব্দটা অনেকবার পাই। *একম্* বলা হয় এই জন্য যে, এটা শূন্য নয়, বস্তু আছে। *একম্* কিন্তু তার দুই নেই, সবটাই অভেদ। ব্রহ্ম আর শক্তি এক নয়, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। অভেদ মানে কি? নিজের চিন্তা-ভাবনা করেই এর মানে আপনাকে বার করতে হবে, আমিও অভেদ শব্দের মানে বোঝাতে পারব না। ঠাকুর খুব সুন্দর একটা কথাই বলছেন –অদ্বৈতম্। মাণ্ডুক্য উপনিষদে এর উপর খুব সুন্দর মন্ত্র আছে –*শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্*। ঠাকুর যে বলছেন অদ্বৈতম্, কোন বিশেষ কারণে বলেননি। অন্য কিছু নেই, এটাকেই সংস্কৃত ভাষায় বলা হবে –অদ্বৈতম্।

এমনিতে অদ্বৈত শুনতে ভাল লাগে। বর্তমানকালে কত লোক অদ্বৈত শুনতে চাইছেন, বেদান্ত শুনতে চাইছেন। আমিও তাই অদ্বৈতের উপর গুটি কয়েক কথা বলছি। কারণ ঠাকুর এখন পুরো অদ্বৈতকে নিয়ে বলছেন। এক বই আর কিছু নাই, অদ্বৈত মানে এটাই। এই এক যার দুই নাই, কারণ মন নেই যে ওটাকে দেখবে। আমি ধরে নিচ্ছি আপনাদের অনেকেরই অদ্বৈতকে নিয়ে জানার ইচ্ছা আছে। অদ্বৈত আপনি যদি মানেন, অদ্বৈত যদি আপনি মানতে চান, অদ্বৈত যদি আপনি জানতে চান তাহলে কয়েকটা পয়েন্টস মাথায় বসিয়ে নিতে হবে। একটি ছোট্ট বাক্য –এক বই আর কিছু নাই, এর অর্থ কি আর তার জন্য কি কি হতে পারে আমরা এবার দেখব।

যদি আপনি অদ্বৈত মানেন, ঠাকুর বলছেন, অদ্বৈতম্; যদি এটকে আপনি সত্য মনে করেন, তাহলে এর ফল কি কি হয়, এই জিনিসটাকে নিয়ে এখন বলা হচ্ছে।

প্রথম, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী, ফিলজফিক্যাল আউটলুক, অর্থাৎ জীব, জগৎ, ব্রহ্মকে আপনি কিভাবে দেখবেন? প্রথমে যদি আপনার ফিলজফিক্যাল আউটলুক অদ্বৈতম্ হয়, যে একের দুই নাই, এতে প্রথমে কি হবে? টাইম বা সময় বলে কিছু থাকবে না। আর সহজ ভাবে বলতে গেলে, ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যত বলে কিছু থাকবে না। টাইম বলে কিছু নেই, স্পেস বলে কিছু নেই, কারণ এর এক বই আর কিছু নাই। বিজ্ঞানে বিভিন্ন সময়ে টাইমকে বিভিন্ন ভাবে দেখেন। স্পেসকেও বিজ্ঞান বিভিন্ন ভাবে দেখেন। এক বই আর কিছু নাই, এটাই যদি সত্য হয়, তাহলে টাইম থাকবে না, স্পেস থাকবে না। কারণ টাইম মানেই দুই এসে গেল, স্পেস মানেই দুই এসে গেল।

দ্বিতীয় ফল, কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকবে না, থাকতে পারে না। আমাদের কর্মবাদ, কার্য-কারণ এগুলোর কোনটাই থাকতে পারে না। কার্য-কারণের জন্য দুই দরকার। মায়া মানেই দেশ-কাল-কার্য-কারণ। ঠাকুর গল্প বলছেন, ব্যাসদেব যমুনা পেরোবেন। গোপীদের কাছ থেকে ননী-মাখন সব

খেয়ে বলছেন, আমি যদি না খেয়ে থাকি, হে যমুনে তুমি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাও, তোমার মাঝখান দিয়ে আমরা পার হয়ে যাব। কারণ, *একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা*। আমি ছাড়া তো আর কেউ নেই, খাবেটা কে? খেতে গেলে দুই লাগে, আমি, খাদ্য ও খাবার ক্রিয়া। কোন টাইম নেই, স্পেস নেই, কারণ নেই, অথচ দেখাচ্ছে।

তৃতীয়, যত ধরণের দর্শন আছে, যত ধর্মদর্শন আছে, সবটাই ঠিক। কারণ একদিক থেকে সবাই ভুল, অন্য দিক থেকে সবাই ঠিক। সবাই বিভিন্ন ভাবে অনন্ত সত্যকে সামনে আনার চেষ্টা করছেন। ধর্মজীবনে যত দেবীদেবতা আছেন সবাই সত্য হয়ে যান একমাত্র অদ্বৈতের জন্য। আমাদের একটা ধারণা হয়ে আছে যে, অদ্বৈত মানে ওটাই, যাঁরা দেবী-দেবতা মানেন না। কিন্তু অদ্বৈত পুরোদমে দেবীদেবতা মানে, ঈশ্বরকে মানে। শুধু তেত্রিশ কোটি দেবতা না, যত মন তত ঈশ্বর, যত মন তত দেবদেবী, যত মন তত মত। ঠাকুরের বিখ্যাত কথা –যত মত তত পথ। কিন্তু এখানে যত মত তত পথ না; যত মন তত মত, যত মন তত ঈশ্বর, যত মন তত দেবদেবী। তেত্রিশ কোটি দেবীদেবতা খুব কম হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বে সাতশ কোটি জনসংখ্যা, এখানে সাতশ কোটি দেবদেবী আছেন। এর সাথে ভবিষ্যতে যারা আসবে তাদেরও জুড়ে নিতে হবে। অথচ কি আশ্চর্য, তাঁদের অস্তিত্ব নেই। অস্তিত্ব মানে হয় যেটা সত্যি আছে; তিন কালে আছে আবার তিন কালের ঊর্ধ্বেও আছে। এই দেবদেবীরা আছেন, অথচ নেই।

হিন্দু ধর্মের যে মূল, আমরা যে এত দেবীদেবতা মানি, এটা সত্য এইজন্য যে অদ্বৈত সত্য। দ্বৈত দিয়ে, বিশিষ্টাদ্বৈত দিয়ে এটাকে কখন মানা যায় না। এমনিতে আমরা সবাই দ্বৈতবাদী, খুব হলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। আর একটু অন্য রকম হলে কোন বাদই না। মুখে কয়েকটা বড় বড় কথা বলে দিই; ঠাকুরের কথায় জ্যেঠী-খুঁড়ির কোঁদলের মত –ঈশ্বরের দিব্যি।

ফিলজফিকালি যদি দেখতে যান, এই জগতে যত গোলমাল চলছে, সব কিছুর জন্য দায়ী আপনি। ইউক্রেনে যুদ্ধ চলছে, ওখানে কার কার শীলহানি করা হচ্ছে, সব কিছুর জন্য দায়ী আপনি। কারণ অদ্বৈতম্, এটাই সত্য, যেখানে বলছেন –*মত্তঃ সর্বং প্রবর্তন্তে*, আমার থেকেই সব কিছু হয়েছে। যিনি শ্রেষ্ঠতম, সেটা আপনি; যেটা নিকৃষ্টতম, সেটাও আপনি। তা নাহলে কি যীশু বলতে পারতেন – I am Jesus the Christ, I am Judas the Christ। এক বই আর কিছু নাই, এটা যদি সত্য হয়, তাহলে কি এই ভাব নিতে পারার দম আছে? যত গুণ্ডা, চোর, বদমাইশ, পকেটমারের বাহিনী আছে, এরা সবাই আপনার থেকেই বেরিয়েছে –কারণ মা নিজেই বলছেন, *একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয় কা মমাপরা*। সমস্ত কিছু আপনার থেকে বেরিয়েছে আর আপনাতেই লীন হবে –এটাই অদ্বৈতম্। এটা হল ফিলজফির দিক থেকে।

আর শুধু তাই না, যখনই আপনি জীবনের দিকে তাকাতে শুরু করবেন, নিজের দিকে তাকাতে শুরু করবেন, তখন আপনি বুঝতে পারবেন বেদান্ত কি বলতে চাইছে। কারণ ওই জায়গায় পৌঁছানর জন্য কোথাও তো আপনাকে একটা শুরু করতে হবে, যেটাকে প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত বলা হয়। আপনাকে সব অবস্থাতে মুক্তির চেষ্টা করে যেতে হবে। আপনার জাগতিক যা কিছু দরকার, এটা থেকে মুক্তি। আপনার মানসিক যে অবস্থা, এটা থেকে মুক্তি। সব সময় আপনাকে এগুলো থেকে মুক্তির চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এর উপর ভরসা করা, তার উপর ভরসা করা, একে ভালবাসা, তাকে ভালবাসা, এই সব কিছু থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অদ্বৈতম্ মানেই আমি ছাড়া আর কেউ নেই কিনা, নিজেকে তাই সব সময় সম্মান দেওয়া। কারণ আপনিই আছেন, আপনিই সেই পরমব্রহ্ম। কোন পরিস্থিতিতে আত্মগ্লানি যেন না আসে। আপনার ঘুম না হতে পারে, অনেকেরই ঘুম হত না, স্বামীজীরও ঘুম হত না, কিন্তু এনাদের কারুর ডিপ্রেসান থেকে কখন ঘুম কম হত না। আত্মহত্যার চিন্তা যেন কখন মাথায় না আসে। কেন ডিপ্রেসান আসবে, কেন আত্মহত্যার চিন্তা মাথায় আসবে? কারণ আপনি ছাড়া তো আর কিছু নেই।

নিজের প্রতি যে আত্মসম্মানের ভাব, এই জিনিসটাকে স্বামীজী খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন। আমেরিকায় থাকার সময় স্বামীজী একটা ঘোড়ার গাড়ি করে স্বামীজী যাচ্ছিলেন। হঠাৎ স্বামীজী দেখছেন, রাস্তার ধারে দুটো ফুটফুটে বাচ্চা খুব সুন্দর জামা-কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে। স্বামীজীর গাড়ি ওই দুটো বাচ্চার সামনে দাঁড়াল, কোচওয়ান গাড়ি থেকে নেমে বাচ্চা দুটোকে কোলে নিয়ে আদর করলেন। স্বামীজী কোচওয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাচ্চা দুটোকে দেখে মনে হল খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারের, তুমি ওদের আদর করলে'? তখন ভদ্রলোক বললেন, 'বাচ্চা দুটো আমারই ছেলে। এখন আমরা একটু বিষম পরিস্থিতিতে পড়ে গেছি, আগে আমরা বড়লোক ছিলাম, কিন্তু পরিস্থিতি যাই হোক, বাচ্চাদের আমি আমাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী পালন করছি'। স্বামীজী তখন আনন্দে বলছেন –This is practical Vedanta। কোন পরিস্থিতিতেই নিজের প্রতি আত্মগ্লানি আনা যাবে না। কোন কিছু কালকের জন্য ফেলে রাখা যাবে না, যেটা করতে হবে সেটা here and now। জপধ্যান আজকে না করলেও চলবে, কাল দেখা যাবে; এই জিনিস কখনই চলবে না। টাইম বলে কিছু নেই, স্পেস বলে কিছু নেই; তাই কোন কিছু কালকের জন্য ফেলে রাখা যাবে না।

বিভিন্ন যে লোকের কথা বলা হয়, অন্যান্য ধর্মে বলে মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে, আপনার জন্য না। মৃত্যুর পর আমি রামকৃষ্ণলোকে যাব, বিষ্ণুলোক যাব; রামকৃষ্ণলোক, বিষ্ণুলোক আপনার জন্য না। কোন একটা বিস্কুটের বিজ্ঞাপন আছে দাদু খায় নাতি খায়, বিভিন্ন লোকে যাওয়া হল ওই ধরণের কথা। তত্ত্বের দিক থেকে এটা দাঁড়ায় না; যদি আপনি ঠাকুরের এই কথাকে মানেন –এক বই আর কিছু নাই। আপনি কাকে পেতে চান, কাকে বুকে জড়িয়ে রাখতে চান? এক বই কিছু তো নেই। যা কিছু আছে, সেটা আপনি নিজে।

জীবন আপনার সদা শান্ত স্থির। কিন্তু জীবনে আমাদের চাঞ্চল্য কেন আসে? কারণ আমরা কোন কিছু পেতে চাইছি, অভাববোধ এসেছে; এবার বাসনা হবে। এই অভাববোধ থেকে আপনার ভিতরে অশান্তি তৈরী হয়েছে। একবার গভীর ভাবে ভাবুন তো, কিসের অশান্তি, সমস্ত কিছু তো আপনার ভিতরেই বিদ্যমান। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন শক্তি নেই যে শক্তি আপনাকে দাবাতে পারে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন শক্তি নেই, যেটা আপনাকে কিছু করতে পারে। সেইজন্য প্রত্যেক অবস্থাতে আপনাকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আপনি কারুকে দোষ দিতে পারেন না, কারুর দোষ দেখতে পারেন না – দোষ কারো নয় গো মা। কেন? কারণ অপর কেউ নেই কিনা, অপর কেউ থাকলে তো দোষ দেবেন। এগুলো কোন ইমোশানাল কথা না, এর প্রত্যেকটি কথা বাস্তবিক দার্শনিক তত্ত্ব। যদি পারেন এই কথাগুলো আপনার বন্ধুবান্ধবদের শুনিয়ে দিন। তাহলে সবাই বুঝতে পারবেন, ঠিক ঠিক হিন্দু ধর্ম কোন স্তরে চলে। হিন্দু ধর্মের নিন্দুকরা এখনও শিবলিঙ্গের মধ্যে লিঙ্গ আর গোমুত্রের মধ্যে মূত্র দেখে বেড়াচ্ছে। আর আমরাও ওদের উত্তর দেওয়ার জন্য ছটফট করে বেড়াচ্ছি। জগতে অপর কেউ নেই, কিসের ভয় আপনার; কিসের দুঃখ, কে আপনাকে দুঃখ দেবে?

এই জিনিসটাকে বলতে গিয়ে স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন There is no misery for you; the misery that I am suffering is of my own doing। আমি যত কষ্ট পাই, সব কষ্ট আমারই তৈরী করা, কারণ অপর কেউ নেই কিনা। অপর কেউ থাকলে তবে না আপনাকে কেউ কষ্ট দেবে। আপনার কষ্ট কেউ দূর করতে পারবে না; তেত্রিশ কোটি দেবতা, শ্রীরামকৃষ্ণ, কালী, দূর্গা, বাবা ভোলানাথ কেউ দূর করতে পারবে না। একমাত্র আপনাকেই আপনার দুঃখ-কষ্ট দূর করতে হবে, কারণ একমাত্র আপনিই আছেন, আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। আজকে আপনার যে দুঃখ, আপনার যে দুরবস্থা, এটা আপনি নিজেই নিজের উপর নিয়ে এসেছেন। আপনাকেই এই দুরবস্থা দূর করতে হবে; অবশ্য আপনি নিজে যদি দূর করতে চান। যদি বলেন আপনি বেশ আছেন, তাহলে আপনি বেশ থাকুন, কোন সমস্যা নেই। সেইজন্য বলা হয় অদ্বৈত অনুশীলন করার জন্য বুকের পাটা চাই। বুকের পাটা যখন হয়, তখন ওরা হিন্দু হয়ে জন্মায়। হিন্দু হয়ে জন্মানোর জন্য বুকের পাটা থাকা দরকার। আপনি

যদি হিন্দু হন তাহলে বলুন, কোন ভগবান আপনার সাহায্য করবেন না; কোন ভগবান আপনাকে কষ্ট দিতে পারবেন না; কোন ঠাকুরের ইচ্ছা কাজ করে না; যা আছে তা হল –*একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা*।

এই কথা বলার বুকের পাটা আছে? যদি থাকে তাহলে বেদান্ত শুনবেন। আর তা যদি না থাকে, তাহলে হরিবোল, হরিবোল করে যান; মন্দের ভাল। ঠাকুরও দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, কিছু না পার সন্ধ্যেবেলা হাততালি দিয়ে হরিনাম কর। কারণ সবাই সব জিনিস নিতে পারে না। গীতায় খুব সুন্দর কথা বলছেন –*ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্*, সাধারণ মানুষের বুদ্ধিকে চালনা করতে নেই, কারণ ওরা নিতে পারবে না। তার জন্য বলে দেওয়া হয়েছে, এখন তুমি হরিবোল হরিবোল করে যাও। আমার এখন এটাই ভাল লাগছে, আমার এখন স্ত্রী-পুত্র ভাল লাগছে, আমার এখন টাকা-পয়সা ভাল লাগছে। যেমনি আপনি দুই মেনে নিলেন, আপনার কাছে স্ত্রী-পুত্র সত্য, আপনার কাছে সংসার সত্য, আপনার সব হাসিকান্না সত্য; সঙ্গে সঙ্গে একজন ভগবান এসে যাবেন, আর ওই ভগবান এবার আপনাকে নাচিয়ে যাবেন। এইভাবে জন্ম থেকে জন্মান্তর ঘুরতে ঘুরতে কোন জন্মে যখন সাধুসঙ্গ হবে, সাধুবাক্যে প্রীতি আসবে, তখন দোল দোল খেলা না করে ধ্যান ধ্যান খেলাতে প্রীতি জন্মাবে। ধ্যান ধ্যান খেলা শুরু হওয়ার পর সেখান থেকে আস্তে আস্তে আপনাকে উপরে সেই জায়গায় নিয়ে যাবে, যেখানে গিয়ে আপনি জানবেন জগতে কোন কিছু নেই যে আমাকে দুঃখ-কষ্ট দিতে পারে। তখন আপনার ভিতরের শক্তিটা জেগে উঠবে।

বাংলায় একটা খুব সুন্দর কথা বলা হয় –মরণ কামড়। যে কোন জিনিস মানুষ ততক্ষণই সহ্য করে যতক্ষণ সে জানে আমার বাঁচার উপায় আছে। আমাদের একজন মহারাজ আছেন অত্যন্ত ভাল মানুষ। কি হয়, ভাল মানুষরাই অনেক সময় ভুল করে বসেন। যে মানুষ যত ভাল হন, তিনি তত ভুল করেন। কারণ যে চালু হয়, তাকে আমরা চালুলোক বলি, চালুলোক কখন ভুল করে না। জীবনে আপনি কোন দিন ফেঁসেছেন? জীবনে কখন কষ্ট পেয়েছেন? কখন বেকায়দায় ফেঁসেছেন? কোন ভুল লোকের পাল্লায় কখন পড়েছেন? অবশ্যই পড়েছি, অবশ্যই ফেঁসেছি। কারণ আপনি ভাল মানুষ। যাঁরা ভাল মানুষ হন তাঁরা সরল হন। প্রথমত তাঁদের সাংসারিক বুদ্ধি কম থাকে, ওনারা চালু নন, পাটোয়ারী বুদ্ধি কম। কিন্তু মুশকিল হল, তাঁরা অনেক সময় মনে করে তাঁর অনেক বুদ্ধি আছে, তারপরেই ফেঁসে যায়। ওই মহারাজের ঘরে ইঁদুর অনেকদিন ধরে উৎপাত করছিল। একদিন কিভাবে কিভাবে উনি একটা ইঁদুরকে কায়দা করে দেওয়ালের একটা কোণাতে নিয়ে গিয়ে একটা লাঠি দিয়ে ওকে ভয় দেখাচ্ছেন মারবেন বলে। যে প্রাণী পালিয়ে যায় তার পিছন নিতে নেই, সে তো হার মেনে নিয়েছে। ইঁদুরটা এখন পালিয়ে যেতে চাইছে ওকে পালাতে দিন। ইঁদুরটা কোণায় পড়ে গেছে, আর উনি লাঠি নিয়ে মারার ভয় দেখিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ ইঁদুরটা এক লাফ দিয়ে ওনার আঙুলে একটা কামড় বসিয়ে দিয়েছে। আপনি ইঁদুরকে মারুন আর নাই মারুন, আপনাকে এখন হাসপাতালে যেতে হবে, শেষ পর্যন্ত তাই হল। এগুলো করতে নেই। যে জেনে গেল আমি কোণঠাসা হয়ে গেছি, আমার আর বাঁচার পথ নেই, এবার সে একটা মরণ কামড় দেবে। আপনিও এবার রুখে দাঁড়ান, কারণ আপনি জেনে গেছেন অন্য কেউ নেই; না আছে কেউ যে আপনার সাথে ঝামেলা করছে, না আছে কেউ যে আপনাকে সাহায্য করছে। এবার সব কিছু ছেড়ে রুখে দাঁড়ান। এই হল শক্তির উৎস। শক্তির একমাত্র উৎস এখান থেকেই হয়।

খুব নামকরা কথা আমরা শুনে আসছি – Behind the success of every man there is a woman। ইংরেজরা এই ধরণের কয়েকটা প্রচলিত কথা দিয়ে গেছে, যার বেশির ভাগই বোকা বোকা কথা। পাশ্চাত্য জগৎ কামিনী-কাঞ্চন ছাড়া কিছুই বোঝে না, সাফল্যের পিছনেও তাই নারী দেখছে। ভগবান বুদ্ধের পিছনে কোন মহিলা ছিল? যীশুর পিছনে কোন মহিলা ছিল? আমাদের জানা নেই। শক্তি যখন আসে তখন জানবেন এই আসার পিছনে কেই নেই। যখন শক্তি আসে, তখন জানবেন পিছনে লাগারও কেউ নেই। এগুলো কোন ইমোশানাল কথা বলা হচ্ছে না, একেবারে যুক্তির

উপর দাঁড় করিয়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। ঠাকুর নিজের অনুভূতির কথা বলছেন –এক বই আর কিছু নাই; যে কথা উপনিষদ বার বার বলছেন –অদ্বৈতম্। সেই পরমব্রহ্ম অদ্বৈতম, তিনি হলেন শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, চৈতন্য; ফলে সমস্ত জ্ঞান আপনার ভিতরে। বই পড়ে আপনি কি জ্ঞান আহরণ করবেন, সমস্ত জ্ঞান তো আপনার ভিতরেই, এই জ্ঞানকে জাগান, জাগিয়ে তলুন।

টেরি প্র্যাচেট একজন সুন্দর গল্প লেখক। ওনার গল্পে একটা চরিত্র আছে, সমস্ত জ্ঞান ওই জাতির মধ্যে। কিন্তু সমস্যা হল, ওরা যেখানে থাকে সেই দেশটা খুব গরমের দেশ। গরমের দেশ বলে ওই জাতিটা সব সময় নর্দমায় পড়ে থাকে শরীরটাকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য। আমাদেরও ওই অবস্থা। সমস্ত জ্ঞান আমাদের নিজেদের ভিতরে, কিন্তু সংসারের জ্বালায় এমন হয়ে গেছি যে, নিজেকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য এসি চালাতে হয়, ফ্যান চালাতে হয়। আর কি করে ঠাণ্ডা রাখা হয়? সংসারের জ্বালা থেকে নিজেকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য কামিনী-কাঞ্চনের দরকার পড়ে। টেরি প্র্যাচেটের ওই কাহনীতে আছে, কিভাবে কিভাবে ওকে আসল ঠাণ্ডায় নিয়ে গেছে। সেখানে গিয়ে হঠাৎ ওর শরীর মাথা সব ঠাণ্ডা হতে শুরু হয়ে গেছে। ব্যস্, দেখা যাচ্ছে ওর বুদ্ধের দৌড় কি সাংঘাতিক, বুদ্ধিটা কত প্রখর।

এক কথায় স্বামীজী বলছেন All power is within you, you can do anything। এই জগতে এমন কিছু নেই যেটা আপনি পেতে পারেন না। আপনি শুধু যে কোন জিনিস ইচ্ছা করুন, সত্যিকারের ইচ্ছা, সেটা ঘটতে বাধ্য। শুধু ঘটতে বাধ্য না, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তিগুলো আপনাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। খুব সাধারণ উদাহরণ আমরা দিয়ে থাকি, আমরা যখন স্কুলে ক্লাশ ফাইভ কি সিক্সে পড়তাম, আমরা তো চাইতাম পরীক্ষায় পাশ করে যাই। কিন্তু কই সবাই তো পাশ করতাম না। জগতের কোন শক্তি তো তখন আসত না। কারণ পাশ করাটা আমাদের কখনই ইচ্ছা ছিল না। আমাদের আসল ইচ্ছাটা ছিল, তমোগুণে পড়ে থাকা। পাশ করাটা মূল ইচ্ছা না। মূল ইচ্ছাটা ছিল আমি আলস্য নিয়ে পড়ে থাকব আর পাশ করাটা সাইড ইচ্ছা। সেইজন্য দেখবেন ভগবান আমাদের তমোগুণী হওয়ার জন্য সব রকম ব্যবস্থা করে দেন। প্রকৃতিও আমাদের তমোগুণী হওয়ার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে দেন। তমোগুণ এখন এত বেড়ে গেছে যে, যার জন্য ওয়ার্ক ফ্রম হোম কালচার নিয়ে আসতে হয়েছে। আগে একটু যে খেটেখুটে বাসে-ট্রেনে করে অফিস যেতে হত, এখন সেটাও করতে হচ্ছে না। তারপর আবার বলবে সংসারে এত সমস্যা কেন? সংসারে সমস্যা হবে না তো কোথায় হবে, সব তমোগুণী হয়ে যাচ্ছে তাই এত সমস্যা।

আপনি করে দেখুন, বিশ্বাস করুন, ভিতর থেকে সত্যি যদি আপনার ইচ্ছা জাগে। কারণ বাজারে যখন আলু, পটল কিনতে যান, আপনাকে একটা মূল্য দিতে হয়। আপনি সত্যিই আলু পটল কিনতে এসেছেন, এমনকি কোন কারণে আপনার পয়সা যদি কম পড়ে, দোকানদার আপনাকে বাকিতে দিয়ে দিতে পারে, সব সময় দেবে না। আপনি যদি এই সংসার বাজারে পুরোপুরি সত্যিকারের নামেন, আমার এটা চাই, দেখবেন কোন না কোন ভাবে আপনার কাছে জিনিসটা চলে আসবে। আমাদের এক মহারাজ খুব সুন্দর একটা গল্প বলতেন। আগেকার দিনে সোমরস একটা জড়িবুটি ছিল। একজনের যজ্ঞের জন্য সোম চাই। সে দোকানে গিয়ে সোমরাজা চেয়েছে। সোমকে রাজা বলা হত। দোকানদার তাকে বলছে, *সোমরাজা ততোভূয়াৎ*, তুমি যত টাকা দিতে চাইছ তার থেকে এর দাম বেশি। পরের দোকানে গেল, সেই দোকানেও তাকে বলা হল *সোমরাজা ততোভূয়াৎ*। সব দোকানের এই এক কথা, *সোমরাজা ততোভূয়াৎ*, তুমি যা দাম দিচ্ছ সোমরাজার তার থেকেও বেশি। এই করে করে সব দোকান ঘুরে শেষ একটা দোকানে গেছে। যতক্ষণ ওই দোকানের লোক বলতে শুরু করেছে *সোমরাজা…*, এই লোকটি ঝাঁপ মেরে বলছে, 'নিকুচি করেছে তোমার সোমরাজা, আমার এটা চাই, এই নিলাম, বলে দোকানদারের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল'। যখন ব্রহ্মচারী ছিলাম তখন গল্পটা মহারাজের কাছে শুনেছিলাম। আরে আমার চাই, যে করেই হোক এটাই আমার চাই।

এইভাবে যখন ইচ্ছাটা জাগবে, দেখবেন জগতের সমস্ত শক্তি আপনার পাশে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত শক্তি, প্রকৃতির যত শক্তি, আসলে সব শক্তি আপনারই অধীনে। পরমব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি এক। আপনি চেয়েছেন, তাই আদ্যাশক্তি আপনার চারিদিকে ঘুরতে শুরু করে দেবে। শ্রীশ্রীমায়ের একটা ছোট্ট কথা –কারও দোষ দেখো না, কেউ পর না। কেউ পর না মানে? আপনি ছাড়া কেউ নেই তো, অন্য কিছু নেই। এক বই আর কিছু নাই, কিসের তুমি দোষ দেখছ। অপরের দিকে যদি তাকাতে হয়, তার দিকে সম্মানের দৃষ্টিতে তাকাবে। সবাইকে সম্মান দেবে। কারণ সম্মান দিলে আপনার ভিতর সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাবে। কাউকে কষ্ট দিতে গেলে আপনার তমোগুণ বাড়বে। তমোগুণ আপনাকে বাঁধবে, তমোগুণে থেকে আপনি যত ইচ্ছাই করুন; আমি তো আত্মজ্ঞান চাই, আমার সোনার হরিণ চাই; সোনার হরিণও আপনার আসবে না, আত্মজ্ঞানও আসবে না। কারণ আত্মজ্ঞানে যাওয়ার একটা পদ্ধতি আছে।

যিনি ঠিক ঠিক জানতে চাইছেন এক বই আর কিছু নাই, তিনি এখন যে পরিস্থিতিতেই থাকুন, যে চিন্তা-ভাবনা নিয়েই থাকুন, এই যে ধ্যান ধ্যান খেলবেন, যে খেলা তাঁর তমোগুণকে কাটাবে, রজোগুণকে কাটিয়ে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং এটাই তাঁকে টেনে নিয়ে চলে যাবে অদ্বৈতমে। যদি ঠিক ঠিক এই ভাব থাকে, অদ্বৈতম্, এই ভাব যদি সত্যি সত্যি থাকে, তাহলে কেন আপনি অপরকে কষ্ট দিতে চাইবেন? এখনও আপনি সত্যটা দেখেননি সেইজন্য আপনি বহু দেখছেন। মানুষ রূপে তার একটা ব্যক্তিত্ব আছে, তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন। সে আপনারই রূপ, কেন তাকে কষ্ট দিতে চাইছেন? তাকে কষ্ট দেওয়া আর নিজেকে কষ্ট দেওয়া সমান। যতজনকে পারুন খুশী করুন, যতজনের চোখে জল দেখছেন, মুছে দেওয়ার চেষ্টা করুন।

খুব সংক্ষেপে, যদি আপনি মনে করেন, এক বই আর কিছু নাই, ঠাকুরের এই কথা সত্য; যদি আপনি মনে করেন পরব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি এক, যদি আপনি মনে করেন অদ্বৈতম্ই সত্য, কারণ ঠাকুর বলেছেন, এটাকে সত্য বলে যদি মনে করেন, তাহলে তার implications আছে। সত্যটা তখন কি রূপ ধারণ করে? যেখানে দেশ, কাল, পাত্র বলে কিছু নেই; কার্য-কারণ বলে কিছু নেই; কর্ম বলে কিছু নেই। কি আছে? শুধু আপনি। কিন্তু আমি আছি এটা বলা যাবে না। কারণ আমি আছি বললেই সেখানে এক-এর সঙ্গে দুই-এর ভাব আসে। সেইজন্য বলছেন বোধে বোধ করা। এই সত্য বোধে বোধ হয়, এখানে এক-এর সঙ্গে দুই আসে না। খুব সংক্ষেপে বলা হল অদ্বৈত জিনিসটা কি। এখানেই এই পরিচ্ছেদ শেষ। এরপর শুরু হয় দশম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ

বেলঘরের ভক্তসঙ্গে

বেলঘরে থেকে আবার গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় এসেছেন। গোবিন্দ একজন গায়ককে সঙ্গে এনেছেন, যাঁর ‘জাগ জাগ জননি’ এই ষট্চক্রের গান শুনে ঠাকুর একদিন সমাধিস্থ হয়েছিলেন। সাধনা করতে করতে কুণ্ডলিনী যখন জাগ্রতা হন তখন তিনি এক-একটা স্থান ভেদ করতে করে উপরের দিকে উঠে আসেন।

একটা দুটো গান করার পর গায়ক ষট্চক্রের গান গাইছেন –মূলাধারে নিদ্রাগত কতদিন গত হল কুলকুণ্ডলিনী। ঠাকুর এই গানের উপর কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –এই গানে ষড় চক্র ভেদের কথা আছে। ঈশ্বর বাহিরেও আছেন, অন্তরেও আছেন। ষড় চক্র ভেদ হলে মায়ার রাজ্য ছাড়িয়ে জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়। এরই নাম ঈশ্বরদর্শন।

বাইরেও ঈশ্বর, অন্তরেও তিনি; এই অনুভূতি একমাত্র অদ্বৈত দিয়েই হয়, দ্বৈত ভাবে হয় না। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা। এই যে এতক্ষণ বর্ণনা করা হল, তিনি কিভাবে 'আমি' রেখে দিয়েছেন। এটাই যখন আমার আপনার স্তরে আসে তখন কি রকম হয়? তিনি ভিতরে থেকে মনের নানা অবস্থা করেছেন। কি আশ্চর্যের, স্বয়ং অন্তর্যামী রূপে সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ ভিতরে বসে আছেন, আর বসে বসে তিনি মনের নানা অবস্থা করে দিচ্ছেন। এই নানা অবস্থা করে দেওয়ার জন্য কখন আমরা হাসছি, কখন কাঁদছি। আপনারা হয়ত দেখে থাকবেন, মন যখন দুঃখে থাকে তখন দুঃখের গান শুনতে খুব ভাল লাগে। বাচ্চারা সব সময় আনন্দে থাকে, ওদের জন্য তাই সব সময় ঝিংচাক ঝিংচাক গান বাজাতে হয়। দুঃখের গান বাজালে বাচ্চারা বলতে শুরু করবে, 'এ কি গান চালালে, আর কোন গান পেলে না'!

মানুষের জীবনটা দুঃখে ভরা, দুঃখের গান আর তাদের জীবন এক সুরে বাঁধা। গ্রীক ট্রাজেডিস খুব নামকরা। দুঃখের সিনেমা দেখে চোখের জল ফেলাতে কি আনন্দ। আবার যদি দেখে নায়ক-নায়িকার মিলন হল না, তখন চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলে, যাক গিয়ে, আমি তো আমার জীবনের নায়িকাকে পেয়েছি। আর সত্যিই যার জীবন থেকে নায়িকা চলে গেছে সে আরও একটু বেশি কাঁদে। মনের যেমন অবস্থা, বাইরেও ঠিক সেই অবস্থা। আমি এক সময় দেওঘরে বিদ্যাপীঠে ছিলাম। ওখানে ক্লাশ সিক্স কি সেভেনের একটি ছাত্র ছিল। আমাদের স্কুলে যত প্রোগ্রাম হত, ঠাকুর, স্বামীজীর জন্মোৎসব, পনেরই অগস্ট, ছাব্বিশে জানুয়ারী যত প্রোগ্রম হত, সব প্রোগ্রমে ছাত্রটি একটা বিপ্লবের কবিতা আবৃত্তি করবে। ওর নামই হয়ে গিয়েছিল বিপ্লবী কবি। একদিন শুনছি, ওর এক সিনিয়র ওকে বলছে, 'আর একদিন শুনি যে তুই বিপ্লবের কবিতা আবৃত্তি করছিস, তোর কানটা মুলে দেব'। যে অনুষ্ঠানই থাকুক, ও একটা বিপ্লবের কবিতা শোনাবে। ঠিক তেমনি কাউকে যদি দেখেন সব সময় বিরহে ডুবে আছে বুঝবেন সেখানে গিয়েই সে আনন্দ পাচ্ছে। শ্রাদ্ধবাড়িতে বাচ্চারা লাড়েলাপ্পা গান চালালে বড়রা বিরক্ত হয়ে যাবেন। কারণ আমাদের মনের ভিতরে যে রকম অবস্থা, বাইরেও আমরা সেই রকম দেখতে চাই।

আপনার আজকের যে অবস্থা, আপনার পারিপার্শ্বিক যে অবস্থা তাতে আপনি কি দুঃখে আছেন? আপনি কি কষ্টে আছেন? আপনার জীবনে কি কোন দুঃখ-কষ্ট আছে? একবারও কি ভেবে দেখেছেন কেন আপনার দুঃখ-কষ্ট হবে? *একৈবাহং জগত্যত্রা দ্বিতীয়া কা মমাপরা,* আমি ছাড়া তো জগতে কিছু নেই। এক বই আর কিছু নাই। আপনিই এই পরিস্থিতিটা চেয়েছিলেন। আপনি কে? আপনি হলেন আপনার অন্তর্যামী। অন্তর্যামী মনের সেই অবস্থা করে দিয়েছেন, কারণ আপনিই ওটা চেয়েছেন। তুমি ওটাই পাবে যেটা তুমি চেয়েছ। কিভাবে চেয়েছ? প্রাণপন দিয়ে, আকুল হয়ে চেয়েছ। কান্নাকাটি ওটারই অঙ্গ। একজন ভাল অভিনেতা মৃত্যুর একটা দৃশ্যে অভিনয় করছে, আর সেই সময় হঠাৎ তার হার্ট এ্যাটাক হয়ে গেল। লোকেরা জোর হাততালি দিয়ে উপভোগ করছে, কি দারুণ অভিনয়। কেউ বুঝতে পারছে না যে লোকটা সত্যিই মরে যাচ্ছে। জুনিয়র হুডিনি নানা রকম খেলা দেখাত। একবার জলের মধে বন্ধ হয়ে খেলা দেখাচ্ছিল তখন কিভাবে ওর খাঁচগুলো খুলে গেছে। সে তখন ছটফট করতে লাগল, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, জলের তলায় ডুবে যাচ্ছে, কোন কিছুই ঠিকঠাক কাজ করছিল না। লোকেরা খুব জোর হাততালি দিয়ে যাচ্ছে, কি দুর্ধর্শ অভিনয়। কিন্তু তার স্ত্রী বুঝতে পেরে গিয়েছিল যে স্বামী তার জলের গভীরে তলিয়া যাচ্ছে। শুধু তার স্ত্রী বুঝতে পেরেছিল কি হতে চলেছে, স্ত্রী চেঁচাতে লাগল। তার কাঁচ আবার এমন যে খোলা যাচ্ছিল না, বড় বড় হাতুড়ি দিয়ে ভাঙা হল। শেষ পর্যন্ত মারা গেল, বাঁচার কোন পথ ছিল না।

আমাদের জীবন এই রকমই। আমরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছি; তা ভাল হোক বা মন্দ হোক, আসলে আমরা এটাই চেয়েছি, মনপ্রাণ দিয়ে চেয়েছি। মানুষ যেমন সিনেমা দেখতে ভালবাসে, সিনেমাতে কাঁদতে ভালবাসে। অভিনয়ে যেমন চেঁচিয়ে বলে, আমার এটা লাগবে না, লাগবে না। পরমব্রহ্মের দৃষ্টিতে এটাই। আপনি যদি চান, আমার এই দৃশ্য আর লাগবে না, এই সিনেমায় শুধু

কান্নার দৃশ্য, বিরহের দৃশ্য; এবার চল একটা ভাল সিনেমা গিয়ে দেখি। যান তাই গিয়ে দেখুন, পরিবর্তন করতে আর কতক্ষণ লাগবে। নিজের চিন্তা-ভাবনা পাল্টাতে চাইলে পাল্টে যাবে।

সঙ্গীতে যেমন রাগ-রাগিণীর খেলা হয়, হিন্দু ধর্ম ঠিক তাই, হিন্দু ধর্মে এত রকমের জিনিস আছে যে আমরা কল্পনাও করতে পারব না। শুধু যে একটা পোঁ ধরে আছে হিন্দু ধর্ম তা নয়। হিন্দু ধর্ম হল ধর্মের যে রাগ-রাগিণী তার খেলা। হিন্দু শাস্ত্রগুলিকে মোটামুটি চারটে শ্রেনীতে বিভাজন করা হয়। প্রথমটা হল উপনিষদ, গীতা। দ্বিতীয় হয় রামায়ণ মহাভারত, রামায়ণ বলতে বাল্মীকি রামায়ণ; আর তার সঙ্গে পুরাণ, বলাই হয় ইতিহাস পুরাণ। তৃতীয় হয় তন্ত্রশাস্ত্র আর চতুর্থ হল স্মৃতিশাস্ত্র। যদিও এনারা সবাই মোটামুটি একই কথা বলছেন, তারপরেও কিছু কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা করার সময় একটু যেন তফাৎ থেকে যায়।

ধর্ম দর্শনে বা যে কোন দর্শনে তিনটে জিনিস লাগে –জীব, জগৎ আর ঈশ্বর। যে কোন ধর্মে যদি যান, যে কোন দর্শনে যদি যান, বিজ্ঞানে যদি যান, যেখানেই যান, এই তিনটে জিনিসকে নিয়ে সবাইকে বলতে হয়। জীব কি, জগৎ কি, ঈশ্বর কি। এই তিনটেকে যদি ব্যাখ্যা করা না হয়, ওটাকে তাহলে আর দর্শন বলা যাবে না। যেমন গণিত, গণিত এগুলোকে ব্যাখা করতে পারবে না; গণিতজ্ঞ বলে দেবেন, জীব, জগৎ ও ঈশ্বর আমার ব্যাপার না। ইদানিং একটা বিষয় এসেছে –philosophy of science, philosophy of mathematics। ইতিহাস-দর্শনও খুব নামকরা বিষয়। ওনারা দেখাতে চান আমরা কি চাইছি, কিন্তু যে অর্থে আমরা ঠিক ঠিক ফিলজফি বলি, সেই অর্থে এগুলোকে ফিলজফি মনে করা যায় না, যেমন জ্ঞানের অর্থে হয় না। এনারা বলবেন, ভাই আমাদের লাগবে না, আমরা এতটুকু নিয়ে আছি। কিন্তু ফিলজফি বললে, তাকে জীব, জগৎ আর ঈশ্বরকে নিয়ে বলতেই হবে।

যেমন মার্ক্সীয় দর্শন বলবে, দেহ ব্যতিত আমরা কোন আত্মাকে মানি না, ঈশ্বরকে আমরা মানি না। এটা বলছেন না যে, আমার দরকার নেই, বলেই দিচ্ছেন আমরা মানি না; তাঁদের মতে আত্মা, ঈশ্বর বলে কিছু নেই। এই মতবাদকে বলে বস্তুবাদ বা matterialism। একজন ভদ্রলোকের ভুলভাল একটা লেখা আছে, যেখানে বলছেন –ম্যাটেরিয়ালিজম্ একটা ফিলজফি, যার কাছে ম্যাটার অর্থাৎ পদার্থই শেষ কথা। এনারাই পদার্থবাদী।

আমাদের চার ধরণের শাস্ত্রের যে কথা বলা হল, এনারা সবাই কিন্তু এক বাক্যে বলছেন, ঈশ্বইর সত্য বাকি সব মিথ্যা। মিথ্যা বলতে এখানে যেটা সাময়িক। কিন্তু জীবের যে ব্যাখা, জগতের যে ব্যাখ্যা আর ঈশ্বরের যে ব্যাখ্যা, এই তিনটের সাথে এক-অপরের যে সম্পর্ক, এখানে এসে একটু তফাৎ হয়ে যায়। এর মধ্যে আরও দর্শন আনা হয়, যেমন যোগদর্শন, বর্তমানকালে সবাই যোগ না বলে 'যোগা' বলে। এখানকার জিনিস বিদেশে যায়, সেখান থেকে প্যাকেজ হয়ে আসে। প্যাকেজ থেকে বেরিয়ে যোগ 'যোগা' হয়ে যায়, কর্ম 'কার্মা' হয়ে যায়। আমাদের পরম্পরায় যোগা বলে কোন শব্দই নেই। যাই হোক, যোগদর্শনে জীব-জগৎ-ঈশ্বরকে নিয়ে তাদের নিজস্ব একটা ব্যাখ্যা আছে। তার সাথে আছে বেদান্তদর্শন, বেদান্তীদেরও আবার অনেক রকম ব্যাখ্যা আছে। ফলে হিন্দুদের অনেক মত হয়ে যায়। আমরা যখন একটা মতকে নিয়ে চলি, যেমন যাঁরা উপনিষদ পড়াশোনা করেন, তাঁরা উপনিষদ নিয়ে আছেন, ওনাদের একটা অন্য ধরণের ধারণা তৈরী হয়। ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য হল, এই যে এত রকমের ধর্মদর্শন, এত রকমের পথ, কিন্তু সব কটা মত ও দর্শনকে ঠাকুর একটা জায়গায় নিয়ে আসছেন। ফলে হিন্দু ধর্মকে বোঝা যতটা কঠিন, ঠাকুরের কথামৃত বোঝা ততটাই কঠিন। যদি কথামৃত কেউ বুঝতে চান, তাঁর হিন্দু ধর্মের সব কটা শাস্ত্রের একটু জ্ঞান থাকা দরকার।

কিছু দিন আগে এক ভদ্রলোক কমেন্ট বক্সে লিখলেন, কথামৃতের ব্যাখ্যায় এত কিছু বলার কি দরকার? একবার ভাবলাম বলি যে, যা বলছি খুব কমই বলছি। স্বামীজী বলছেন, ঠাকুরের এক-একটি কথাকে নিয়ে এক-একটি বই লিখে দেওয়া যায়। সেই তুলনায় আমি তো অনেক কম বলছি। ঠাকুরের

কথামৃত মানে সম্পূর্ণ হিন্দু ধর্ম। অন্যান্য ধর্মে একটা চটি বইতে ওদের ধর্মের সবটাই বলে দেওয়া যায়। হিন্দু ধর্মে সেটা সম্ভব হবে না, হিন্দু ধর্ম একটা পুরো লাইব্রেরি। আর সেই হিন্দু ধর্মের সমস্ত শাস্ত্রকে ঠাকুর একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এলেন। সমস্ত বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, যোগ সব কটাকে গুছিয়ে ছোট্ট একটা ছবিতে দাঁড় করান, সেটাই হয়ে যাবে কথামৃত। একটা ম্যাগনিফাইং লেন্স দিয়ে এটাকে আপনি বড় করতে শুরু করুন, যত ম্যাগনিফাই করবেন, দেখবেন ওর পিছনে আরও আছে, তার ভিতর আরও আছে; যার জন্য কথামৃত বোঝা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

আমরা আবার কথামৃতের মূল আলোচনায় ফিরে আসছি। 'জাগ জাগ জননি মূলাধারে নিদ্রাগত কতদিন গত হল কুলকুণ্ডলিনী', এই গানটি শুনে ঠাকুর বলছেন, এই গানে ষড় চক্র ভেদের কথা আছে। এর আগে আমরা এর উপর আলোচনা করলাম। তিনি ভিতর থেকে মনের নানা অবস্থা করছেন, এই ভাব ভক্তিমত থেকে আসে। পুরাণাদিতে অনেকবার এই কথাটা আসে। রাজযোগের ক্লাশে যোগশাস্ত্রের উপর আমরা আগে যে আলোচনা করেছিলাম, যেখানে যোগের সার, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধ নিয়ে বলা হয়েছে, সেখানেও আমরা এটাই আলোচনা করেছিলাম যে, মনে যে ভাবনাগুলো উঠছে, তা সে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে দিয়েই আসুক বা স্মৃতি দিয়েই আসুক, স্বপ্ন দিয়েই আসুক, কল্পনা দিয়েই আসুক যেভাবেই আসুক না কেন; এই যে মনে সব সময় জ্ঞান হচ্ছে, আগে এটাকে পুরো শান্ত করে দিতে হবে। কেন চিত্তের মধ্যে এ-রকম বৃত্তি হচ্ছে? যোগ পরিষ্কার বলছেন, পুরুষ আর প্রকৃতি আছে, পুরুষ হল চৈতন্য সত্তা আর প্রকৃতি হল শক্তি, শক্তি নিজে জড়। তাহলে দাঁড়াল চৈতন্য আর এনার্জি। আমরা ব্রহ্ম আর শক্তিও বলতে পারি; কিন্তু যোগে যেহেতু ব্রহ্ম শব্দ নেই, আত্মা শব্দ নেই; সেইজন্য ব্রহ্ম না বলে আমরা চৈতন্য বলছি। এখন এই চৈতন্য আর শক্তির যে মিলন, শক্তি নিজে জড়; চৈতন্যের সাথে জড়ের মিলন, চিজ্জড়গ্রন্থি যখন হয়, তখন মনে হয় জড়ের নিজস্ব জীবন আছে। সেখানে আত্মা বা পুরুষ আছেন; তাঁর উপস্থিতিতে মন নানান রকম খেলা করছে। কিন্তু এটাকে আমরা নিজেরা ভাবছি।

আপনি যদি কোন বৈজ্ঞানিকের কাছে যান, যদি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, মন কি? বৈজ্ঞানিকরা মনকে ব্যাখ্যা করবেন না, বদলে তাঁরা আমাদের যে ব্রেন আছে সেই জিনিসটার ব্যাখ্যা করবেন, মস্তিষ্কে নিউরোনগুলো কিভাবে কাজ করে আপনাকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দেবেন। এর অর্থ হল, যখনই আমরা ইন্দ্রিয়ে দিয়ে কোন জ্ঞান পাই, এটাই আমাদের শেষ কথা। আর এই যে পুরুষ, যোগে যাঁর কথা বলা হয়েছে, এর একটা নামকরা কথা আছে –সাংখ্যের পুরুষ; সাংখ্যের পুরুষ মানে একটা অপদার্থ। বেশির ভাগ পুরুষগুলো যেমন অপদার্থ, তেমনি অপদার্থ, সাংখ্যের পুরুষ কিছু করবে না, যা কিছু করার সব প্রকৃতি করবে। ঠাকুরের কথায় কুমড়ো কাটা বট্‌ঠাকুর, যে কিনা সারাদিন কোন কাজকর্ম করবে না, বসে বসে কেবল ভুরুর্‌ ভুরুর্‌ করে তামাক খেতে থাকে, মানে কোন কিছুতে সে জড়ায় না। অন্য দিকে প্রকৃতি একজন আদর্শ গৃহিণীর মত, যে কিনা সংসারের সব কাজ করে যাচ্ছে।

ঠাকুর কিন্তু এখানে সেই কথা বলছেন না; ঠাকুর শুধু বলছেন, তিনি ভিতরে থেকে মনের নানা অবস্থান করছেন। এই কথা শোনার পর ঈশ্বরকে কেমন দুষ্টু দুষ্টু বলে মন হয়, বাইরেও তিনি আছেন ভিতরেও তিনি আছেন, আর ভিতরে থেকে তিনি মনে আগুন লাগিয়ে রেখেছেন। মনে আগুন লাগানোর মধ্যে আমি বোধটুকু রেখে দিয়েছেন, আর মাঝখান থেকে আমরা সেই আগুনে জ্বলেপুড়ে মরছি। আমি মনে করছি আমার ত্রাণ চাই, আমি মনে করছি আমার ভালবাসা চাই। আমরা চাইছি আমাদের কষ্ট নিবারণ হোক। প্রার্থনা করছি, হে ভগবান তুমি আমাদের কষ্ট নিয়ে নাও, হে ঠাকুর আমার কষ্ট লাঘব কর। গোলমালটা করে রেখেছেন ভগবান নিজে। ধর্মজ্ঞানের ব্যাপারে যারা কাঁচা, তারা এই জায়গাতে এসে বলবে, এ তো গড্‌ না একে তো একজন গডফাদার মনে হচ্ছে। বিদেশে গডফাদার হয়, ভারতে এসব হয় না। গড্‌ফাদার বলতে বড় একজন গুণ্ডা বা গুণ্ডাদের দলপতি। আগুন লাগিয়ে দেবে, দিয়ে বলবে, হপ্তা দাও তা নাহলে শান্তিতে থাকতে দেব না। ভারতে এসব ঝামেলা এখনও পর্যন্ত কম আছে। তবে একেবারে যে নেই তা না, কিছু কিছু জায়গায় আছে। গড্‌ কম, গড্‌ফাদার বেশি বলে মনে হয়।

ভগবান বলছেন, আমি আমার সন্তানকে পাঠিয়েছি তোমাদের পাপ নিয়ে নেবে বলে, যাতে তোমরা স্বর্গে যেতে পার। আপনি যদি বলেন, 'প্রভু, আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না'। 'তাহলে তোমাকে নরকে পাঠানো হবে'। 'কত দিনের জন্য পাঠাবেন প্রভু'? 'অনন্তকালের জন্য'। ইনি কি গড্ না গড্ফাদার? ঠাকুর যখন বলছেন, তিনি ভিতর থেকে মনের নানা অবস্থা করছেন; তার মানে তিনিই মনে কামনা-বাসনাগুলো দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন। যতগুলো এ্যব্রাহামিক ধর্ম আছে, যতগুলো দ্বৈতবাদী ধর্ম আছে, সবারই এই সমস্যা। ভগবান সর্বশক্তিমান, ভগবান সর্বজ্ঞ, তিনি সব কিছু জানেন। আমি পাপ করছি, ভগবান জানেন। আমরা কথায় কথায় বলি না, পাপ করো না, তিনি সব দেখছেন। তিনি সর্বজ্ঞ, আমি যে পাপ করব, তিনি আগে থেকেই জানেন। হিন্দুরা তাও বলবে, তুমি যে কর্ম করেছ, কর্মের সাজা তুমি পাবে। কিন্তু খ্রিশ্চানিটিতে বা ওদের যে ভাইরা আছে তারা বলবে, তুমি দোষ করেছ তাই নরকে যাবে। ভগবান আগে থেকেই জানতেন আমি দোষ করব, ভগবান সর্বশক্তিমান, তিনি তো আমাকে আটকাতে পারতেন। জেনে শুনে তিনি আমাকে ভুল পথে যেতে দিলেন যাতে আমি নরকে যাই। নরকে কি জনসংখ্যা কমে গেছে যে আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া দরকার হচ্ছে?

যুক্তিতে এই ধর্মগুলো তাই দাঁড়ায় না। যুক্তিতে দাঁড়াতে পারছে না বলে, পাশ্চাত্যে বহু লোক খ্রীশ্চান ধর্ম ছেড়ে দিচ্ছে, চার্চমুখী হওয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে ঠাকুর যে বলছেন, তিনি ভিতর থেকে মনের নানা অবস্থা করছেন, এই কথাটাও তো ওদের সেই একই কথা বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু না, একই কথা না। কথামৃতেরই অন্য এক জায়গায় আছে, যেটা আমরা পেরিয়ে এসেছি। যেখানে ঠিক এই ধরণের কথা হতে গিয়ে একজন ভক্ত বলছেন, কিন্তু আমাদের প্রাণ তো যায়। তখন ঠাকুর তাঁকে বলছেন –তুমি মান আর নাই মান, তুমি সেই রাম। অবস্থাটা কার খারাপ হচ্ছে; ভগবান ছাড়া তো কিছু নেই। অবস্থা খারাপ ভগবানরই হচ্ছে, কারণ আমি আপনি কোথাও নেই। অত্যন্ত সাধারণ এই একটা পয়েন্টকে যদি বুঝে নেওয়া যায়, তাহলে হিন্দু ধর্মের যে প্রাণ, সেটাকে বুঝে নিতে আর কোন অসুবিধা হবে না। প্রথম পয়েন্ট, হিন্দু ধর্মে ঈশ্বর বই আর কিছু নেই। তিনিই জীব, তিনিই জগৎ, তিনিই পশু, তিনিই পাখি, তিনিই প্রাণ, তিনিই পাথর, তিনিই সব কিছু। আবার তিনিই আমাদের সবার মন। মনের পিছনে যে সত্তা মনকে ঘোরাচ্ছে, সেটাও তিনি। তিনি যত কিছু হয়েছেন, সব কিছুর মধ্যে তিনি 'আমি' রেখে দিয়েছেন। এই 'আমি' জিনিসটাকে কেন্দ্র করে আমি, আপনি সবাই কেঁদে মরছি।

এই জিনিসটাকে বুঝতে হলে আমাদের ভগবান বিষ্ণু ও নারদের সেই গল্পে যেতে হবে, যেখানে নারদ ভগবানের কাছে মায়া জিনিসটা কি জানতে চাইছেন। স্বামীজীও এই গল্প বলেছেন। ভগবান আর নারদ ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসেছেন। ভগবান নারদকে বলছেন, আমার খুব জলতেষ্টা পেয়েছে, দেখ তো কোথাও একটু জল পাও কিনা। ভগবানের কি জলতেষ্টা পেতে পারে? জানা নেই, তবে এটা কাহিনীর জন্য বলা হচ্ছে। যাই হোক, নারদ জল আনতে বেরিয়ে গেলেন। একটা বাড়িতে গিয়ে জল চাইলেন। এক যুবতী জল নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। সেই যুবতীকে দেখে নারদ মুগ্ধ ও মোহিত, সেখান থেকে বিয়ে, বিয়ে থেকে সন্তানাদি, সংসার দাঁড়িয়ে গেল। সেই দেশে এলো এক ভয়ঙ্কর বন্যা, এক এক করে তাঁর সন্তানরা হাতছাড়া হয়ে বন্যার জলের তোড়ে ভেসে যেতে লাগল। স্ত্রীকে তখনও শক্ত করে ধরে আছে, কিন্তু সেও শেষে জলের প্রবল স্রোতে ভেসে অদৃশ্য হয়ে গেল। নারদ ওখানেই হাউ হাউ করে কাঁদছেন। ভগবান তখন বলছেন, নারদ তোমাকে তো জল আনতে পাঠিয়ে ছিলাম, এতক্ষণ কি করছিলে? আমাকে জল দাও। নারদ অবাক হয়ে দেখছেন, তাই তো কোথাও কিছু নেই। তাহলে এতক্ষণ কি হচ্ছিল আমার সাথে? এই সেই লীলাখেলা, এই লীলাখেলার সাথে আমি আপনি সবাই জুড়ে যাচ্ছি।

আমরা সবাই ভাল-মন্দ কিছু না কিছু স্বপ্ন দেখি, আর সেই স্বপ্নের সাথে নিজেদের জুড়ে দিই। ভাল স্বপ্ন দেখলে সকালে উঠে খুব ভাল লাগে আর খারাপ স্বপ্ন দেখলে মনটা বিষন্ন হয়ে যায়। কিন্তু

জুড়ে তো থাকছে ‘আমি’। সিনেমা দেখছি, সবাই জানি যে সবটাই অভিনয়, কোনটাই সত্য না। সিনেমার কাহিনী যদি বিয়োগান্তক হয় তখন সিনেমার চরিত্রের সাথে এক হয়ে চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। ধর্ম জীবনে এটাই রহস্য। আমাদের সমস্ত সাধনার মূল হল, আমি নিজেকে ‘আমি’ মনে করছি, এই ‘আমি’টাকে মুছে দেওয়া। এখানে সত্য মিথ্যা বলার কিছু নেই, আসলে এই ‘আমি’টাই আদপে নেই। যেটা নেই সেটাকে আপনি কোথা থেকে সরাবেন? হিন্দু ধর্মের শেষ কথা এখানে দাঁড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র তিনিই আছেন, তিনিই সব কিছু হয়েছেন; তবে সেখানে তিনিও আছেন। কিন্তু একটা জিনিস তিনি বাস্তবিক সৃষ্টি করেছেন সেটা হল ‘আমি’। কিন্তু তিনি ছাড়া তো কিছু নেই, এই ‘আমি’টাও তিনি। কিন্তু বোধ করিয়ে দিচ্ছেন, আমি আর তিনি যেন আলাদা।

যিনি এক, তিনি এখন দেখাচ্ছেন বহু হয়ে। এর জন্য আমরা অনেক উদাহরণ ব্যবহার করি। ফ্রীজে বরফ তৈরী করার জন্য আইস ট্রে রাখা থাকে। তাতে জল ঢেলে দেওয়া হল। কিছুক্ষণ পর ট্রেতে যে খোপ খোপ থাকে তাতে অনেক আইস কিউব তৈরী হয়ে গেল। সব কটা বরফ আলাদা আলাদা। আসলে আলাদা কি? কিছুই আলাদা না, সবটাই জল। সাধনা মানে এই ‘আমি’টাকে মিথ্যা বানিয়ে দেওয়া। সংসারে দুঃখ-কষ্ট সবারই আছে। আমাদের কাছে অনেকেই এসে মন খারাপ করেন এবং নিজের দুঃখের কাহিনী শোনান। বিভিন্ন কারণে তাঁদের মন খারাপ। কারুর সেটার জন্য মন খারাপ, কারুর ওটার জন্য মন খারাপ। আবার বলবে, আপনি একটু আশীর্বাদ করবেন। আমি আশীর্বাদ করলে হয়ত ওটা ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তারপরেই আবার আর-একটা জিনিস নিয়ে মন খারাপ হতে শুরু হয়ে যাবে। তারপর আর-একটা জিনিস নিয়ে মন খারাপ হবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এগুলো সমস্যা না, কামিনী-কাঞ্চন সমস্যা না; আসল সমস্যা হল ‘আমি’। মজার ব্যাপার হল ‘আমি’ বলে কিছু নেই, ফলে তাড়ানো মুশকিল। বাস্তবে যদি ‘আমি’ থাকত, তাহলে তাড়ানোর চেষ্টা করা যেত। কিন্তু যে জিনিসটা আদপেই নেই, সেই জিনিসটাকে তাড়াবেন কি করে?

একটা সুন্দর কথা আছে –তোমার এই সমস্যা ঠিক করে দেওয়া যাবে, তোমার এই ঝামেলা মিটিয়ে দেওয়া যাবে; কিন্তু মনের ভিতরে তোমার যে শঙ্কা, সন্দেহ বাসা বেঁধে রয়েছে সেগুলোকে কেউ সরিয়ে দিতে পারবে না। সন্দেহ-বাতিক লোকেদের সমস্যা মেটানো খুব মুশকিল। আজকে সে আপনাকে নিয়ে সন্দেহ করছে, আগামীকাল আর-একটা জিনিসকে নিয়ে সন্দেহ করবে, তার আসল জিনিসটা নেই। বাচ্চারা একা একা রাত্রিবেলা শুতে গেলে ভূত দেখে। বিদেশীরা মনস্টার দেখে। একটা গল্পে আছে, ছোট বাচ্চা কালভিন রাত্রিবেলা ভয়ে কত কাণ্ড করে। মনস্টার নেই তো তাকে তাড়াবেন কোথা থেকে? ভূত নেই, ভূত তাড়াবেন কোথা থেকে? ‘আমি’ নেই তাড়াবেন কোথা থেকে? যার জন্য সাধনপথ এত কঠিন। যাঁরা বলেন আকাশ থেকে তারা খসিয়ে নিয়ে আসব, যাঁরা বলেন চাঁদে চলে যাচ্ছেন, মঙ্গলগ্রহে চলে যাবেন বলছেন, তা চলে যেতে পারেন; কারণ এগুলো বাস্তবিক। এগুলোকে জয় করা কিছু না, কিন্তু ‘আমি’কে জয় করা সত্যিই কঠিন। কারণ ‘আমি’টাই তো নেই।

মায়া দ্বার ছেড়ে না দিলে ঈশ্বরদর্শন হয় না। এই মায়াটাই তো ‘আমি’। মায়া মানে যে এককে বহু দেখিয়ে দিচ্ছে। ‘আমিত্ব’ এককে বহু দেখিয়ে দেয়। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখতে গিয়ে প্রথমে এটাই বললেন, *যুস্মদ্ প্রত্যয় অস্মদ্ প্রত্যয়* –তুমি-আমি বোধ, এটাই মায়া, এছাড়া মায়া বলতে কিছু নেই। ঈশ্বর বই কিছু নাই, অথচ দেখাচ্ছে বহু। ‘আমি’ বলে কিছু নেই অথচ দেখাচ্ছে আমি সত্য। আপনারা যাঁরা শুনছেন, আপনাদের কি কখন মনে হয়, আপনার ‘আমি’ সত্য না। ‘আমি’ সত্য না হলে আপনারা শুনেবনই বা কেন। এই মায়া নিজে দ্বার না ছেড়ে দিলে, অর্থাৎ আমিত্বটা যদি না চলে যায় ঈশ্বরদর্শন সুদূর পরাহত। এটাকেই বলে ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করা। ছায়ার সঙ্গে কি কখন কুস্তি করা যায়? করা যায় না।

ঠাকুর তুলসিদাসের রামচরিতমানস থেকে উদাহরণ দিচ্ছেন। হিন্দি বেল্টে এই কাহিনী খুব প্রচলিত। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা একসাথে বনের পথ ধরে যাচ্ছেন। রাম এগিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর পিছনে সীতা, সীতার পিছনে লক্ষ্মণ। বাল্মীকি রামায়ণের বর্ণনা পুরো উলটো। **যেমন সীতা মাঝে থাকাতে –লক্ষ্মণ রামকে দেখতে পাচ্ছেন না, তেমনি মাঝে মায়া থাকাতে জীব ঈশ্বরকে দর্শন করতে পাচ্ছে না**। তুলসীদাস ভক্তিমতের, খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন –আগে রাম লখন তনু পাছে; তারপরেই বলছেন, উভয় বিচ্ সিয় সোহতি ক্যাইসি, ব্রহ্ম বিচ্ জীব মায়া জ্যাঈসি। রাম আর লক্ষ্মণের মাঝখানে সীতাকে কেমন দেখাচ্ছে? ব্রহ্ম আর জীবের মাঝখানে যেমন মায়া। সেইজন্য মাঝে মাঝে সীতা পথ ছেড়ে দিচ্ছেন, তা নাহলে লক্ষ্মণ রামের মুখ দেখবেন কি করে!

(মণি মল্লিকের প্রতি) তবে ঈশ্বরের কৃপা হলে মায়া দ্বার ছেড়ে দেন। যেমন দ্বারওয়ানরা বলে, বাবু হুকুম করে দিন –ওকে দ্বার ছেড়ে দিচ্ছি।

আবার সেই একই জিনিস এসে গেল। গড্ না গড্ফাদার? ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন মায়া তখন পথ ছেড়ে দেবেন। কিন্তু ঈশ্বর বই তো কিছু নেই, সেইজন্য আমাদের ঈশ্বর গডফাদার নন। অন্যান্য ধর্মে হতে পারেন। যদি আপনি জীবকে সত্য মনে করেন, 'আমি'কে সত্য মনে করেন, তখন এটাই বিরাট সমস্যার ব্যাপার হয়ে যাবে। সমস্ত দ্বৈতবাদীর কাছে এই সমস্যা হবে। আমাদের এখানে প্রচুর দ্বৈতবাদী আছে, এখন একটা হয়েছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে বেড়াচ্ছে –কৃষ্ণই একমাত্র ভগবান, কৃষ্ণ ছাড়া গতি নাই। এরা বোঝেও না যে এদের চিন্তা-ভাবনা কত এলেমেলো। জীব আর ব্রহ্মকে আপনি যদি সত্য বলে মনে করেন, তার সঙ্গে জীব আলাদা আর ব্রহ্ম আলাদা মনে করেন, দর্শনের দিক থেকে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কারণ সব কিছু তাঁর ইচ্ছাতে হচ্ছে, ঈশ্বর ইচ্ছা করলে মায়া পথ ছেড়ে দিচ্ছেন। তাহলে তো তিনি ছেড়ে দিলেই পারেন? কেন তিনি ছাড়বেন? তুমি কি আলাদা কিছু, তুমি আর উনি তো এক; উনি নিজের আনন্দে খেলা করছেন। সমস্যা হল, আপনি ওটার সাথে নিজেকে জুড়ে রেখেছেন।

একটা খুব ভাল বই আছে 'জাদুওয়ালা'। খুব মোটা বই, ভারতে যত রকম জাদুবিদ্যা আছে সেগুলোকে নিয়ে লেখা। খুব মজার বই। সেখানে একটা ঘটনার বর্ণনা আছে। একজন রাজা বসে আছেন আর সেখানে ভারতের নামকরা জাদু রোপট্রিক্স দেখানো হচ্ছে। সবাই দেখছে যুদ্ধ হচ্ছে, এই হচ্ছে, সেই হচ্ছে। পাশে এক ভদ্রলোক বিদেশ থেকে এসেছিলেন, রাজার পাশে বসে খেলা দেখে যাচ্ছেন। উনি দেখে নার্ভাস হয়ে যাচ্ছিলেন। রাজা তাকে হাতটা টিপে বলছেন, শান্ত হয়ে বসুন, কোথাও কিছু নেই, কোন যুদ্ধ হচ্ছে না, কেউ মরছে না। বিদেশি ভদ্রলোক চুপ করে শান্ত হয়ে খেলা দেখতে লাগলেন। যেই কারণে এর নামই হল ইন্দ্রজাল, বেদের মন্ত্রে বলছেন, ইন্দ্র মায়াশক্তিত বহু রূপ ধারণ করেন। ইন্দ্রজাল খেলা ছাড়া কিছু না, যে এক তাকেই বহু দেখিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু মাঝখান থেকে খেলাটা যাতে ভাল জমে সেইজন্য তিনি একটা 'আমি' বোধ রেখে দিয়েছেন। তাহলে আপনি তো আপত্তি করতে পারেন যে, ভাই আমি তো কষ্ট পাচ্ছি? একবার আপনি ভেবে দেখুন, আপনি যদি সত্য হন তাহলেই আপনি কষ্ট পেতে পারেন, কিন্তু আপনি তো সত্য নন। কারণ যে বলছে, আমি কষ্ট পাচ্ছি, ওই 'আমি'টাই তো নেই। আমি জানি না, এত ভাবে আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলে যাচ্ছি, আপনাদের এই আইডিয়াটা পরিষ্কার হচ্ছে কিনা। একবার যদি আইডিয়াটা পরিষ্কার হয়ে যায়, জীবনে শান্তি এসে যাবে, ধর্মজীবন আপনার পরিষ্কার হয়ে যাবে, শাস্ত্র আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। অবতাররা যুগে যুগে এসে আমাদের বলছেন, ঋষিরা বারবার পরম্পরা ধরে আমাদের বলে যাচ্ছেন, জিনিসটাকে তোমরা বোঝ বাপু। তুমি কি এই খেলাতে থেকে গেছ? তোমার কি এই খেলা এখনও ভাল লাগছে? তাহলে তুমি চালিয়ে যাও, ভাল করে খেলা চালিয়ে যাও। সিনেমাতে সব রকমই হয়; কান্না হয়, হাসি হয়, কষ্ট হয়, মজা হয়, আনন্দ হয়, সবই হয়। তোমার সিনেমা দেখতে এখনও যদি ভাল লাগে, তাহলে দেখতে থাক, ভাল করে দেখ। আর যদি বল, আমার আর খেলা লাগবে না, বললেই যে তোমার সব কিছু হয়ে যাবে তা তো হবে না। বাবু হুকুম করলে তবে দ্বারওয়ান দ্বার ছেড়ে দেবেন।

বেদান্ত মত আর পুরাণ মত। আমাদের পরম্পরাতে অনেক মত আছে। অনেক রকম মত থাকলেও মূল ভাব থেকে কেউ আলাদা না। মূল ভাব থেকে আলাদা হলে এগুলো কখনই হিন্দু ধর্মের স্বীকৃত পথ হত না। ইদানিং কালে অনেকে আছেন যাঁরা হিন্দু ধর্মকে না ভেঙে ছাড়বেন না। এরাই বলছেন, হিন্দু ধর্ম নাকি কোন ধর্মই না, আসলে হিন্দু ধর্ম একটা জীবনধারা। কেন হিন্দু ধর্ম ধর্ম নয়? তোমাদের ধর্ম ধর্ম, আমাদের ধর্মটা ধর্ম নয় কেন বলো তো? না, তোমাদের ধর্মে অনেক ডাইভারসিটি আছে। থাকলই বা, তাতে কি হল? বেশির ভাগ গাধা একই রকম দেখতে হয়, ঘোড়া অনেক রকম হয়; তাই বলে ঘোড়া কি প্রানী না? মোষগুলো মোটামুটি একই রকম দেখতে, গরু অনেক রকম দেখতে হয়; তাই বলে মোষ আর গরু আলাদা প্রজাতি? আমাদের হিন্দু ধর্মে ভ্যারাইটি আছে, ডাইভারসিটি আছে। যে কোন দেশে দেখবেন একটি প্রজাতি, ভারতবর্ষে আমরা অনেক রকম প্রজাতি আছি। কোথায় দক্ষিণ ভারত, কোথায় কাশ্মীর, কোথায় পূর্ব ভারত; সব আলাদা। তাতে হলটা কি? তারপর বলবেন, ভারত বলে কোন দেশই নাকি কোনদিন ছিল না। ইংরেজরা এসে আইডিয়া অফ ইণ্ডিয়া দিল। এদের তর্ক দেখছেন, বলছে ভারত বলে, ইণ্ডিয়া বলে কিছু ছিল না। তাহলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কোথা থেকে এলো? আপনারা বিশ্বাস করবেন না, হিন্দু ধর্মকে, ভারতকে শেষ করে দেওয়ার জন্য কত রকম ফন্দি চলছে। ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা না থাকলে হিন্দু ধর্ম, ভারতবর্ষ দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। আমাদের ডাইভারসিটিই বৈশিষ্ট্য, মত পথ। ঠাকুর বেদান্ত ও পুরাণ মত বলছেন, কিন্তু আবার যোগ মত আছে, তন্ত্র মত আছে। এই জায়গাতে ঠাকুর দুটো মতকে নিয়ে বলছেন।

বেদান্তমতে বলে, 'এই সংসার ধোঁকার টাটি'। এটা কিন্তু বেদান্তে কোথাও নেই, প্রচলিত কথার মধ্যে আসে। বেদান্তমতে ব্রহ্মই বস্তু বাকি সব অবস্তু। ঠাকুর এই কথা অনেক জায়গায় বলছেন, যেটা বস্তু সেটাকে বুঝে নিলে সেটাকেই ধরো আর বাকি সব কিছু তৎক্ষণাৎ ত্যাগ। অর্থাৎ জগৎ সব ভুল, স্বপ্নবৎ। লোকেরা এই জিনিসটাকে ভুল বোঝে। বেদান্ত এটা বলতে চায় না যে, জগৎ নেই; যেটা বলে, জগৎরূপে তার কোন সত্তা নেই। সত্তা একমাত্র রয়েছে ঈশ্বরের। কি রকম? অনেক সময় দেখবেন, কোন নামকরা গুণ্ডা আছে, তার কতগুলো পেয়াদা আছে, পেয়াদাগুলো লাফিয়ে বেড়ায় ওই নামকরা গুণ্ডার জোরে। আমাদের পুলিশের সিপাহীগুলোদের দেখবেন, এদের কোন ক্ষমতা নেই; কিন্তু কি সাংঘাতিক ক্ষমতা। কারণ পুরো যে ভারত সরকারের যে শক্তি, সেই শক্তিতে সে দাঁড়িয়ে আছে। জগৎ বা জীব বা যে কোন জিনিস, এই যে ক্ষুদ্র কলম, এর নিজস্ব কোন সত্তা নেই, কিন্তু এর সত্তা আছে কারণ তার পিছনে ঈশ্বর, সেই ব্রহ্ম আছেন। বেদান্ত এটাই বলতে চাইছেন, কলম রূপে কোন সত্তা নেই। কলমের যদি সত্তা থাকত, তাহলে কলম চিরদিন কলম থাকত। কিন্তু আমরা জানি কলম এক সময় সৃষ্টি হয়েছে, এক সময় কলমটা ভেঙে নষ্ট হয়ে যাবে। তার মানে এর আসল সত্তা নেই।

কিন্তু পুরাণমত বা ভক্তিশাস্ত্র বলে যে, ঈশ্বরই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। তাঁকে অন্তরে বাহিরে পূজা কর।

এটা একটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম টেকনিক্যাল জিনিস। উপনিষদেও কোথাও কোথাও এই জিনিসটা আছে, যেখানে বলছেন –*যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ*, যেটা এখানে আছে, সেটা ওখানেও আছে; কিন্তু সেটাকে ওনারা সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম রূপে ব্যাখ্যা করেন। ভক্তিশাস্ত্রে এই জিনিসটাকে সত্য রূপে নেওয়া হয়। কি রকম? দুটি মত –জ্ঞানপথ ও ভক্তিপথ। জ্ঞানপথে ব্রহ্মই আছেন, ব্রহ্ম বাদে যা কিছু আছে সব মায়া, এটা ত্যাজ্য। ভক্তিপথে ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, ফলে সব কিছুই নেওয়া যায়। এই কলমটা ঈশ্বরই হয়েছেন, সেইজন্য কলমকে নিতে আমাদের কোন দোষ নেই। ঠাকুর যখন টাকা মাটি মাটি টাকা বলছেন, তখন তিনি বস্তু রূপে সেটাকে ত্যাগ করলেন, টাকা বস্তু কিনা, মাটিও বস্তু। তার মানে জ্ঞানপথ দিয়ে ঠাকুর মাটি ও টাকা দুটোকেই ত্যাগ করলেন। শ্রীশ্রীমা এই টাকাকেই আবার ব্রহ্ম রূপে গ্রহণ করছেন। টাকা মা লক্ষ্মী, লক্ষ্মী ভগবান বা ব্রহ্মরই রূপ, মা তাই টাকা হাতে নিয়ে

মাথায় ঠেকিয়ে শ্রদ্ধা সহকারে তুলে রাখছেন। কিন্তু টাকা রূপে এর অস্তিত্ব না আছে জ্ঞানপথে, না আছে ভক্তিপথে। শ্রীশ্রীমাও যখন টাকা নিচ্ছেন, তিনি মা লক্ষ্মী রূপে নিচ্ছেন। মা লক্ষ্মী, ঈশ্বর আর তাঁর শক্তি।

এগুলো একদিন শুনলে হয় না, শুনে যেতে হয়। বেদে জ্ঞানসূক্ত আছে, জ্ঞানসূক্তে সুন্দর একটা মন্ত্র আছে, যাতে দেখানো হয়েছে মন্ত্র কখন কৃপা করে তাঁর অর্থ উন্মোচন করে দেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরা, যাঁরা মন্ত্রপাঠ করেন, কিন্তু শুধু মন্ত্রপাঠ করলেই হয় না। মন্ত্রের এই বাক্য দেখছে, দেখেও দেখে না; শুনছেন, শুনেও শোনে না। কিন্তু বাগ্দেবী যখন প্রসন্না হন, তিনি তখন তার মনে মন্ত্রের অর্থটা প্রকাশিত করে দেন। যেমন একজন স্ত্রী নিজের স্বামীর সামনে নিজেকে অনাবৃত করে দেয়। অন্য সময় হয় না, যাকে ভালবাসে তার সামনে নিজেকে উন্মোচন করে দেয়। বেদে এই মন্ত্র আছে। চেষ্টা করে জ্ঞানকে ধরা যায় না। জ্ঞান যখন নিজেকে প্রকাশিত করেন, একমাত্র তখনই জ্ঞানের স্বরূপ বোঝা যায়। সেবা করতে হয়, সেবা করে যাচ্ছে, করতে করতে কোন দিন তিনি খুশি হয়ে তিনি নিজেই খুলে যাবেন আর আপনাকে দেখিয়ে দেবেন, আমি এই। তাই প্রার্থনা করে যেতে হয়।

ঈশোপনিষদে খুব সুন্দর প্রার্থনা করছেন, ব্রাহ্মণ মৃত্যু শয্যায় শুয়ে আছেন, সেখান থেকে তিনি প্রার্থনা করছেন, *তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে*, হে সূর্য দেবতা, সারা জীবন আমি নিত্য সকাল-সন্ধ্যা তোমার আরাধণা করে এসেছি। আমার জীবনকে আমি সত্য ধর্মের উপর দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আমার মৃত্যুর সময় এসে গেছে, তোমার মুখের উপর যে আবরণ, সেটা সরিয়ে দাও যাতে আমি তোমার স্বরূপ দেখতে পাই। সেইজন্য তাঁকে অন্তরে বাহিরে পূজা করতে হয়। বাহিরে পূজা অত্যন্ত জরুরী। মায়াবতীতে স্বামীজী অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রথমের দিকে সেখানে সব সময় অশান্তি লেগেই থাকত। জানি না এখন অশান্তি আছে কিনা। আমি অনেকদিন অদ্বৈত আশ্রমে ছিলাম জানতাম, অশান্তি লেগেই থাকত। আমাদের এক নামকরা মহারাজ বলেছিলেন, স্বামীজী অদ্বৈত আশ্রম করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু এখানে অশান্তি রয়েছে কারণ এখানে কোন ঠাকুরঘর নেই।

বাহ্য পূজা করলে অনেক কিছুর সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। লোকেরা এটা বুঝতে পারে না। স্বামীজী করেছিলেন, কারণ যাঁদের মন ওই সাধনার জন্য প্রস্তুত তাঁদের জন্য। রামকৃষ্ণ মিশন ওখানে সাধুদের পোস্টিং করে দিচ্ছেন তাঁদের প্রস্তুতি হোক আর নাই হোক। তারপর সেখানে গিয়ে অশান্তি লাগে, কারণ সেখানে বাহ্যিক কোন পূজার ব্যবস্থা নেই। বাহিরের পূজা আর অন্তরের পূজা দুটোই দরকার। ভালবাসা একটা ক্রিয়া, এটাকে করে দেখাতে হয়। আপনি যে ঈশ্বরকে ভালবাসছেন এটাকে করে দেখাতে হয়। এই যে অনেকে বলে, আমার অন্তরে ভালবাসা আছে, বাইরে না দেখালেও চলবে। না, শুধু অন্তরে ভালবাসা আছে বললে হবে না, ভালবাসা একটা ক্রিয়া, ভালবাসা শুধু ভাব নয় যে শুধু মনের ভিতরেই থাকবে। মা যখন নিজের সন্তানকে ভালবাসে, সন্তানের জন্য মা কত কিছু করেন। যত কষ্টই হোক সন্তানের জন্য রান্না করবেন, সন্তানের কিসে সুবিধা, কিসে অসুবিধা সব দিকে নজর রেখে সেই মত সন্তানের সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেবেন; কারণ ভালবাসা হল ক্রিয়া, ভাব নয়। ভক্তিও ক্রিয়া, ভাব নয়; শুধু ভাব দিয়ে ভক্তি হয় না। সবাই বড় বড় কথা বলে –আমার ভক্তি ভিতরে আছে, I am not religion, I am spiritual। তোমার মত মুর্খ আর কে আছে। If you are spiritual, you have to be religious। ভক্তিকে যে ভাবে নিয়ে যাবে, তার আগে বাইরে ভক্তিকে বাহ্যিক পূজা-অর্চনার মাধ্যমে তোমাকে ক্রিয়ান্বিত করতে হবে।

যতক্ষণ 'আমি' বোধ তিনি রেখেছেন ততক্ষণ সবই আছে। আর স্বপ্নবৎ বলবার জো নাই। ঠাকুর এবার এই উদাহরণ দিচ্ছেন –**নিচে আগুন জ্বালা আছে, তাই হাঁড়ির ভিতরে ডল, ভাত, আলু, পটোল সব টগ্‌বগ্‌ করছে। লাফাচ্ছে, আর যেন বলছে, 'আমি আছি', 'আমি লাফাচ্ছি'। শরীরটা যেন হাঁড়ি; মন, বুদ্ধি –জল; ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি যেন –ডাল, ভাত, আলু, পটোল। অহং যেন তাদের অভিমান, আমি টগ্‌বগ্‌ করছি। আর সচ্চিদানন্দ অগ্নি।**

যতক্ষণ আমি ততক্ষণ জীব, জগৎ, ঈশ্বর সব কিছু সত্য; সগুণ সাকার সত্য, ঈশ্বর সত্য, প্রতিমা পূজা সত্য, পূজা-অর্চনা সত্য। হিন্দুদের নিন্দা করে বলে, হিন্দুরা গোমুত্র পান করে, হ্যাঁ, এটাও সত্য। প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য হিন্দুরা গোবর খায়, হ্যাঁ খায় এবং খাবে; প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য গোবর খাওয়া থেকে আর ভাল প্রায়শ্চিত্ত পালন কি আছে! অপরের গলা কাটাটা যাদের কাছে প্রায়শ্চিত্ত, তাদের এগুলো কি আর বোঝাবেন। স্বামীজীর একটা খুব অসাধারণ বই 'ভাববার কথা'; আমার খুব প্রিয় বই। সেখানে স্বামীজী খুব সুন্দর একটা উদাহরণ দিচ্ছেন—একটা লোক মন্দিরে সকালবেলা এসে বিকট গলায় ভজন গান করছে। মন্দিরের পুরোহিত ছুটে এসে তাকে বলছে, 'এই কি করছ তুমি'? 'কেন আমি ঠাকুরকে গান শুনিয়ে ভজাচ্ছি'। 'এটা কোন গান! সুর নেই, তাল নেই আর অমন হেঁড়ে গলায় তুমি ঠাকুরের মন ভজাচ্ছ'? 'কেন? সুর, তালের কি দরকার; আমি ভক্তিভরে গান করছি তাতেই হবে'। পুরোহিত তখন খুব সুন্দর বলছেন, 'তুই আমারই মন ভজাতে পারছিস না, আর তুই কিনা ঈশ্বরের মন ভজাবি'?

তুমি নিজের স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে থাকতে পারছ না; তুমি বাবা-মাকে খুশি করতে পারছ না, তুমি করবে ঈশ্বরকে খুশি? যিনি যত স্থূল তাকে খুশি করা তত সহজ। একটা গরু কিংবা কুকুর, বেড়ালকে খাবার দিয়ে দিন, ও খুশি হয়ে গেল, ওখানেই সব শেষ; অবশ্য যদি বাঁধনে না থাকে। কিন্তু যিনি যত সূক্ষ্ম, তাঁকে খুশি করা তত কঠিন। যাঁর মন যত সূক্ষ্ম তাঁকে খুশি করা তত কঠিন। অনেকের নামে বলা হয়, ওকে কখন খুশি করা যায় না। যাবে না, কারণ ওর মন অনেক সূক্ষ্ম। ভগবানের মন সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতম, ভগবানকে খুশি করা অত্যন্ত কঠিন। আপনি এখানে নিজের স্বামীকে খুশি করতে পারছেন না, নিজের সন্তানকে, ভাইকে খুশি করতে পারছেন না, বাবা-মা, শ্বশুড়-শাশুড়িকে খুশি রাখতে পারছেন না। সম্পত্তি ভাগ হয়ে যাচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে; ছেলে বাবা-মাকে ছেড়ে আমেরিকায় গিয়ে বসে আছে; আর এরা নাকি ঈশ্বরদর্শন করবে! জয় ঠাকুর, জয় ঠাকুর, জয় মা জয় মা। ভালবাসা করে দেখাতে হয়; ভালবাসা ভাব না; ভক্তি ভাব না, ভক্তি করে দেখাতে হয়। বাইরে করতে করতে ওই ভক্তিকে ভিতরে নিয়ে আসতে হয়।

ঠাকুর এই উদাহরণ দিয়ে বলতে চাইছেন —অহং যেন তাদের অভিমান, আমি টগ্‌বগ্ করছি। আর সচ্চিদানন্দ অগ্নি। এই সচ্চিদানন্দ আছেন বলে আমরা সবাই লাফিয়ে বেড়াচ্ছি —আমি আছি, আমি আছি। যতক্ষণ 'আমি' আছে ততক্ষণ এগুলো সব সত্য। যাবতীয় যা কিছু আছে সব সত্য, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সত্য, সগুণ সাকার সত্য, পূজা-পাঠ-অর্চনা-বিধি সমস্ত সত্য।

তাই ভক্তিশাস্ত্রে, এই সংসারকেই 'মজার কুটি' বলছে। আসলে সব একই জিনিস, তফাৎ কিছু নেই। আপনি জ্ঞানপথে গিয়ে বলছেন, ব্রহ্মই আছেন বাকি সব মায়া; আসলে আপনি বলতে চাইছেন, চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই। ভক্তি মতে যখন বলছেন, ঈশ্বরই আছেন; এই সমস্ত কিছু ঈশ্বরই হয়েছেন, আসলে আপনি বলতে চাইছেন, বস্তু নেই, ঈশ্বরই আছেন। দুটো একই জিনিস, তফাৎ কিছু নেই।

রামপ্রসাদের গানে আছে 'এই সংসার ধোঁকার টাটি'। তারই একজন জবাব দিয়েছিল, 'এই সংসার মজার কুটি'। 'কালীর ভক্ত জীবনমুক্ত নিত্যানন্দময়'। এখানে এসে তন্ত্রমত ঢুকে গেল। তন্ত্রটা খুব মজার, এই যে 'আমিত্ব', এই যে মায়া, এটা একেবারে বাস্তব। তন্ত্রে বলাই হয় শিব আর শক্তি, বা শিব-শক্তি। পরে ভক্তিতেও এই জিনিসটা শক্তির প্রভাবে ঢুকে গেল। যার জন্য পরপর আমাদের ভগবান বিষ্ণু আর লক্ষ্মী এলেন; পরে রাম-সীতা; কৃষ্ণের সঙ্গে রাধাকে নিয়ে আসুন বা কৃষ্ণের সঙ্গে রাধাকে লাগান বা রুক্মিনী যাকেই লাগান, একজনকে নিয়ে আসা হয়। আসলে এটা ভক্তিপথের নয়। আমাদের ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে এটা প্রচলিত যে শ্রীশ্রীমা হলেন ঠাকুরের শক্তি; আসলে এগুলো সব তন্ত্র মত থেকে আসে। তন্ত্র মতে শিব কক্ষণ শক্তি ছাড়া হবেন না। কারণ তন্ত্রমতে শক্তি সত্য। যতক্ষণ আমি সত্য ততক্ষণ শক্তিও সত্য। আমাদের এখানে ভাই ভাই কিনা, তন্ত্র, পুরাণ, উপনিষদ সব ভাই

ভাই। এ ওর থেকে নেয়, সে সেটা থেকে নেয়, মিলেমিশে চলে। আমাদের যত মত আছে, এদের মধ্যে ভক্তি হল সব চাইতে বেশি খোলামেলা। উপনিষদ থেকেও নিয়েছে, তন্ত্র থেকেও নিয়েছে আবার পুরাণ থেকেও নেয়; দেখলে মনে হবে সব মত সবটার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। ভক্তি সব কিছুকে নিয়ে নেয়। তবে উপনিষদ সবটা নেবে না, তিনিই জীব-জগৎ হয়েছেন, এটা উপনিষদ নেবে না। ভক্ত ঈশ্বর, জীব, জগৎ, মায়া সবটাকে এক দেখেন; ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। মাণ্ডুক্য উপনিষদেও বলছেন, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। মায়া, এটাও ঈশ্বর; ঈশ্বরের না। আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্যে বলছেন, শক্তি ও শক্তিমান এক। যার জন্য অনেক সময় এনারা মায়া শব্দটা ব্যবহার না করে 'শক্তি' শব্দটা নেন।

ভক্ত দেখে, যিনিই ঈশ্বর তিনিই মায়া হয়েছেন। তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। ঈশ্বর-মায়া-জীব-জগৎ এক দেখে। কোন কোন ভক্ত সমস্ত রামময় দেখে। রামই সব হয়ে রয়েছেন। অধ্যাত্ম-রামায়ণে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, নারদ এসে শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি করছেন –যত পুংবাচকক সব আপনি আর যত স্ত্রীবাচক সব সীতা, এখানে ব্রহ্ম আর শক্তি এই রূপে নিয়ে আসছেন। **কেউ রাধাকৃষ্ণময় দেখে**। আমরা যখন ঠাকুর-মা বলি, এখানেও একই জিনিস; কারণ আমরা সবাই ভক্তিমতে সাধনা করছি।

কৃষ্ণই এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। সবুজ চশমা পরলে যেমন সব সবুজ দেখে। আপনার যিনি ইষ্ট, আপনি দেখবেন আপনার ইষ্টই সব কিছু হয়ে রয়েছেন। যাঁর ইষ্ট শিব-পার্বতী, তিনি দেখবেন শিব-পার্বতী সব হয়ে রয়েছেন। এখানে দোষের কিছু নেই, কারণ চিত্তবৃত্তি যখন নিরোধ হয়ে যায়, মন যখন শান্ত হয়ে যায়, তখন শুদ্ধমন, শুদ্ধবুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা এক বোধ হয়, তখন বোধে বোধ করেন। তখন কি দেখেন? সচ্চিদানন্দ বই আর কিছু নাই। কিন্তু ওখান থেকে যদি মন এক ধাপ নিচে নেমে আসে বা একটা ধাপে যদি মন আটকে থাকে, যেমন ভক্তদের থাকে, সেখানে একটা মাত্র বৃত্তি থাকে; সেই বৃত্তিটা হল নিজের ইষ্টের। বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা যে বলে আমার ধর্ম শ্রেষ্ঠ, অবশ্যই তার ধর্ম শ্রেষ্ঠ, কারণ তাদের যিনি প্রতিষ্ঠাতা বা তাদের যাঁরা সন্ত মহাত্মারা আছেন, তাঁদের যে শেষ একটি বৃত্তি থেকে গিয়েছিল, সেটা তার ইষ্টের। সেইজন্য দেখে সব কিছু তিনিই। আপনি যদি ঠাকুর ও মায়ের ভক্ত হয়ে যান, তখন আপনি এই কলমটাকে কি দেখবেন? রামকৃষ্ণময়।

ঠাকুর খুব সুন্দর গল্প বলছেন, কৃষ্ণ অর্জুন একটা জায়গায় গেছেন। দূর থেকে কৃষ্ণ অর্জুনকে একটা জাম গাছ দেখালেন। জিজ্ঞেস করলেন, কি ওটা? অর্জুন বললেন, জাম গাছ, থোকা থোকা জাম হয়ে আছে। কৃষ্ণ বললেন, আরও কাছে গিয়ে ভাল করে দেখ। অর্জুন দেখছেন থোকা থোকা কৃষ্ণ ফলে রয়েছে। কারণ কৃষ্ণময় এই জগৎ।

ঠাকুরের এটা বৈশিষ্ট্য যে, তিনি হয় সব সময় ধর্মতত্ত্ব নিয়ে থাকতেন, তা নাহলে মাস্টারমশাই যে বর্ণনাগুলো করেছেন, তাতে ঠাকুরের যে কথাগুলো দরকার নেই সেগুলোকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। কথামৃত অনেক কঠিন, কারণ হিন্দুদের যে পুরো আধ্যাত্মিক ইতিহাস, রোমা রোঁলা পাঁচ হাজার বলছেন, কিন্তু খুব কম হলেও আট-দশ হাজার বছরের যে ইতিহাস, কথামৃত তার মূর্ত রূপ। শাস্ত্র যদি বুঝতে হয়, বেদ, উপনিষদ যদি বুঝতে হয়, কথামৃতের খুব দরকার। আর কথামৃত যদি বুঝতে হয়, তাহলে বেদ, উপনিষদ একটু জানতে হয়।

এর আগে ঠাকুর বললেন, তিনিই এই জীব-জগৎ সব হয়েছেন। তিনিই জীব-জগৎ হয়েছেন, এই কথাটা আধ্যাত্মিক জগতের দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যত ধর্মীয় দর্শন আছে, সেখানে এই জিনিসগুলোকে বিভিন্ন ভাবে প্রচুর আলোচনা করা হয়েছে। আর পুরো জিনিসটাকে যদি এক জায়গায় এনে কথামৃত পড়া হয়, তখন জিনিসটা একটু পরিষ্কার হয়। আমি আমাদের মহারাজদের কথা বলছি, যত বড়ই মহাত্মা হন, তিনি যখন শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, তিনি যেমন বুঝেছেন তিনি তেমনটিই ব্যাখ্যা করবেন। সেইজন্য আমি যে কথাগুলো বলছি, আমি যেমন বুঝেছি তেমনটাই বলছি। পুরুষ-প্রকৃতি বলা হয়, চিৎ-জড় বলা হয়, চৈতন্য বলা হয়, কিন্তু আসলে পুরো জিনিসটা হল শুধু ব্রহ্ম। ব্রহ্মই আছেন, ব্রহ্ম

ছাড়া কিছু নেই। ঠাকুর যে অনন্ত সমুদ্রের কথা বলছেন, সেই অনন্ত সমুদ্রে কোথাও কোথাও যেন জল হিম হয়ে বরফ হয়ে জমে গেছে। সেই বরফও সমুদ্র। এই শুদ্ধ ব্রহ্ম কোথাও যেন একটু জমে গেলেন, হয়ে গেল কারণ জগৎ যেখানে এই সচ্চিদানন্দকে ঈশ্বর রূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। আরেকটু জমে গেলেন, হয়ে গেল সূক্ষ্ম জগৎ। এবার সেই ঈশ্বরকে ইন্দ্রাদি দেবদেবী রূপে দেখা যাচ্ছে। তাহলে সেই ইন্দ্রাদি দেবদেবী কে? সেই সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই কিনা। দুটো আলাদা সত্তা তো হতে পারে না। আরও তিনি জমে গেলেন, হয়ে গেলে স্থূল জগৎ। আমি, আপনি, ইনি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, গরু, ছাগল, শূয়োর সব তিনিই হয়েছেন। সমস্ত কিছু তিনিই হয়ে রয়েছেন, তিনি লীলা করছেন।

কেউ কেউ বলেন, এই লীলা থেকে আমি বেরিয়ে আসতে চাই। আজকে কথামৃতে যে আলোচনা চলছে, এই জিনিসটাকে নিয়েই চলছে, খুব সুন্দর আলোচনা। ঠাকুর বলছেন, সংসারে আছ বেশ আছ, এতে সাধনের আরও সুবিধা। এই সাধন কিভাবে হয়, এটাকে নিয়ে ঠাকুর আলোচনা করবেন। সংসার মানে, তিনি 'আমি' রূপে হয়ে আছেন। সবটাই তিনি, কিন্তু এখানে এসে তিনি 'আমি' হয়ে যান। আমি বক্তা, আপনি শ্রোতা; বক্তাও তিনি শ্রোতাও তিনি। কিন্তু যখন বলছেন আর শুনছেন, তখন আমি হয়ে বলছেন, আমি সমর্পণানন্দ বলছি, আর আপনি অমুক তিনি শুনছেন। কিন্তু এই 'আমি' যদি 'তিনি' হতে চান, তখন ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে? এই রকম দাঁড়াবে –যেমন বিকারের রোগী বলে এক জালা জল খাব।

একবার আমাদের মহারাজদের শিবরাত্রির উপোস ছিল। উপোসের পর আমি এক জায়গায় ছিলাম, সেখানে এক মহারাজের খুব খিদে পেয়েছে। উনি ভাণ্ডারে গিয়ে একটু বেলের শরবৎ আর বড় বড় পানতুয়া চেয়ে খেয়েছেন। ইতিমধ্যে ভাণ্ডারী মহারাজ এসে গেছেন। ভাণ্ডারী মহারাজ এসে ওনাকে বলছেন, 'আরে মহারাজ আপনি এসেছেন, একটু খান' বলে উনি আরও দুটো পানতুয়া দিয়েছেন। ওনার আর খাবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু বলতে পারছেন না যে, আগে খেয়ে নিয়েছেন, কি করবেন ভয়ের চোটে চুপচাপ ঢুকিয়ে দিলেন। আমাদের একজন নূতন ব্রহ্মচারী আমাদের কাছে জয়েন করেছিল, এখন খুব নামকরা মহারাজ। ওই ব্রহ্মচারী মহারাজও উপোস করেছেন, এত খিদে পেয়েছে যে যখন খাবার এসেছে তখন একসাথে প্রচুর খাবার চেয়ে নিয়েছেন। আমি দেখে হাসছি। বুঝতে পারছি অত সে খেতে পারবে না; আর সত্যিই তাই হল, সে পুরোটা খেতে পারল না।

আমরা সবাই বিকারের রোগী। আমরা মনে করি, আজ যখন জপধ্যান করা গেল না, ঠিক আছে কাল থেকে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা জপধ্যান করব। যেটা আজকে হয়নি, সেটা কালকেও হবে না। আমরা একটা খুব দুর্ভাগ্যের ঘটনা দেখেছিলাম। একজন সন্ন্যাসী কোন মহিলার পাল্লায় পড়ে শেষ পর্যন্ত মঠ ছেড়ে বেরিয়েই গেলেন। তখন একজন ওনাকে বোঝাতে গেলেন। উনি তখন বলছেন, 'আমি আর উনি দুজনে মিলে খুব করে জপধ্যান করব'। আমার কাছে খবরটা এসে গেল। আমিও হেসে বললাম, 'সাধুদের মধ্যে যখন ছিলেন তখন তো জপধ্যান করলেনই না, এখন কিনা নারীর সঙ্গে বসে জপধ্যান করবেন'! এভাবে হয় না, এগুলো বিকার ছাড়া কিছু না।

কিন্তু ঠাকুর হলেন সেই ডাক্তার, ভববৈদ্য। তিনি কিভাবে সারান? হাসপাতালে নানা রকমের চিকিৎসা পদ্ধতির কথা আমরা শুনে থাকি। ঠাকুরের কাছে তিনটি মোক্ষম ঔষধ আছে। লাইফ সেভিং ড্রাগের কথা বলা হয়, ঠাকুরের কাছে তিনটি লাইফ সেভিং ড্রাগ আছে। তিনি চাইছেন মানুষ যেন 'আমি'টাকে ছেড়ে 'তিনি' বোধ করে। মানুষ সব হিপনোটাইজ হয়ে আছে কিনা, সংসারের প্রতি হিপনোটাইজ হয়ে আছে। এই হিপনোসিস কাটাতে হবে। হোলির সময় অনেকে ভাঙ খায়, ভাঙ প্রচণ্ড হ্যালুসিনেটরি ড্রাগ। নেশা করলে নেশা কাটানোর জন্য তেঁতুল জল খাওয়াতে হয়। ঠাকুরের কাছে তিনখানা সাংঘাতিক ওষুধ আছে। কখন তিনি মুখ দিয়ে খাওয়ান, কখন ইঞ্জেকশান দিয়ে, কখন ইন্ট্রাভেনাস দিয়ে সারান। রোগ, শোক, অপমান, এই তিনটি হল ঠাকুরের কাছে অসুখ। মানুষ নিজের

‘আমি’কে ভালবাসে, দেহকে ভালবাসে; এই দেহের সঙ্গে জড়িয়ে অন্য দেহগুলো যেমন, স্ত্রী, পুত্র, বাবা-মা, ভাই-বোন, তাদের ভালবাসে। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান এটাকে নিয়ে বলছেন – *অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু*, আসক্তি নিজের দেহের প্রতি, *অভিষঙ্গঃ* যাকে আপন মনে করে তার প্রতি আসক্তি আর তার সঙ্গে সম্মান। কথায় কথায় বলবে, আমি কোন দিন আর সেখানে যাবো না, আমাকে সম্মান দিল না। কিংবা দেখলেন, হঠাৎ কোন কলঙ্ক এসে গেল, যেটা আপনি কখন আশা করেননি কিংবা যার কাছে আপনি সম্মান প্রত্যাশা করেন, সে আপনাকে অপমান করে দিল কিংবা এমন কলঙ্ক আপনার উপর এসে গেল যে আপনাকে মুখ লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে। আমিত্বের তিনটে রূপ – প্রথমটা হল দেহের প্রতি আসক্তি, দ্বিতীয় আপনজনদের প্রতি আসক্তি এবং তৃতীয় নিজের সম্মানের প্রতি আসক্তি। এই যে তিনটে ভয়ঙ্কর ব্যাধি, এই তিনটে ব্যাধিকে সারানোর জন্য ঠাকুর এন্টি-বায়োটিক মিশিয়ে ছাড়তে থাকেন। রোগ দিলে দেহের প্রতি আসক্তিটা যায়। দ্বিতীয় ওষুধ শোক। শোক মানে আপনজন যখন চলে যায় তখন আপনজনের প্রতি আসক্তি চলে যায়। আর অপমানিত হওয়া, এটা তৃতীয় মহৌষধ, অপমানিত হলে নিজের সম্মানের প্রতি আসক্তিটা চলে যায়।

যে মানুষ মাটিতে পড়ে গেছে, তাকে আবার কে ফেলতে যাবে? যে কলঙ্কিত, অপমানিত, তাকে আপনি আর কি অপমান করবেন? যারা বিষয়ী, এই জায়গাতে এবার তাদের খেলাটা শুরু। যে ঘোর সংসারী, ঘোর বিষয়ী; সে সেখানে কান্নাকাটি করে, চেঁচামেচি করে অপমানকে সম্মানে পাল্টানোর চেষ্টা করে, শোককে সুখে পাল্টানোর চেষ্টা করে, রোগকে স্বাস্থ্যে পাল্টাতে চেষ্টা করে। কিন্তু যিনি ঈশ্বরে সমর্পিত, কোথাও তিনি অপমানিত হলে তিনি বুঝে নেন এই সংসারে সম্মানের কিছু নেই, আপনজন বলে কিছু নেই, দেহটা নশ্বর। গীতায় সেইজন্য ভগবান কি সুন্দর বলছেন –*অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্*, হে অর্জুন, এই যে সংসার দেখছ এটা অনিত্য, এটা সুখহীন, অসুখম্; এই সংসারে সুখের গন্ধটুকু নেই; এই জিনিসটাকে ভাল করে বুঝে নিয়ে তুমি শুধু আমার ভজনা কর। ভগবানের কোন দ্বেষ নেই, প্রিয়-অপ্রিয় বলে কিছু নেই; ভগবান অমুককে বেশি ভালবাসেন, অমুককে কম ভালবাসেন, তা না। ডাক্তার যেমন কোন বিশেষ রোগীকে ভালবাসে না। ডাক্তারের কাছে রোগী মানে রোগী। ঠাকুর হলেন এই ভববৈদ্য। রোগ, শোক আর অপমান এই তিনটে জিনিস দিয়ে তিনি ভবরোগের চিকিৎসা করেন।

সংসারীরা সব সময় চেষ্টা করে কিভাবে আমি আগের মত হয়ে যেতে পারি। স্ত্রী মরে গেল, আবার একটা বিয়ে করে নিল। স্ত্রী আমাকে ডিভোর্স করে দিয়েছে। আরে ভাই তুমি তো বেঁচে গেলে, ডিভোর্স যখন হয়েই গেছে আর চিন্তার কোন কারণ নেই, তুমি এবার ভাল করে বুঝে নাও –নারীসুখ, স্ত্রীসুখ এটাই; এই সুখটাকে এবার বাদ দিয়ে এগিয়ে যাও। ডিভোর্স হয়ে গেছে খুব ভাল, কিন্তু আবার যদি পাত্রী দেখা শুরু করতে থাক, এবার আরও তিনগুণ জোর ফাঁসবে। কিন্তু যারা ঘোর বিষয়ী তাদের কি হয়? সে আর-একটা পাত্রী পেয়ে গেলে, সেখানে গিয়ে মজে গেল। কিন্তু সত্যিকারের ঈশ্বরের প্রতি যার মন –সে বলে আমার এটা দেখার ছিল, দেখা হয়ে গেল, এই হল স্ত্রীসুখ; আর ওদিকে না। এটাই আমিত্বকে তুমিত্বে পাল্টানোর পথ। রোগ, শোক আর অপমান এই তিনটে হল ভবরোগের ওষুধ। তিনটে ভবরোগের যে আসল শিকল আমাদের সংসারে বেঁধে রেখেছে, এই তিনটে ওষুধ ওই শিকলকে কেটে উড়িয়ে দেয়।

তাহলে সমস্যাটা কোথায়? সমস্যা হল, আমরা মুখে বলি, আমি ঈশ্বরকে চাই; মন-মুখ এক হওয়া অত সহজ না। ভাবের ঘরে আমরা সব সময় চুরি করছি। এই কথাগুলো শুনতে আমাদের খারাপ লাগারই কথা। ইংরাজীতে একটা খুব সুন্দর কথা বলা হয় –politically correct। Politically correct কথার অর্থ আমার মনের মত কথা। লোকেদের মনের মত কথা যখন বলবেন, তখন লোকেরা আপনাকে বেশি মানবে, আপনার কথা বেশি শুনবে। কিন্তু সত্য কথা কখন politically correct হবে না। সেইজন্য ঠাকুর কোন দিনই পলিটিক্যালি কারেক্ট ছিলেন না। স্বামীজী কোন দিনই পলিটিক্যালি

কারেক্ট ছিলেন না। আচার্য যদি পলিটিক্যালি কারেক্ট হন, তাহলে বুঝবেন আচার্যের মধ্যে গোলমাল আছে। উত্তম আচার্য যখন সত্য কথা বলবেন, তখন তিনি কক্ষণ politically correct হবেন না। বিশ্বাস করুন, ঈশ্বরের দিকে মন দেওয়া অত সহজ না। ইচ্ছা আছে, তা নাহলে শাস্ত্রের কথা শুনবেন কেন? এই প্রবচন শুনছেন কেন? শুনছেন মানেই তো ইচ্ছা আছে। শুনতে শুনতে ভিতরে ঈশ্বরের ভাব তৈরী হয়, এই বলে আমরা এবার কথামৃতে ঠাকুর কি বলছেন দেখব।

তবে ভক্তিমতে শক্তিবিশেষ। যদিও তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন, তা সত্ত্বেও এখানে এসে কিভাবে 'তিনি' 'আমি' হয়ে গেছেন। সেইজন্য এখানে শক্তিবিশেষ। আর এই শক্তি যে কত প্রকারের হয় বলা যাবে না। কারুর বিজ্ঞানের দিকে শক্তি আছে, কারুর জ্ঞানের দিকে শক্তি আছে, কারুর প্রবচনের দিকে শক্তি আছে, কারুর টাকা-পয়সার শক্তি আছে আবার কারুর কাছে বৈরাগ্যসম্পদ আছে।

রামই সব হয়ে রয়েছেন, কিন্তু কোনখানে বেশি শক্তি, আর কোনখানে কম শক্তি। শক্তিকে মানতে হয়। হিন্দু সমাজ চিরদিনই শক্তিকে মেনে এসেছে। আজকে নেতারা রাজনীতির জন্য মনুস্মৃতিকে গালাগাল দিচ্ছে। মনুবাদী বলে ইদানিং একটা শব্দ বেরিয়েছে। আবার বলা হয়, ব্রাহ্মণরাই সব শেষ করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা থেকেই ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার শুরু হয়েছিল। তাঁরও লেখাতে ব্রাহ্মণদের যে নিন্দা করা হয়েছে, সেটা আরও ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে নিয়ে গেছে। ওসব কিছু না, হিন্দু সমাজ চিরদিনই শক্তিকে মানে। কোন শক্তিকে? বিদ্যাশক্তিকে। বিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ শক্তি মনে করে সমাজ ব্রাহ্মণদের কাছে মাথা নত করে রেখেছে। মার্ক্সিটরা একেবারেই মানে না, সবাইকে সমান করতে হবে। যে একটু লম্বা আছে, তার মুণ্ডুটা বা পাটা কেটে ছোট করে দিতে হবে। যে বেঁটে আছে তার পায়ে আরেকটু পা লাগিয়ে লম্বা করতে হবে, এ জিনিস কখন হয় নাকি। শক্তিবিশেষকে তো মানতেই হবে। বিশ্বে কম্যুনিস্টদের কত শক্তি ছিল, আজ উড়ে গেছে। শক্তিকে যে সমাজ মানবে না, তার মধ্যে বিদ্যাকে যে শ্রেষ্ঠতম শক্তি বলে মানবে না, সেই সমাজ বেশি দিন টিকবে না। ঠাকুর বারবার বলছেন শক্তিকে মানতে হয়। বিদ্যার যে একটা বিরাট শক্তি আছে, এই বিদ্যাশক্তিকে যে সমাজ মানে, সেই সমাজই টিকবে, বাকি কোন সমাজ টিকবে না।

আবার বলছেন, **অবতারেতে তিনি একরকম প্রকাশ**। অবতারের এমনই শক্তি, এত বছর পরেও তাঁর বই কথামৃত আমরা পড়ছি, তার অর্থ বার করার চেষ্টা করছি। **আবার জীবেতে একরকম**। সেইজন্য অবতার আর জীব কখন একরকম হয় না। জীবের সাথে জীবের ঊনিশ বিশ তফাৎ, কিন্তু অবতার আর জীবে একশ তফাৎ।

অবতারেরও দেহবুদ্ধি আছে। শরীরধারণে মায়া। এটা খুব মূল্যবান কথা। এই জিনিসগুলো আমরা অন্যান্য জায়গায় পাইনা। যেমন ধরুন, আমাদের খুব নামকরা গ্রন্থ রামচরিতমানস, ওখানে এই কথা পাওয়া যাবে না। অধ্যাত্ম রামায়ণে এই কথা পাবেন না। বাল্মীকি রামায়ণে আবার পুরোদমে পাবেন। সেখানে পদে পদে শ্রীরামচন্দ্রের দেহবোধকে দেখানো হয়েছে। তবে কি হয়, এই যে শরীরধারণ এটা মায়ার জন্য।

সীতার জন্য রাম কেঁদেছিলেন। তবে অবতার ইচ্ছা করে নিজের চোখে কাপড় বাঁধে। চাইলেই তিনি খুলে দেবেন। সেইজন্য সীতার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের যে চোখের জল ফেলা, এটা সত্য নয়। তাহলে কি এটা মিথ্যা? মিথ্যাও না। সেইজন্য এর আলাদা শব্দ লীলা। লীলা মানেই তাই, এটা সত্যও না, মিথ্যাও না। **যেমন ছেলেরা কানামাছি খেলে। কিন্তু মা ডাকলেই খেলা থামায়**। অবতার চাইলেই খেলা থামিয়ে দেবেন।

জীবের আলাদা কথা। যে-কাপড়ে চোখা বাঁধা সেই কাপড়ের পিঠে আটটা ইস্কুরূপ দিয়ে বাঁধা। অষ্টপাশ। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, কুল, শীল, শোক, জুগুপ্সা(নিন্দা) –ওই অষ্টপাশ। জুগুপ্সা মানে ঘৃণা

করা, মাস্টারমশাই এখানে নিন্দা করা নিয়ে বলছেন। ঈশাবাস্যোপনিষদেও এই শব্দ এসেছে, *ততো ন বিজিগুপ্সতে*, তখন তিনি আর কাউকে ঘৃণা করেন না। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, কুল, শীল; আমি তোমার থেকে বেশি ভাল, শোক হওয়া, আর জুগুপ্সা, অপরকে ঘৃণা করা; এগুলোকে দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। এমন ভাবে বেঁধে রেখেছে, আপনি বেরোতে চাইলেও বেরোতে পারবেন না। একটাকে ছাড়লে আর-একটা আপনাকে ধরে নেবে। অবতারেরও বাঁধা, কিন্তু জাদুকরের মত, একটা ঝাঁকুনি দিলেন আর সমস্ত বন্ধন খুলে গেল। **গুরু না খুলে দিলে হয় না**।

দুটো খুব জরুরী কথা ঠাকুর বলছেন। শক্তির তফাৎ, শক্তিকে মানতে হয়। অনেকদিন আগে বেলুড় মঠে একবার সন্ধ্যেবেলায় ভারতের রাষ্ট্রপতি এসেছিলেন। যবে থেকে ইউনিভার্সিটি হয়েছে তবে থেকে আমি এখানেই আছি। তখনকার দিনের ছোট মোবাইল ফোন দিয়ে ইউনিভার্সিটি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে একটা ছোট ভিডিও বানালাম। প্রচুর গাড়ি লাইন করে ঢুকছে, সাইরেন বাজছে, গাড়ির মাথায় আলো জ্বলছে, দেখতে আমার খুব ভাল লাগছিল। ভারতের রাষ্ট্রপতি বলে কথা। ভিডিওটা আমি সোস্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করলাম। সঙ্গে সঙ্গে একজন কমেন্ট করে লিখছেন, কবে যে ভারতে সেইদিন হবে যেদিন একজন সাধারণ নাগরিকের মত ভারতের রাষ্ট্রপতি যাবেন। লেখাটা দেখে আমার খুব হাসি পেল। সাধারণ নাগরিকের মত যদি রাষ্ট্রপতি যান, তাহলে তিনি আর রাষ্ট্রপতি হলেন কোথায়। রাজাকে রাজার মত সম্মান দিতে হয়। রাজাকে যদি রাজার মত সম্মান না দেওয়া হয়, কিছু দিন চলবে; কিন্তু তারপর পুরো সমাজটাই উড়ে যাবে। রাজাকে রাজমুকুট রাখতেই হবে, তা নাহলে সে কিসের রাজা! রাজা প্রজা যদি এক হয়ে যায় তাহলে আর সমাজ থাকবে না, উড়ে যাবে; গুরু চণ্ডাল কি কখন এক হয়? শক্তি মানতে হয়। এটা যদি আপনারা জীবনে একটু লাগান, জীবন অন্য রকম হয়ে যাবে। একজন পুলিশ কনস্টেবল, তার হাতে একটা ডাণ্ডা আছে; ওই একটা ডাণ্ডার জোরে সে পুরো ট্রাফিককে নিয়ন্ত্রণ করছে, তাকেও মানতে হয়, সম্মান দিতে হয়। যখনই অবতারকে বিচার করবেন তখন এই জিনিসটাকে মাথায় রাখবেন; তাঁরও দেহবোধ আছে। এই দেহবোধ নিয়েই ঠাকুরের শেষ সময় অনেক ঝামেলা লেগেছিল। একদিকে নরেন্দ্রনাথ এবং আরও কয়েকজন ঠাকুরের সন্তানরা বারবার বলছেন, ঠাকুরের কষ্ট হচ্ছে। অন্য দিকে আর-এক দল ভক্তরা বলছেন, তিনি মন তুলে নিলেই পারেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বেলঘরের ভক্তকে শিক্ষা –ব্যাকুল হয়ে আর্জি কর –ঠিক ভক্তের লক্ষণ

আমরা **১০**ই জুন, **১৯৮৩** খ্রীষ্টাব্দের বর্ণনাতে আছি (পৃঃ ২১৩)। এই দিন বেলঘরে থেকে ভক্তরা এসেছেন। ঠাকুর যেমনি বলছেন গুরু পাশ না খুলে দিলে হয় না, তখন বেলঘরের এক ভক্ত স্বাভাবিক ভাবে ঠাকুরকে বলতে শুরু করলেন।

বেলঘরের ভক্ত –আপনি আমাদের কৃপা করুন। ঠাকুরের কি সুন্দর উত্তর।

শ্রীরামকৃষ্ণ –সকলের ভিতরেই তিনি রয়েছেন। তবে গ্যাস কোম্পানিকে আর্জি কর। তোমার ঘরের সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে।

ঠাকুর তো ভক্তির কথা বলছিলেন, কিন্তু এখানে তো জ্ঞানের কথা, যোগের কথা বলছেন। আসলে, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ এগুলো আলাদা কিছু না, সব এক। গুরু তখনই কৃপা করেন, যখন ভিতরের যিনি অন্তর্যামী তাঁর কাছে হাতজোড় করে, হাঁটু গেড়ে, সাষ্টাঙ্গ হয়ে আকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা করতে হয় –প্রভু কৃপা কর বলে। তখন ভিতরের যিনি অন্তর্যামী তিনিই গুরুরূপে সামনে এসে আশীর্বাদ করেন। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন, বেলুড় মঠে বেড়াতে বেড়াতে পৌঁছে গেলেন। এসে শুনলেন আজ প্রেসিডেন্ট মহারাজের প্রণাম হচ্ছে। আপনিও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে কোন রকম চোখ-মুখ কুঁচকে বলতে লাগলেন, 'মহারাজ আমি নিবেদন করছি আপনি এটা যদি করে দেন, আমি বেঁচে যাই'। এই

প্রার্থনায় কিছু হবে কি? গুরুকৃপা তখনই হবে যখন আপনি হাজার হাজার বার অন্তর্যামীর কাছে প্রার্থনা করেছেন। ঠাকুরের কাছে আমরা যে প্রার্থনা করি, এই প্রার্থনা আসলে অন্তর্যামীর কাছেই করা হয়।

কঠোপনিষদে বলছেন –*কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মনমৈক্ষদ আবৃতচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্*, অমৃতত্বের সন্ধানে মানুষ নিজের অন্তর্যামীর সঙ্গে জুড়ে নেয়। বাইরে আমরা যা কিছু দেখছি, বাইরে সাধু-মহাত্মা দেখছি, গুরু দেখছি, বাইরে অবতার দেখছি, সবই অন্তর্জগতেরই বহিঃপ্রকাশ। অন্তরটা যদি ফাঁকা থাকে, বাইরেটাও ফাঁকা থাকবে। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, অনেকে সাধুসঙ্গ করে গাঁজা খাওয়ার জন্য। আমার একজন পরিচিত আছেন খুব মজার মজার কথা বলেন। উনি একদিন বলছেন, ওনার এক রিলেটিভ ওনাকে বলছেন, 'বুঝলে এই রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের কাজে খুব জোর আছে'। কিসের জোর? 'এদের বড় বড় লোকেদের সঙ্গে যোগ আছে'। সাধুর সঙ্গে কেন সম্পর্ক রাখছে? ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করাতে সুবিধা হবে, অসুস্থ হলে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে সুবিধা হবে, কোন সেন্টারে গেলে ওখানকার গেস্ট হাউসে থাকার সুবিধা পাওয়া যাবে। কোথাও গিয়ে বলবে, আমি রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্ত, অমুক মহারাজ আমার খুব পরিচিত। ভক্ত হওয়াটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেটাকে বাইরে কেন প্রকাশ করছেন। এগুলো ভক্তি না, পরিষ্কার ধান্দাবাজী। আপনার আচরণেই আমরা বুঝে যাব আপনি ভক্ত না অন্য কিছু।

সকলের ভিতরে তিনিই আছেন। গ্যাস কোম্পানিকে আর্জি করতে হয়। গ্যাস কোম্পানি ভিতরে, আর্জিটা এই অন্তরে দিতে হয়, বাইরে কিছু নেই। যখন আপনি গভীরে যাবেন, তখন আপনার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তিনিই আপনাকে দিয়ে দেবেন।

তবে ব্যাকুল হয়ে আর্জি (Prayer) করতে হয়। এমনি আছে, তিন টান একসঙ্গে হলে ঈশ্বরদর্শন হয়। 'সন্তানের উপর মায়ের টান, সতী স্ত্রীর স্বামীর উপর টান, আর বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান'।

প্রার্থনা ব্যাকুল হয়ে করতে হয়, আমি এটা ছাড়া পারছি না। বাড়িতে সন্তান খুব অসুস্থ, মারা যেতে পারে। মা ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করছেন। ছেলেটির যুবতী স্ত্রী, সেও ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করছে। এই প্রার্থনার উত্তর কি ভগবানের কাছে পাবেন? ভগবান কি আপনার প্রার্থনা অনুযায়ী সব করে দেবেন? আমাদের জানা নেই। তিনি করতেও পারেন, নাও করতে পারেন। আমাদের একজন ভক্ত আছেন, অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন। কিছু দিন আগে দেখা হতে আমাকে বলছেন, 'অনেক দিন ধরে একটা প্রশ্ন ঘুরছে। অনেককে প্রশ্ন করেছি, কেউ উত্তর দিতে পারেননি'। বলছেন, 'স্বামীজী এত বড় যোগী ছিলেন, তাঁর বোন আত্মহত্যা করলেন, স্বামীজী চাইলেই তো ওটা আটকে দিতে পারতেন'। শুনে আমার হাসি পেয়ে গিয়েছিল। যোগকে আপনি দেখছি একটা ম্যাজিকের পর্যায়ে নামিয়ে দিচ্ছেন। স্বামীজীর কত রকমের রোগ ছিল, ঠাকুরের রোগের শেষ ছিল না, শ্রীশ্রীমায়ের কত রকমের রোগ ছিল। কোথায় আছে যে, যোগী হলে তিনি একে আত্মহত্যা করা থেকে আটকাবেন, ওখানে যুদ্ধ থামিয়ে দেবেন। যোগ তো ঠিক উল্টো জিনিস বলে –যতক্ষণ তোমার মনকে জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে না সরাতে পারছ, তুমি যোগী হতে পারবে না। যোগের পুরো উল্টো কথা কোথা থেকে নিয়ে আসছেন? ঠাকুরের কাছে গিয়ে রোগমুক্তির জন্য যদি প্রার্থনা করা হয়, তাহলে কি রোগ সেরে যাবে? ঠাকুরের নিজের রোগই সারাতে পারলেন না, আপনার রোগ কি সারাবেন! যখনই কেউ এসে এই ধরণের কোন উদ্ভট কথা বলেন, আমি তখন খুব বিনীতা ভাবে তাদের বলি –ঠাকুর নিজের কোমড়ের ধুতিই সামলাতে পারতেন না; আবার কোন কোন সময় সামলাতে না পারলে ধুতি ফেলেই দৌড়াতেন, সেই তিনি এই জগৎ সামলাচ্ছেন, এর থেকে আর কত ভাল সামলাবেন, এতেই খুশি থাকুন। যার ইষ্ট ধুতি খুলে দৌড়াচ্ছে, সেখানে আমাদের আর কি করে সব কিছু ঠিক থাকবে। এটা নাও হতে পারে।

কিন্তু যে প্রসঙ্গটা চলছে –অষ্টপাশ, এই অষ্টপাশকে খুলে দেওয়ার জন্য যদি আপনি ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করেন, অষ্টপাশ আপনার খুলবেই খুলবে। কেন এমন হবে? কারণ ওটাই যে আপনার স্বরূপ। স্বরূপ থেকে আপনাকে কেউ সরিয়ে দিতে পারে না। স্বরূপের উপর যে বন্ধন, যে আবরণ, যে পাশ, সব কাল্পনিক। আপনারা করে দেখুন; হৃদয়ের কথা না, আপনি মুখের কথা দিয়েই কোন একটা গুণের জন্য প্রার্থনা করুন, যেমন, হে ঠাকুর আমি সত্যি কথা বলতে চাই। প্রত্যেক দিন সকাল বিকাল দুই বেলা ঠাকুরের কাছে কোন গুণের জন্য প্রার্থনা করুন। যখনই প্রার্থনা করবেন, বলবেন, হে ঠাকুর, আমি যেন সত্যি কথা বলতে পারি, অথবা বলতে পারেন, হে ঠাকুর, আমি যেন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি, যে কোন একটা। ওই একটা প্রার্থনা সকাল বিকাল দিনের পর দিন করে যান। তবে ভাঙবেন না, ওই প্রার্থনা করতে গিয়ে মাঝাখানে আরেকটা আর্জি ঢুকিয়ে দেবেন না। করুন, দশ বছর, বারো বছর, কুড়ি বছর দু-বেলা প্রার্থনা করতে থাকুন। কুড়ি বছর কেন? কারণ, এই যে ঠাকুর বলছেন, ব্যাকুল হয়ে; যতক্ষণ আপনার এই মুখের কথা ব্যাকুলতায় না পর্যবসিত হয় ততক্ষণ কিন্তু উত্তর আসবে না। মুখে বলতে বলতে একদিন এই মুখের কথাই ব্যাকুলতায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

বিভিন্ন ধর্মে যে প্রবচন দেওয়া হয়, তাদের কবেকার কোন প্রফেট কোথায় এসেছিল, জুহুদিদের বাইবেল যদি পড়েন সেখানে শুধু প্রফেট আর প্রফেট। সেখানে অমুক প্রফেট এই বলে গেছেন, তমুক প্রফেট এটা বলে গেছেন। এখানে এসব কিছু নেই, এখানে একেবারে পরিষ্কার –আমি দেখেছি, তুমিও দেখবে। আমি প্রার্থনা করে পেয়েছি, তুমিও পাবে। সমস্যার সমাধান আপনি নাও পেতে পারেন; কিন্তু আপনার নিজের জীবনের যে সমস্যা, যে সমস্যা আপনাকে জর্জরিত করে রেখেছে, রোগ মানুষকে জর্জরিত করে না, শোক মানুষকে জর্জরিত করে না, কলঙ্ক ও অপমান মানুষকে জর্জরিত করে না; জর্জরিত করে আমিত্বের ভাব। নিজের শরীরের সাথে, আপনজনের শরীরের সাথে যে আমিত্বের ভাব, সম্মানের সঙ্গে যে আমিত্বের ভাব জড়িয়ে আছে, এই আমিত্ব ভাব জর্জরিত করে। আমরা সেইজন্য ধর্মকে ছেড়ে অধর্ম করি, সত্যকে ছেড়ে অসত্যকে আলম্বন করি, এই ধরণের আমাদের যে চারিত্রিক দোষ, তারপর অষ্টপাশের কথা, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় এগুলো কেন হয়? কারণ আমিত্বের সঙ্গে জুড়ে আছি। রোগ-শোকের জন্য হয় না। যখন প্রার্থনা করতে শুরু করবেন, হে ঠাকুর, আমার যেন এই আমিত্বটা চলে যায়, মেকানিক্যাল ভাবে বলে যাচ্ছেন, সবটাই মুখের কথাতেই চলছে, কিন্তু এই মুখের কথা যেদিন ব্যাকুলতায় চলে যাবে, সেদিন পর্দা সরে যাবে।

ঠিক ভক্তের লক্ষণ আছে। আপনি কি ভক্ত? আপনি যদি নিজেকে ভক্ত মনে করেন, তাহলে আপনার কিছু লক্ষণ থাকতে হবে। আপনাদের যাঁদের সময় কাটে না, যাঁদের ইচ্ছে আছে যে, জীবনে একটা ভাল কিছু নিজের জন্য করি। আপনারা তাহলে কথামৃতকে আধার করে একটা রিসার্চ করুন, বিষয় হবে –ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান। কথামৃতে ঠাকুর ভক্তকে নিয়ে কি কি বলেছেন, শুধু ভক্তকে নিয়েই একটা রিসার্চ করুন, কি শুধু ভক্তিকে নিয়ে, কি শুধু ভগবানকে নিয়ে। নিজের জন্য করুন, কাউকে দেখানোর জন্য না। আপনার জীবন পাল্টে যাবে। এই কাজ করতে গিয়ে যদি পাঁচ বছর, দশ বছর লেগে যায়, লাগুক; এটাই একটা সাধনা। যদি মনে করেন, দুদিনের জন্য সাধনা করলেই হবে; এভাবে হয় না। যেখানে কলেজের একটা ডিগ্রি দু-দিনে হয় না, কম করে তিন থেকে চার বছর অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে হবে, সেখানে আপনি বলছেন দু-দিনে ধর্ম সাধন করে নেবেন, তা কি কখন সম্ভব?

গুরুর উপদেশ শুনে স্থির হয়ে থাকে। আপনারা এতজন শুনছেন, আপনি নিশ্চয় আরও শত শত ভক্তকে জানেন, আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন তো কজন আমাদের এই ক্লাশ শোনেন। আগরতলা থেকে একজন এসে বলছিলেন, 'মহারাজ আপনার ক্লাশগুলো শুনি'। আমি বললাম, 'ভাই আরও চারজনকে শোনাও'। উনি বললেন, 'মহারাজ অনেককে দিয়েছি, ওরা বলে মাথা ফেটে যায়'। মাথা কেন ফেটে যাবে? ঠাকুর বলছেন, গুরুর উপদেশ শুনে স্থির হয়ে থাকে। স্থির যখন হতে পারছেন না, তার মানে আপনার মধ্যে কিছু গোলমাল আছে। কথামৃতের ব্যাখ্যা একজন সন্ন্যাসী করছেন, নিশ্চয় আবোল-

তাবোল কিছু বলছেন না, সেটা শুনতে আপনার ইচ্ছে করছে না, তার মানেই আপনার ভক্তিতে বিরাট বড় একটা প্রশ্ন চিহ্ন আসছে। ঠাকুর খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন।

বেহুলার গানের কাছে জাতসাপ স্থির হয়ে শুনে, কিন্তু কেউটে নয়। আপনি কি জাতসাপ, না কেউটে? ঠাকুর গ্রামে বড় হয়েছিলেন, সাপের ব্যাপারে অনেক কিছু জানতেন। বেহুলার গান করে যেখানে সাপের খেলা দেখায়, সেখানে ওই গানের সামনে জাতসাপ স্থির হয়ে যায়। জাতসাপ কি? বলা হয় যে, জাতসাপ শিবের গলায় থাকে। গোখরো জাতের যে সাপ, যে সাপকে নাগ বলা হয়, এটা হল জাতসাপ। কেউটে সাপের স্বভাব অন্য রকম, ভগবান শিবের গলায় কেউটে থাকে না। স্থির মানে, হাত-পা স্থির, ইন্দ্রিয়গুলো একেবারে স্থির, মন দিয়ে শুনে যাচ্ছে, এটাই ধ্যান। যাঁরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত করেন, যিনি করেন সুর, লয়, তানে তিনিও তন্ময় হয়ে যান আর যিনি শ্রোতা তিনিও ওই সঙ্গীতের মধ্যে ডুবে যান। এটাই ধ্যান।

আমি যখন কলেজে পড়ি সেই সময় ভারতনাট্যমের একজন নামকরা মহিলা শিল্পী ছিলেন, তাঁর নাম স্বপ্নসুন্দরী। আমাদের কলেজের একটা অনুষ্ঠানে ওনাকে নিয়ে আসা হয়েছিল। কলেজের বড় অডিটোরিয়ামে আমিও দেখতে গেছি। কলেজের ছেলেরা সব মডার্ন, হলেই অনেকে সিগারেট ধরিয়েছে। স্বপ্নসুন্দরী নাচ থামিয়ে দিলেন। তিনি স্টেজের সামনে এসে বলছেন, 'এই নৃত্য আমার জন্য সাধনা, দয়া করে অডিটোরিয়ামে কেউ সিগারেট খাবেন না'। সঙ্গে সঙ্গে যারা সিগারেট খাচ্ছিল, ফেলে দিল। মহিলার কমাণ্ড দেখুন। কিন্তু তখনও আমার বয়স কম, এত বোঝার ক্ষমতা আমার হয়নি যে, একটা নাচ কি ভাবে একটা সাধনা হতে পারে। ওই ঘটনার পর আজ প্রায় পয়তাল্লিশ বছর হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও আমি ওই ঘটনাটা ভুলিনি। কি কমাণ্ড, যেখানে তিনি বলছেন, This is Sadhana for me, please stop smoking। সবাই ফেলে দিল সিগারেট।

তন্ময় হয়ে যাওয়া, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হচ্ছে, যিনি ব্যাখ্যা করছেন তাঁর জন্য এটা সাধনা, যিনি শুনছেন তাঁর জন্যও এটা সাধনা। এটা জাতসাপ না হলে হবে না। রোজ সকালে উঠে বিচার করবেন, আমি কি জাতসাপ। জাতসাপ মানে, ঈশ্বরীয় কথা শুনলে, ঈশ্বরের বর্ণনা শুনলে যদি মনটা স্থির হয়ে যায়। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে থাকতেন, অনেকে দেখা করতে আসতেন, ঠাকুর কথা বলছেন, কেউ শুনছেন আবার কেউ বলছে, 'আর কতক্ষণ বসবি'; আবার একটু পরেই বলছে, 'তুই থাক আমি নৌকাতে গিয়ে বসছি'। তাঁদের অনেকের হয়ত বুদ্ধি আছে, তাঁদের অনেকে জীবনে হয়ত সফল হয়েছিলেন; এরা কিন্তু জাতসাপ নয়। জাতসাপ হলে বেহুলার গান শুনলে স্থির হয়ে যাবে।

আর-একটি লক্ষণ –ঠিক ভক্তের ধারণা শক্তি হয়। শুধু কাচের উপর ছবির দাগ পড়ে না, কিন্তু কালি মাখানো কাচের উপর ছবি উঠে, যেমন ফটোগ্রাফ; ভক্তিরূপ কালি।

ফটোগ্রাফির একটা লম্বা ইতিহাস আছে, এক সময় আমি এর উপর অনেক পড়াশোনা করেছিলাম। ফ্রান্সে এনারা বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা করতে শুরু করলেন, কোন কেমিক্যালের উপর কিভাবে ইমেজ পড়বে। প্রথমের দিকে ছবি তৈরী করতে গিয়ে বর্তমান কালে জেরক্স যে প্রসেসে হয় ওই প্রসেসে চলে গেলেন। তারপর যখন নেগেটিভের আইডিয়া এলো, সেখান থেকে তখন কিভাবে ওটাকে পজিটিভে কনভার্ট করা যায়, এসব নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা-নিরিক্ষা চলতে থাকল। তবে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে পুরনো যে ছবি আছে, সেটাকে নিয়ে গবেষণা করে বার করা হয়েছে প্রথম ছবি কিভাবে তৈরী হল। প্রথমের দিকে যে ছবি হত তার এক্সপোজার দিতে ছয় ঘন্টা লাগত। প্রথম যে ছবি নেওয়া হয়েছিল সেটা জানলা দিয়ে বাইরের একটা দৃশ্যকে বন্দি করা হয়েছিল। অনেক টেকনিশিয়ানসরা বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রকম পরীক্ষা করে ছবি তোলার কলাকৌশল বার করেছিলেন। তৎকালীন ফরাসী সরকার ঠিক করল, ফটোগ্রাফি বিদ্যাটা সরকার নিয়ে নেবেন, বিদ্যাটা খুব দরকার। সরকার যদি এই বিদ্যাকে নিয়ে উদ্যোগ নেয় তবেই এই বিদ্যা জনসাধারণের মধ্যে যাবে। যার জন্য ফটোগ্রাফির উপর পেটেন্ট

হল না, কারণ সরকার এই বিদ্যার পুরো রিসার্চটা নিয়ে নিল। আগেকার দিনে কাচের উপর সিলভার নাইট্রেট লাগানো হত, সেটাকে পরে পজিটিভে পাল্টানো হত। পরে তো প্লাস্টিকের রিল এসে গেল।

ভক্তের লক্ষণ হল জাতসাপ, শুধু শুনবে না। সাপের কান হয় না, সাপের শরীরের যে চামড়ায় যে কম্পন হয়, ওই কম্পন দিয়ে সাপ বুঝতে পারে। যার জন্য সাপ মাটি দিয়ে যাওয়ার সময় কেউ যদি মাটিতে ভারি আওয়াজ করে, সাপ ভয় পেয়ে যায়। কারণ তার পুরো শরীরটাই কান। সাপ আদপে বেহুলার গান শোনে কিনা জানা নেই, কিন্তু স্থির হয়ে যায়। গানের শব্দে একটা কম্পন নিশ্চয় হয়, সেই কম্পনটাই ওকে জানিয়ে দিচ্ছে কি হচ্ছে। এর সাথে আর-একটা লক্ষণ আছে; শুধু স্থির হয় না, ধারণা করতে পারে। শাস্ত্রের কথা ধারণা করা, আচার্যের কথা ধারণা করতে পারা অত্যন্ত কঠিন। আমি সেইজন্য ক্লাশে আমার পরিচিতদের বলি, প্রত্যেক ক্লাশে নোটস্ নেবেন। ক্লাশ পুরো শোনা হয়ে গেল, এবার দেখুন কোন কথাগুলো আপনার ভাল লাগল। ডাইরিতে অন্ততঃ পাঁচটি কথা লিখে রাখুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ক্লাশে আমি যা বলি, তার মধ্যে অন্ততঃ পাঁচটি কথা তো অবশ্যই লেখার মত হয়। দশটা পয়েন্ট লিখতে পারলে আরও ভাল। আর কিছু হোক বা না হোক, এতে নিজের ধারণা শক্তি বাড়ে। শুধু শুনে যাচ্ছেন, ওতে কিছু হয় না। যখন আপনি মনন করবেন, মনন করার জন্য লেখা অনেক ভাল। আর তা নাহলে, ঠাকুরের মত সাধনা করে আপনার যদি সিদ্ধি হয়ে যায়, তাহলে হবে। ভক্তের আর-একটি লক্ষণ কি?

আর-একটি লক্ষণ। ঠিক ভক্ত জিতেন্দ্রিয় হয়, কামজয়ী হয়। গোপীদের কাম হত না।

পুরুষ হলে নারী দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে না; নারীর ব্যাপারে আমার জানা নেই। এখানে ঠাকুর কাম বলতে পরিষ্কার sex desiresকেই বলছেন। বলছেন, গোপীদের কাম হত না। নারদীয় ভক্তিসূত্রে এটাকে খুব সুন্দর ভাবে বলা হয়েছে –*ন তু কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ*। যে কোন সাধন যখন হয়, সেখান নিরোধ করা হয়, নিরোধ মানে আটকানো। সেইজন্য ওখানে কোন কামনা থাকতে পারেনা। নারদ উদাহরণ দিচ্ছেন, *যথা ব্রজগোপীকানাম্*, ব্রজগোপীরা যেমন ছিলেন। কারণ, কামনাকে যদি আটকানো না হয়, তাহলে কি হবে? *জারানামিব*, তাহলে তো নারী-পুরুষের প্রেমের মত হয়ে যাবে। ভক্তি আর জাগতিক প্রেমের এখানেই তফাৎ। ভক্তি হল পরমাপ্রেম; আর জাগতিক প্রেমে থাকে দেহের চাহিদা। ভক্তের দেহের চাহিদা কমে যায়, শরীরের কামগন্ধ কমে যায়।

শরীরে একটা কামগন্ধ হয়, এটা অনেকে হয়ত জানেন না, কিন্তু আজকে কেমিক্যালি এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিকরাও এই নিয়ে প্রচুর রিসার্চ করেছেন, আর পরিষ্কার বলছেন; নারী আর পুরুষ যখন এক অপরের কাছে যায়, তখন গন্ধ যদি ভাল লাগে, তখন ওরা দুজন মিলবে। শরীরের গন্ধ যদি পছন্দ না হয়, তাহলে এক অপরের জন্য নয়। আসলে এটা কামগন্ধ, এটা শুধু শরীরের গন্ধ না। পশুদের মধ্যেও এই কামগন্ধের ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার বোঝা যায়। নারী পুরুষ সবারই কামগন্ধ থাকে, অনেক সময় গন্ধটা তীব্র থাকে। সাধুরা সেইজন্য মহিলাদের সঙ্গে মিশতে চান না। সত্যিকারের একটা তীব্র গন্ধ আসে। ঠাকুর এটাই বলছেন, গোপীদের কাম হত না, শুধু যে হত না তা নয়, কামগন্ধ পর্যন্ত ছিল না। আপনাদের শুনে মনে হবে, এটা যে আধ্যাত্মিক ভাবে বলা হচ্ছে; তা না এটা পুরোপুরি বাস্তবিক। ইন্টারনেটে একটু সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন।

আমরা ১৮৮৩ সালের সেই ১০ই মার্চ-এর বর্ণনাতেই আছি। এইদিন ঠাকুর অনেক কথা বলেছিলেন আর একের পর এক ভক্তরা এসেই যাচ্ছেন। বেলঘরের ভক্তরা এসেছেন, ঠাকুর এখন তাঁদের সাথে কথা বলছেন।

ভক্তের লক্ষণ নিয়ে কথা চলছে। সেখানে ভক্তের একটা লক্ষণ বলতে গিয়ে ঠাকুর বললেন, ভক্ত হল জাতসাপ। ভক্তরা যখন ঈশ্বরীয় কথা শোনেন তখন স্থির হয়ে যান। যাদের মধ্যে সংসারী ভাব

আছে, বিষয়ের ভাব প্রবল; এদের ধারণা করা তো দূরের কথা, স্থির হয়ে শুনতেও পারে না। বিভিন্ন ধরণের আচার-আচরণ, রিচুয়ালস আছে, এগুলো এজন্যই দরকার। ছোট বাচ্চারা ধর্ম তত্ত্ব নিতে পারবে না। রামকথা, কৃষ্ণকথা নিয়ে যে পাঠ হয়, সেটাও একটু স্থির হয়ে বসে শুনতে পারবে না। কিন্তু পূজো, মেলা, উৎসব আদি যদি হয়, এসবের সঙ্গে সে আনন্দের সাথে জুড়ে যাবে। এইজন্যই রিচুয়াল, পালা-পার্বণ এগুলো একটু দরকার। প্রত্যেক ধর্মেই এই জিনিসগুলো আছে। একটা আচার পালন করতে বললে অনেকে বলবে, এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি; কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। আমরা পালন করছি কারণ এই জিনিসটাই আমার ধর্মকে, আমার সমাজকে পরিভাষিত করে; কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। এর আরও গভীরে যদি যাও, তাহলে তুমি দেখবে এর পিছনে একটা শ্রেষ্ঠতম, উচ্চতম দর্শন রয়েছে।

কথামৃত মাস্টারমশাই এটা দিয়েই শুরু করেছিলেন, প্রথমের দিকে আছে যেখানে প্রতিমা পূজা নিয়ে তিনি ঠাকুরকে বলছেন –লোকেদের তো বোঝাতে হবে যে মাটির প্রতিমাতে ভগবান নেই। ঠাকুর শুনে খুব রেগে গিয়েছিলেন, যার জিনিস তিনি বোঝাবেন, তুমি বোঝাবার কে? তুমি এত প্রশ্ন করার কে? তুমি কি ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করেছ? পালন করে কি তোমার অসুবিধা হচ্ছে?

ঠাকুর এরপর বললেন, ভক্ত জিতেন্দ্রিয় হয়, কামজয়ী হয়। অনেকের ভিতরেই এই চিন্তাটা আসে যে –আমার ভিতরে এখনও কাম বাসা বেঁধে আছে। আরে ভাই, কাম তো থাকবেই। কাম আছে বলেই আমরা জন্ম নিয়েছি। বেদে কামের উপর একটা সূক্ত আছে, সেখানে খুব সুন্দর বলছেন – *কামাস্তদগ্রে সমবর্ততে*। সৃষ্টি যখন হল, তখন ঈশ্বরের মনে কামনটাই তো এলো; আমি এক আমি বহু হব, সেই কাম সবারই ভিতরে রয়েছে। আদম আর ঈভ ইডেন গার্ডেনে আছেন। তাঁরা একটা পাপ করলেন, ঈশ্বরের আদেশ পালন করলেন না। খ্রীশ্চানদের মতে সেই original sin এখনও চলছে। কাম তো থাকবে, সংসারে স্বামী-স্ত্রী আছেন, কাম তো থাকবেই। কাম জিনিসটা কি? বলছেন, যখন ওটা থেকে দূরে আছেন, মনের ভিতর যখন ওটা ঘুরপাক খায়, শুধু ঘুরপাক খায় না, দেহমনকে অস্থির করে দেয়। চোখের সামনে একটা জিনিস এলো, একটা ভাল খাবার এলো, আপনি আনন্দ করে খেলেন, এতে দোষের কিছু নেই। ঠাকুরও চেঁচিয়ে ভক্তদের বলছেন, ওরে মাল এসেছে। কোন ভাল খাবার, মোহনভোগ বা জিলিপি আদি কিছু হয়ত এসেছে, প্রিয় জিনিস দেখে খুশি হওয়াতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু দেখতে হবে যখন পাচ্ছেন না, তখন মনের চাঞ্চল্যটা কেমন?

বেলঘরের ভক্তরা এসেছেন, ঠাকুরকে কিছু প্রশ্ন করেছেন। ঠাকুর তাঁদের বলছেন, **তা তোমরা সংসারে আছ তাহলেই বা; সংসারে থাকলে দোষের কিছু নেই তো। এতে সাধনের আরও সুবিধা, যেমন কেল্লা থেকে যুদ্ধ করা**।

বিষয়টা খুব মনোগ্রাহী, চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। কারণ আমাদের কাছে অনেকেই এসে বলেন, মহারাজ, কবে যে সংসার থেকে মুক্তি হবে। আমরা সন্ন্যাসীরা যে বেলুড় মঠে আছি, এটাও ঠাকুরের একটা সংসারই। এখানে উদ্দেশ্যটা পুরো আলাদা। সংসারে অনেক রকম যন্ত্রণা। সবচেয়ে প্রথম যন্ত্রণা হল, আপনার স্বাধীনতা থাকে না; পাঁচজনের ইচ্ছানুযায়ী আপনাকে সব কিছু করতে হয়। সন্ন্যাসী এই ব্যাপারে স্বাধীন হয়ে যায়। সন্ন্যাসী আর সংসারীর মধ্যে এটা একটা বিরাট তফাৎ। কিন্তু বাড়িতে একটা পোষা কুকুর আর রাস্তার যে কুকুর, তাতে একটা তফাৎ হয়। রাস্তার কুকুর পুরো স্বাধীন, কিন্তু কোথায় কি খাবার পাবে, কোথায় শোবে কোন ঠিক নেই। কিন্তু বাড়ির যে পোষা কুকুর তার এই সুবিধাগুলো আছে, কিন্তু স্বাধীনতা নেই। আপনি কোনটা চাইছেন? কুকুরের সঙ্গে তুলনাটা ঠিক না, কিন্তু জিনিসটা অনেকটা তাই।

একটা সময় আমি উত্তরকাশীতে ছিলাম। সেই সময় উত্তরকাশীতে আমাদের একটা কুঠিয়া ছিল। কুঠিয়াতে আমাদের কোন ব্যবস্থা ছিল না। পরে গ্যাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, নিজের রান্নাটা করে নেওয়া যেত। জীবনে আমি রান্নাঘরে ঢুকিনি, ওখানে ছিলাম বলে টুকটাক একটু রান্না করতে হত।

শীতের সময় আমার একবার খুব জ্বর হয়। ডাক্তারের কোন ব্যবস্থা নেই, উত্তরকাশীর এটাকে আশ্রম না বলে কুঠিয়া বলাটাই ঠিক। শীতের সময় অন্যান্য ঘরে কেউ থাকেন না, তবে সেই সময় একজন ছিলেন। কিন্তু ওখানে যাঁরা আছেন স্বাধীন ভাবেই আছেন। আশা করাটাও ঠিক না যে, ওনারা আপনাকে বিশেষ কোন সাহায্য করবেন। জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছি। একদিন গেল, দুদিন গেল, তৃতীয় দিন মনে হল আপেল বা অন্য একটু কিছু খেতে হবে। বাধ্য হয়ে আমার সন্ন্যাসী ভাইকে বলতে হল, দাদা, আমাকে দুটো আপেল কিনে এনে দেবেন? বাজার দেড় কিলোমিটার দূরে। উনি গেলেন। পাহাড়ি রাস্তায় দেড় কিলোমিটার যাওয়া, দেড় কিলোমিটার আসা, তিন মাইল হেঁটে উনি এনে দিলেন। ওখানে অন্নসত্র থেকে আমাদের ভিক্ষা করে খেতে হয়। অন্নসত্রে আপনাকে পাঁচটা রুটি আর একটু ডাল দিয়ে দেবে। পরের দিন একটু কিছু খেতে হবে, কিন্তু ওই রুটি-ডাল খাওয়া যাবে না। তেতো জিনিস একেবারেই সহ্য হয় না। কিন্তু জ্বরের মুখে একটু তেতো জিনিসই খেতে ইচ্ছে করল। ওই জ্বরে আমি তিন কিলোমিটার আপ-ডাউন করে বাজার থেকে করলা নিয়ে এলাম। ওই জ্বরের মধ্যে করলা কেটে গ্যাসে ভেজে নিয়ে খেলাম।

স্বাধীন জীবনের কথা দেখতে শুনতে সবারই ভাল লাগে। ভুবনেশ্বরের বাজারে আমাদের আশ্রম থেকে মহারাজ বাজার করতে গেল, দোকানের এ্যাসিস্ট্যান্ট তাঁকে বলেছিল –ভলা, মঠর খাউছ খট্টর শোইছ; ভালই আছ, মঠের খাচ্ছ আর খাটে শুচ্ছ, তোমার আর কিসের চিন্তা। সন্ন্যাস জীবনে এই ধরণের সমস্যা থাকবে। এটা তো একটা সাধারণ সমস্যার কথা বলা হল। সাধুদের জীবনে যে কত রকমের সমস্যা ইয়ত্তা নেই। সবচেয়ে বড় হল, কোন নিরাপত্তা নেই। আমাদের একটা সেন্টারে কোন এক মহারাজের সঙ্গে সেখানকার এক স্টাফের কথা কাটাকাটি হল। সেখানে স্টাফ বলছে, 'মহারাজ, আপনার দাম তো মাত্র পনের পয়সা'। পনের পয়সা মানে একটা পোস্টকার্ড। ঠিক এই ভাষায় বলেছিল। 'একটা পোস্টকার্ডে আপনার নামে যদি বেলুড় মঠে কমপ্লেন করে দিই না, এক্ষুণি আপনার ট্রান্সফার হয়ে যাবে'। একেবারে সত্যি কথা। আদেশ হয়ে গেল, এবার বোচকা-বুচকি নিয়ে বেরিয়ে আসুন। নূতন কোন সেন্টারে যাবেন, সেখান নূতন করে সব মানিয়ে নিতে হবে।

সন্ন্যাসীও মানুষ; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি সবটাই সন্ন্যাসীদের মধ্যে থাকবে। এক আধজনের হয়ত নাও থাকতে পারে। কিন্তু তাঁর বয়স হয়ে গেছে, তিরিশ বছর তিনি কেমন ছিলেন আমাদের জানাও নেই, কারণ তাঁদের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা কবেই উপরে চলে গেছেন। ভিতরের এই জিনিসগুলো থাকবে, কারুর একটু বেশি, কারুর একটু কম। সেগুলো কি করে প্রকাশ পাবে? এগুলো প্রকাশ পাবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলো নয়। তখন কি হয়? নানান রকমের ছটফটানি হবে। ভিতরে যে রাগের গুমোট, অভিমানের যে গুমোট; শরীর খারাপ হয়ে যায়।

বর্তমান অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ মজা করে বলতেন, 'ঠাকুর বলতেন, কলিতে অন্নগত প্রাণ, আমাদের ঔষধগত প্রাণ'। আমার পরিচিত একজন মনে করতেন সাধুবাবা কোন মন্ত্র বলে দিলে রোগশোক সব সেরে যাবে। কিছু দিন আগে আমার কাছে একজন এসে বলছেন, 'এই দেখুন আমার এই এই রোগ হয়েছে, কৃপা করে একটু যদি বলে দেন কি করলে আমার সব রোগ ভাল হয়ে যাবে'। আমি তাঁকে হেসে বললাম, 'আমাদের বেলুড় মঠে এসে দেখুন, যত বৃদ্ধ সাধুরা আছেন তাঁদের মেডিক্যাল বিল কত'। আগেকার দিনে আমরা দেখেছি, সাধুদের যদি এ্যান্টিবায়োটিক লাগে, ওই সাধুকে দেওয়া হত না, কারণ আমাদের অত টাকা নেই। খুব বেশি পুরনো কথা না, পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগেকার কথা। সন্ন্যাসীদের কোন সিকিওরিটি নেই; লোকেরা সাধুদের ভিতরের অত খবর জানেন না।

সাধুদের ইমোশান এ্যাক্সপ্রেস করার জায়গা নেই, আপনার ভিতরে সেই রকম কোন রাগ থাকলে বার করতে পারবেন না। আগে বলেছিলাম, শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের একজন সেবক একটা বাচ্চাকে দেখে গালটা টিপে একটু আদর করতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী

সেবককে আটকে দিলেন। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে বাৎসল্য ভাব আছে। মূল জিনিসটা হল, পার্সোনালিটির টাইপ আলাদা। আমি একটা ঘটনা বলেছিলাম –একজন মহারাজকে দেখেছিলাম খুব হাসিখুশি, বৃদ্ধ অবস্থাতেও উনি খুব হাসতেন। আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মহারাজ, এই বয়সেও আপনি এত হাসিখুশি থাকেন কি করে? উনি তখন বলছেন যে, উনি যখন নূতন জয়েন করেছিলেন, সময়টা তখন ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে হবে। নূতন শাখা কেন্দ্রে জয়েন করেছেন। সেখানে অনেক বয়স্ক মহারাজরা ছিলেন, তাঁদের কেউ খিটখিটে, কেউ গোমড়া ইত্যাদি। তাঁর যিনি হেড, সেন্টারের সেক্রেটারী, তাঁকে গিয়ে বলছেন, 'আচ্ছা মহারাজ, ওই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ও-রকম কেন'? সেক্রেটারী বলছেন, 'প্রথম থেকেই ওই রকমই ছিলেন'। কদিন পর আর-এক জনের নামে জিজ্ঞেস করলেন, 'উনি এ-রকম কেন'? 'প্রথম থেকে ওই রকমই ছিলেন'। পরে আমি বুঝে গেলাম, যে যেমন আছে, সে প্রথম থেকেই এই রকমই ছিল।

আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে, 'মহারাজ, আপনি কেন সন্ন্যাসী হলেন'? বুঝতে পারছি, কোন একটা রসালো উত্তর আশা করছে। কেউ বুঝতে পারে না যে, আমরা সন্ন্যাসীরা প্রথম থেকে এই রকমই ছিলাম। স্বামী বিবেকানন্দ কি একদিনেই বিবেকানন্দ হয়ে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছুঁয়ে দিলেন আর নরেন স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে গেলেন? তাহলে তো সবাই ওই রকমই হয়ে যাবে। কই হল না তো। ঠাকুর কত লোককেই তো ছুঁলেন, কই আর একটাও স্বামী বিবেকানন্দ হল না তো। স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম থেকেই এই রকমই ছিলেন। রাত্রিতে ঘুমোতে যেতেন, চোখ বুজলেই জ্যোতিদর্শন। সাধু মহাত্মারা অনেক তপস্যা করে, অনেক ধ্যান ধারণা করে জ্যোতিদর্শন করেন, আর রোজ রাত্রে ঘুমোবার সময় নরেনের জ্যোতিদর্শন হত। স্বামীজী প্রথম থেকে এই রকমই ছিলেন। ঠাকুর প্রথম থেকে এই রকমই ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের সবারই প্রতি যে ভালবাসা, সবারই প্রতি যে করুণা, প্রথম থেকে মা এ-রকমই ছিলেন। সন্ন্যাসী যাঁরা হন, এনারা প্রথম থেকে এই রকমই ছিলেন, sudden conversion বলে কিছু হয় না।

ভগবান বুদ্ধের নামে অনেক কথা বলা হয়, তিনি সিদ্ধার্থ ছিলেন, তিনি এটা দেখলেন, ওটা দেখলেন, বৃদ্ধ দেখলেন, রোগী দেখলেন, সন্ন্যাসী দেখলেন। কলকাতায় আমাদের হাসপাতাল আছে, রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠান, শিশুমঙ্গল, ওখানে গেলে আপনি চারটে এক সঙ্গেই দেখতে পাবেন। সেখানে রোগী আছে, বৃদ্ধ আছে, মরা আছে আবার সন্ন্যাসীও আছে। সেবা প্রতিষ্ঠানে এগুলো দেখে দেখে কজন ভগবান বুদ্ধ হয়েছেন? এভাবে কখন কারুর হয় না, হবেও না। হয় আপনার ভিতরে আছে, নয় আপনার নেই, ওর মাঝামাঝারি কিছু হয় না। যাঁর আছে, জন্মজন্মান্তর ধরে ওনার ওটা জমে আছে, জমে একটা জায়গায় আসছে। মনে হচ্ছে যে এটা হঠাৎ দুম্ করে হয়ে গেল, তাও দুম্ করে হয় না।

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান খুব সুন্দর বলছেন, *তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্*। *পৌর্বদেহিকম্*, আগে আগে যে শরীর ধারণ করা হয়েছিল, সেই শরীরে সে অনেক সাধনা করেছে, সাধনা করে তার প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে গেছে। এই জন্মে এসে যখন ওই শরীর, সাধনার সঙ্গে যোগসূত্র হয়ে যায়, তখন সে পুরোপুরি ওইদিকে চলে যায়। না গিয়ে তো উপায় নেই, কারণ তার যে প্রবৃত্তি, তার যে স্বভাব চিরদিনই ওই রকম ছিল। সে যদি সংসার ছেড়ে বেরিয়েও যায়, তার জন্য দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলার কিছু নেই। সংসারে যারা আছে, তারা ওটার জন্যই প্রস্তুত, এতে দোষের কিছু নেই। কারণ আমাদের সবাইকে কিছু কর্ম শেষ করতে হয়। মাণ্ডুক্যকারিকার স্তরে যদি যান, যেখানে কোন কর্ম নেই, কোন কর্মফল নেই। ওটা তো শেষের কথা হয়ে গেল। এখন লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে। ঠাকুর অদ্বৈত জ্ঞানী কেমন হয় বলতে গিয়ে বলছেন, হাত কেটে দরদর করে রক্ত বেরোচ্ছে, বলছে, কই আমার তো কিছু হয়নি। তাহলে কার হয়েছে? হাতের হয়েছে। আমি আর আমার হাত, আমি আর আমার দেহ সম্পূর্ণ আলাদা। মিষ্টি মিষ্টি কথা –সবই ঠাকুরের ইচ্ছা, তিনিই সব করাচ্ছেন, তিনিই সব দেখছেন; এসব কথা শুনলে বিরক্তি লাগে। যেখানে আছেন ওখান থেকেই হবে, সংসার ছেড়ে আপনাকে বেরিয়ে আসতে হবে না। তাহলে উপায় কি?

যখন শবসাধন করে, মাঝে মাঝে শবটা হাঁ করে ভয় দেখায়। সংসারে এই শবসাধন। তন্ত্রক্রিয়াতে শবসাধন করা হয়, কোথায় হয় আমার জানা নেই। ঠাকুর এগুলো জানতেন। আগেকার দিনে অনেকে মৃতদেহ এমনি শ্মশানের আশাপেশে ফেলে রেখে চলে যেত। সেখান থেকে কোন শব টেনে এনে হয়ত শবসাধনা করতেন। বর্তমানে তো মরা পাওয়া যাবে না, কিভাবে যে তন্ত্রসাধন হবে ভগবানই জানেন। শবের উপর বসে সাধনা করার রীতি, কারণ মরা জিনিসটাই অপবিত্র ও ঘৃণার জিনিস মনে করা হয়, আবার ভীতিপ্রদ ব্যাপার। ওই শবের মধ্যে কিভাবে কোন আত্মার প্রবেশ হয়, সেই শব তখন মাঝে মাঝে হাঁ করে ওঠে। বাস্তবে কি হত আমার জানা নেই, তবে এদিক সেদিক বর্ণনাগুলো পড়ি; সেগুলোকে আবার বিশ্বাস করা মুশকিল। ঠাকুর বলছেন, **তাই চালভাজা, ছোলাভাজা রাখতে হয়। তার মুখে মাঝে মাঝে দিতে হয়**। এই হল সংসারে শবসাধন।

ভাবলে আতঙ্ক লাগে –আপনার বাবা-মা, আপনার স্ত্রী-সন্তান, আপনার কন্যা-জামাই, পুত্র-পুত্রবধূ সবাই এক-একটা শব, যার উপর বসে আপনি শবসাধন করছেন। গা শিউড়ে ওঠে ভাবলে। কিন্তু এটাই সত্য। যাঁরা আধ্যাত্মিক জগতে পা রাখতে চাইছেন, বা পা ফেলেছেন, তাঁরা তাঁদের যিনি প্রিয় তাঁর কথা একবার ভাবুন, আর মনে করতে থাকুন আপনি ওটা একটা শবসাধনা করছেন; আপনার জন্য সে তো একটা মড়া। তার উপর বসে আপনি শবসাধন করছেন। ভাবলে আতঙ্ক লাগারই কথা; কিন্তু এটাই সত্য। ওই শবের মধ্যে আত্মা হোক বা প্রাণ হোক বা অন্য কিছু হোক প্রবেশ করে। তখন শব মুখটা হাঁ করে ভয় দেখাতে শুরু করে। ওই সময় শবের মুখে একটু চালভাজা, ছোলাভাজা দিয়ে দাও, ব্যস্ ও শান্ত হয়ে গেল। স্বামী কি চাইছে, ওকে ওটুকু করে দাও ব্যস্ হয়ে গেল। স্ত্রী কি চাইছে, করে মিটিয়ে দাও, তারপর শান্তি। আমার এক বন্ধু বড় বিজনেসম্যান ছিলেন। উনি বলতেন, দেখুন আট ঘন্টা আমি আমার অফিসে বসি; দুই থেকে তিন ঘন্টা আমার আসা-যাওয়া করতে চলে যায়। রাত্রে বাড়িতে সাত থেকে আট ঘন্টা ঘুমোই। এইসব বলে বললেন, এত কিছু করে আমরা মোট দু ঘন্টা হাতে সময় থাকে যে সময়টুকু আমাকে আমার স্ত্রীর মুখোমুখি হতে হয়। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দুটি ঘন্টা পাই, আমি শুধু হাতজোড় করে হাঁ জী, হাঁ জী করতে থাকি, যা বলে আমি মেনে নিই। দিল্লির লোক। বলছেন, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দুটি ঘন্টা আমি হাঁ জী হাঁ জী করে দিলাম, বাইশ ঘন্টা আমার স্বস্তি। এটাই শবসাধন।

ঠাকুরও বলছেন, **তার মুখে মাঝে মাঝে দিতে হয়। শবটা ঠাণ্ডা হলে, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে জপ করতে পারবে**। এটাই শবসাধন। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, সংসারে আছ তাহলেই বা; এতে সাধনের আরও সুবিধা। সাধনের সুবিধা, যেটা বলা হল। তাহলে উপায়টা কি? সংসারে থেকে কিভাবে হবে। আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল তন্ময়তা, সংসারে তন্ময় হয়ে যাওয়া, রোমে যাওয়া, মজে যাওয়া। আমাদের একজন খুব নামকরা বড় মহারাজ, ওনার একটা জোর ধাক্কা লেগেছিল। খবরটা শুনে আমার একটুক্ষণের জন্য মনটা খারাপ লাগল। পরে আমি ওনার সঙ্গে দেখা করে বললাম, 'মহারাজ খারাপ লাগছে'। উনি খুব খুশি হয়ে বললেন, 'ভালই হয়েছে, আমিও মজে গিয়েছিলাম'। আমি ভাবছি, জীবনের প্রতি কতটা তিনি সজাগ। বলছেন, 'ওই কাজে আমিও মজে গিয়েছিলাম, ভালই হল, ঠাকুর ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন'। কোন কিছুতে মজে যেতে নেই। আপনার যে মা-বাবা আছেন, স্বামী-স্ত্রী আছেন, সন্তান আছেন, কোথাও মজে যাবেন না। সংসারে শবসাধন, সংসারটা শবসাধনের জন্য, যদি আপনারা এটাকে মনে রাখেন। আপনি আধ্যাত্মিক জীবনে এগোচ্ছেন, কোন অসুবিধা নেই, কারণ সংসারে শবসাধন। যে শব রাখা আছে ওটা সাধনার জন্য, সাধনা ব্যতিরেকে ওর অন্য কোন দরকার নেই। আপনার ভিতরে যে কামনা-বাসনাগুলি রয়েছে, যে ষড়রিপুগুলি রয়েছে, এটাকে বার করার জন্য শব, শবসাধনা করা ছাড়া সংসারে এর কোন উপযোগিতা নেই। কিন্তু তন্ময়তা যদি না থাকে, কোথাও যদি মনটাকে আপনি না রাখেন, আপনি পাগল হয়ে যাবেন।

কোন সাহিত্যিকের লেখা, কোন দার্শনিকের লেখা পড়লে বোঝা যায়, লেখকের জীবনে শান্তি ছিল কিনা, জীবনটা তাঁর কেমন ছিল। যারা হতাশাগ্রস্ত, তাদের মুখ থেকে শুধু আগুন বের হয়, তাদের কথাগুলো সামনের লোকের শরীরে ছ্যাঁকা দিয়ে দেবে। তিনি সাহিত্যক হন, দার্শনিক হন বা সাধারণ একজন মানুষ হন, যে ভালবাসা পায়নি, যে ভালবাসেনি, সে জগৎকে কি ভালবাসবে, তার থেকেও বাজে, সে ঈশ্বরকে কি ভালবাসবে? স্বামীজী বলছেন, তোমার মুখ যদি গোমড়া থাকে, ঘর থেকে তুমি বেরিও না। একজন মহারাজ একবার ঠিক করলেন উনি কারুর প্রণাম নেবেন না। আমি বিরক্ত হয়ে ওনাকে বললাম, 'আপনার যদি এত ঢং ঢাং থাকে আপনি ঘরের ভিতরে থাকুন, বাইরে বেরোবেন না। আপনাকে দেখলে লোকেরা স্বাভাবিক ভাবেই প্রণাম করতে আসবে, আপনি ছিটকে সরে আসবেন; এই ঢং ঢাংটা করবেন না'। যা হয়, কোন প্রেসার নেই, কোন বোঝা নেই, নিজের মত করে ঢং ঢাং করতে শুরু করে দেয় সব।

এই যে বলা হল, তন্ময়তার দিকে যাবেন না, সংসারে তন্ময় না হয়ে সব সময় নিজের লক্ষ্যটা পরিষ্কার রেখে এগোতে হয়। আপনি সন্ন্যাসী হন, আপনি সংসারী হন, আপনি যাই করে থাকুন, আগে ভেবে দেখুন আপনি কি সত্যি আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে চাইছেন? তাহলে কিছুই যদি না পারেন, দিনে বড় করে ঠাকুরকে বলা, হে ঠাকুর, আমি তোমার দিকে এগোতে চাইছি। পরিষ্কার করে বলতে হবে, ওখানে যেন ভাবের ঘরে কোন রকম চুরি না থাকে। হিন্দি বেল্টের সাধুদের মধ্যে ব্যাঙ্গ করে একটা ছড়ার প্রচলন আছে –ভকৎ জগৎকো ঠগৎ হ্যায়, ভক্ত পুরো জগৎকে বোকা বানায়; তারপরের লাইনে বলছেন, ভকৎ কো ঠগৎ যো সোঈ সন্ত, ভক্তকে যে বোকা বানায় সে সন্ত, মহাত্মা; ঔর যো সন্ত কো ঠগি সকে কহৎ উসে মহন্ত, যে সাধু মহাত্মাকেও ঠকাতে পারে সে হল মহন্ত। আপনি জগৎকে বোকা বানান, স্বামী-স্ত্রীকে, সন্তানকে বোকা বানান, কিন্তু ওই একটি জায়গায় ভাবের ঘরে চুরি চলবে না। ঈশ্বরের সামনে লোক ঠকানোর ব্যবসা করবেন না।

প্রফেট মহম্মদের একটা খুব নামকরা ঘটনা আছে। ওনার মেয়ের টাকার অভাব। উনি মেয়েকে বলছেন, 'আল্লার কাছে প্রার্থনা কর'। মহম্মদের মেয়ে বলছেন, 'যদি না হয়'? 'আল্লাকে আরও প্রার্থনা কর'। 'তাও যদি না হয়'? 'আরও বেশি করে প্রার্থনা কর'। একজন স্ত্রী এসে বলছে, স্বামী তার কথা শোনে না। আমি একটাই কথা সবাইকে বলি, স্বামীকে ভালবাস। আপনি স্বামীকে ছেড়ে দিতে চান, ছেড়ে দিন। ছাড়া তো কিছুই না, কেটে বেরিয়ে গেলেন শেষ। যদি না মানে? আরও ভালবাসবেন। তাতেও যদি না মানে? তাহলে আরও বেশি ভালবাসবেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, যাতে ওই পথে না যেতে পারে। যদি না হয়? আরও বেশি প্রার্থনা করুন। তাতেও যদি না হয়? তাহলে মাথা ঠুকে ঠুকে দিনে দু-বার করে প্রার্থনা করুন। চারবার করতে পারলে আরও ভাল। চব্বিশ ঘন্টা যদি করেন, তাহলে তো প্রার্থনা করার আর দরকারই হবে না। পরিষ্কার যেন থাকে, আমার এটাই চাই।

কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার আশেপাশে যারা আছে, পাড়ার মস্তান, পাড়ায় যত চ্যাংড়ারা আছে, সবাইকে খুশি রাখতে হয়। হোলি, দেওয়ালি, দূর্গাপুজায় আপনাকে চাঁদা দিতে হবে। আর এই কথাটা মনে রাখা, এনারা হলেন আপনার সংসারের বৈদ্য। সংসার একটা হাসপাতাল, সংসার ডাক্তারখানা; আমাদের যে নানা রকমের ইমোশানাল রোগ রয়েছে, কাম-ক্রোধ-লোভ আদি, এই ব্যাধিগুলো সারানোর জন্য এই সংসার, এই বোধটা যেন সব সময় থাকে। আমি একটা ঘটনার কথা জানি। আমাদের খুব নামকরা মহারাজ ছিলেন, গোপেশ মহারাজ। গোপেশ মহারাজ প্রচুর জপধ্যান করতেন। কোন কোন সেন্টারে যখন উনি থাকতেন, তখন সেখানে অনেক দিন থাকতেন। হঠাৎ কোন সময় ওখানকার সেক্রেটারিকে গিয়ে বলতেন, 'দেখো আমার রজোগুণটা বেড়েছে, আমি এই জায়গাতে একটু চাষবাশ করছি, আমি নিজেই সব কিছু করব। তোমাদের কাজের জন্য যেদিন এই জায়গাতে কিছু করতে হবে বলে মনে কর সব কেটে দেবে, তখন মনে করো না যে আমি এখানে চাষ করছি বলে জমিটা ছেড়ে রাখবে'। একবার কোন একটা সেন্টারে তিনি ভুট্টা চাষ করেছেন, বিরাট বড় বড় গাছ হয়েছে। ভিতরে

রজোগুণটা একটু বেড়েছে, ওটাকে বার করার জন্য কাজ করতে হবে। উনি এক ফালি জমিতে ভুট্টা লাগিয়ে তাতে জল দিচ্ছেন, সার দিচ্ছেন, নিড়েন দিচ্ছে; কিন্তু এই কাজে ওনার নিজের কোন স্বার্থ নেই। কাজের বাঈ যেটা জমে ছিল, বিষ যেটা জমেছিল সেটা যখন বেরিয়ে গেল, তিনি ফ্রী হয়ে গেলেন, আবার জপধ্যানে চলে গেলেন। আশ্রমে যখন ভুট্টা ফলতে শুরু করল, তখন উনি অন্য কোন সেন্টারে হয়ত চলে গেছেন। আশ্রমবাসীরা ভুট্টা খেতে খেতে মজা করে বলতেন, গোপেশ মহারাজের চাষের ভুট্টা।

সংসারেও এই ভাবটাকে ধরে রাখতে হয়। আপনার স্বামী বা আপনার স্ত্রী, আপনার সন্তান, অফিসে আপনার বস্, রাস্তায় বাসের কণ্ডাক্টর, রিক্সাওয়ালা, টোটোওয়ালা, যারা আপনাকে নিয়ে যাচ্ছে, এরা সবাই আপনাকে সাহায্য করছে। হাসপাতালে যেমন অনেক লোক থাকে, ডাক্তার আছে, নার্স আছে, ওয়ার্ডবয় আছে, আয়া আছে, সবাই মিলে আপনাকে সাহায্য করছেন বলে আপনি সুস্থ হয়ে উঠছেন। সংসারেও এতজন সবাই মিলে আপনাকে সারিয়ে তুলছে, এই বোধটা যেন থাকে। আমরা পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা অনেক জায়গায় বলেছি, এটাই পঞ্চ মহাযজ্ঞ। এদের প্রত্যেককে আপনার প্রতিদান দিতে হয়। এটাই শবসাধন, ঠাকুর এখানে এটাই বলছেন।

তাই পরিবারদের ঠাণ্ডা রাখতে হয়। তাদের খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করে দিতে হয়, তবে সাধন-ভজনের সুবিধা হয়।

আমি আমার কথা বলতে পারি; আমি তখন ইয়ং, মঠে এসে জয়েন করলাম। তখন এত কিছু বুঝতাম না, মহারাজদের ভাল লাগত, মহারাজরাও ভালবাসতেন, ভালবাসাতে চলে এলাম। তখন শুধু ভাবতাম, আমাকে কাজ করতে হবে। তারপর দেখলাম, এখানে কারুর কাজের দরকার নেই। কাজ করছ কারণ তোমার মধ্যে রজোগুণ আছে, সেই কাজের স্পৃহা থেকে মুক্তি যদি না পাও, তুমি ফেঁসে যাবে। স্বামী সুহিতানন্দজী আমাকে বলেছিলেন, তখন মঠে আমার কুড়ি বছর হয়ে গেছে, 'দ্যাখ, সব সময় মনে রাখবি, যে সেন্টারে আছিস সেখানে তোকে থাকতে দিয়েছে, খেতে দিচ্ছে, সেখানে যতটুকু করতে বলবে কাজ করে দিবি, তার বাইরে নিজের মত থাকবি'। আপনাদের জন্যও একই জিনিস, যে বাড়িতে আছেন, তারা খেতে দিচ্ছে, আশ্রয় দিচ্ছে, আর আপনার মধ্যে যত রকম ইমোশানাল চাহিদা আছে তারা সবাই মিলে সেগুলো মিটিয়ে দিচ্ছে। বিনিময়ে তাদের যতটুকু দেওয়া দরকার ততটুকু দেবেন, তার বাইরে এতটুকুও না, আপনার যেন একেবারেই তন্ময়তা না হয়। আর যদি ওদের ঠাণ্ডা না রাখেন তাহলেও বিপদে পড়বেন, কারণ তখন আপনি চোর; তাদেরকে আপনিই নিয়ে এসেছেন, এনে আবার তাদেরটাই চুরি করে নিয়ে নিচ্ছেন। বাড়ির লোকেদের প্যারাসাইটের মত আপনি চুষে নিচ্ছেন, এ-জিনিস কখনই করা যাবে না।

ঠাকুর এটাই ব্যাখ্যা করছেন, **যাদের ভোগ একটু বাকী আছে তারা সংসারে থেকেই তাঁকে ডাকবে**। এই কথাটা আমাদের ভাল করে মনে রাখতে হবে। আপনি সন্ন্যাসী হননি, তার মানেই আপনার ভোগ বাকি আছে। ভোগের ব্যাপারগুলো চটপট মিটিয়ে নিতে হয়। আমাদের সন্ন্যাসী ভাইদের আমি সব সময় বলি, 'দাদা, আমি যদি কামনামুক্ত হতাম, তাহলে তো আমার জন্মই হত না। একটু কম কামনা-বাসনা যদি থাকত, তাহলে শঙ্করাচার্যের মত জন্ম থেকেই সংসার থেকে বেরিয়ে যেতাম। তার থেকে আর-একটু যদি বেশি কামনা থাকত, তাহলে রঙ্গনাথানন্দজী, ভূতেশানন্দজীর মত সঙ্ঘে এসেও মুক্ত থাকতাম। এনাদের তুলনায় আমাদের কামনা বেশি, সেইজন্য সঙ্ঘে আছি'। সেইজন্য আমাদের কাজও করতে হবে আর দোষও থাকবে। বাইরের লোকেরা মনে করে সন্ন্যাসী মানে ব্রহ্মজ্ঞানী, আমরা তো তা নই। এতগুলো দোষ আছে বলেই তো আজ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হয়েছি, তা নাহলে তো আমার জন্মই হত না। আমাদের থেকেও যাদের বেশি কামনা-বাসনা, তাই তারা সংসারে আছেন, কিন্তু ভক্ত হয়ে আছেন।

নিতাই-এর ব্যবস্থা ছিল, মাগুর মাছের ঝোল, ঘোর যুবতীর কোল, বোল হরি বোল। নিত্যানন্দ লোকেদের এই কথাগুলো বলতেন, যাতে মানুষ আকৃষ্ট হয়ে ঈশ্বরের পথে আসে। আমরা আগে এর ব্যাখ্যা করেছে –মাগুর মাছের ঝোল মানে চোখের জল; যুবতীর কোল মানে ঈশ্বরের নামগুণগান কীর্তন করতে করতে মাটিতে গড়াগড়ি যাওয়া।

ঠিক ঠিক ত্যাগীর আলাদা কথা। ত্যাগের বহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছে। তেজী সন্ন্যাসীর রূপই আলাদা। আমাদের সন্ন্যাসের সময় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভজনানন্দজী মহারাজ খুব সুন্দর কথা বলেছিলেন। সন্ন্যাসের সময় বিরজাহোম করতে হয়, বিবাহতেও দেখবেন সেখানে একটা হোম করতে হয়। সন্ন্যাসীদের জন্য বিরজাহোম, আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে; মহারাজ আমাদের তখন বলছেন, 'এই যে দাউ দাউ করে জ্বলছে এই হল ত্যাগের আগুন, যার জন্য আমাদের গেরুয়াটা হল সেই আগুনের প্রতীক; যে আগুনে বেলপাতা আহুতি দিয়ে বলেছ, আমি সন্ন্যাসী। এই ত্যাগবহ্নি দাউ দাউ করে সব সময় জ্বালিয়ে রাখতে হবে যেন তার মধ্যে তোমার শরীরটা জ্বলজ্বল করে'। তখন আমার সবে সন্ন্যাসী হয়েছে, কথাগুলো শুনে আমি কেমন চার্জড আপ হয়ে গেলাম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগের ভাব থাকে না, না থাকুক, কথাগুলো শুনে রাখতে হয়। মাঝে মাঝে ওই কথাগুলো মনে পড়লে মনটাকে চাঙ্গা করে দেবে।

ঠিক ঠিক ত্যাগী কি রকম হন? **মৌমাছি ফুল বই আর কিছুতে বসবে না**। ঈশ্বর আর ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া ঠিক ঠিক ত্যাগী কোন কিছুতেই থাকবেন না। ঠাকুর একটার পর একটা উদাহরণ দিয়ে যাচ্ছেন, বলছেন, **চাতকের কাছে 'সব জল ধুর'; কোন জল খাবে না কেবল স্বাতী-নক্ষত্রের বৃষ্টির জন্য হাঁ করে আছে**। এটা একটা প্রচলিত কথা। আমি অনেককে জিজ্ঞেস করেছি, সত্যিই কি চাতক তাই করে? সঠিক ভাবে কেউ বলতে পারেননি, তবে বেশির ভাগ উত্তর হল –আমার জানা নেই।

ঠিক ঠিক ত্যাগী অন্য কোন আনন্দ নেবে না, কেবল ঈশ্বরের আনন্দ। ঠিক ঠিক ত্যাগী সাধু যেন মৌমাছি। গৃহীভক্ত যেন এই সব মাছি –সন্দেশেও বসে, আবার পচা গায়েও বসে।

অনেক আগে আমার তখন বয়স কম, শুনলাম একজন সন্ন্যাসী মঠ ছেড়ে সংসারে ফিরে গিয়েছিলেন। শোনার পর মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমার এক সন্ন্যাসী ভাই খুব সুন্দর কথা বলেছিলেন। 'আপনি দেখুন, ওর মধ্যে যদি সন্ন্যাসীর ভাব থাকে ও কিন্তু সংসারে টিকতে পারবে না। যদি টিকে যায়, তাহলে বুঝবেন কোন দিন সন্ন্যাসী ছিলই না। কিছু শুভকর্ম ছিল, সন্ন্যাসী হয়ে শুভকর্মটা কেটে গেছে'। সন্ন্যাসী কখন ত্যাগের আনন্দ ছাড়া অন্য কিছুর আনন্দ গ্রহণ করতে পারবে না। কোন কিছুরই না, কামিনী, কাঞ্চন, নাম, যশ কোন কিছুতে আকৃষ্ট হবেন না। দেখে মনে হবে যেন কিছুটা ওতেও আছে, কিছু এতেও আছে; কিন্তু একদিন একটা ফুঁ দিল সব শেষ। খুব ছোট শিশু এর ওর সবার কোলেই চলে যাবে, কিন্তু মার কোল ছাড়া ওর শান্তি কোথাও নেই। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসীও তাই, ঈশ্বরের আনন্দ ছাড়া সন্ন্যাসী আর কোন আনন্দ পাবে না। যতই রাস্তাঘাটে ঝালমুরি, ফুচকা খাই না কেন, আমরা জানি বাড়ির খাবার খাওয়ার মত শান্তি আর কোন খাবারে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু যাঁরা ভক্ত, তাঁরা সংসারে শবসাধন করেন। খুব সুন্দর কথা বলছেন ঠাকুর, **তোমরা এত কষ্ট করে এখানে এসেছ, তোমরা ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াচ্ছ**।

এই কথা আপনাকে বলা হয়েছে। আগে আমি বেলুড় মঠে থাকতাম আর ইউনিভার্সিটিতে ক্লাশ নিতে আসতাম, খুব হলে দুশো থেকে তিনশ মিটার হবে। আর এখানে যাঁরা ক্লাশে আসতেন বেশির ভাগই কত দূর দূর থেকে আসতেন, এত দূর থেকে আসতেন যে এখানে আসতেই তিন থেকে চার ঘন্টা লাগত। সাড়ে তিনটেতে আমাদের ক্লাশগুলো শুরু হত। গ্রীষ্মকালের ওই গরমে তাঁদের বারোটার সময় বাড়ি থেকে বেরোতে হত। তারপর লোকাল ট্রেন, বাস, টোটো ধরে এখানে পৌঁছাতেন। শীত,

গ্রীষ্ম, বর্ষা উপেক্ষা করে দিনের পর দিন এভাবে শাস্ত্রের কথা শুনতে আসা, কল্পনা করা যায়! আমাদের এক সন্ন্যাসী ভাই আমাকে মজা করে বলতেন, 'আপনার আর কি ক্রেডিট, ভক্তরা যাঁরা আসছেন তাঁরাই ধন্য; এত কষ্ট করে ঠাকুরের কথা শুনতে আসছেন'। সত্যিই তাই। এখানে কোন পজিটিভ কথা বলা হচ্ছে না, সত্য কথা বলা হচ্ছে।

যাদবপুর থেকে একজন এখানে এসেছিলেন। তিনি বলছেন, তাঁর বাড়িতে কোন অতিথি এলে তিনি অতিথিকে বেলুড় মঠ, মায়ের বাড়ি, স্বামীজীর বাড়ি, দক্ষিণেশ্বর সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান। কাউকে উপহার দেওয়ার হলে তিনি উদ্বোধন থেকে প্রকাশিত আমাদের ধর্মীয় বইগুলো দেন। ভদ্রলোকের কোথাও ঈশ্বরীয় ভাব এত জোরালো হয়ে গেছে বোঝা যায়। ধরতে পারছেন না ঠিকই, তাতে কি হল, *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ,* হঠাৎ কোন একদিন ঠাকুর হাত বাড়িয়ে টুক করে টেনে নেবেন। প্রস্তুতি হওয়া শুরু হয়ে গেছে। প্রস্তুতি যখন হয়ে গেল, রান্না যখন শুরু হয়ে গেছে, আর কিসের চিন্তা, খাবার আসতে কিছু সময়ের ব্যাপার মাত্র। এই যে আপনারা, টিভি সিরিয়াল ছেড়ে, সব আমোদ-আহ্লাদ ছেড়ে শাস্ত্রের কথা, ঠাকুরের কথা শুনছেন; তার মানে পায়েস রান্না শুরু হয়ে গেছে, আর মাত্র কিছুক্ষণের ব্যাপার। আঁচ যদি ভাল হয় তবে তো কয়েক মিনিটের ব্যাপার, আঁচ যদি মন্দ হয়, কয়েক ঘন্টার ব্যাপার। ঠাকুরের এই কথাটা অতি সুন্দর। এখানে কোন আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে না, একটা বাস্তব কথা বলছেন। বেলঘরের ভক্তদের বলছেন –তোমরা এত কষ্ট করে এখানে এসেছ, তোমরা ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াচ্ছ।

শ্রীমৎ স্বামী রাম মহারাজ ছিলেন, মোক্ষদা মহারাজ ছিলেন। অনেক আগেকার কথা, তখন ভাবিওনি যে আমাকে কোন দিন শাস্ত্রের ক্লাশ নিতে হবে। ওনারা বলতেন, 'দেখ, ভক্তরা যখন ঠাকুর, মা, স্বামীজীর কথা, ঈশ্বরীয় কথা, ধর্মের কথা শুনতে আসেন, তখন কত প্রস্তুতি নিয়ে আসেন। ঘরবাড়ির কাজ ফেলে রেখে, কেউ ঘরবাড়ির কাজ তাড়াতাড়ি সেরে দৌড়ে দৌড়ে কত দূর থেকে আসছেন। কিন্তু আমাদের সাধুরা সেভাবে প্রস্তুতি না নিয়ে যদি আসেন, সেটা ভক্তদের অসম্মান করা হয়। শ্রোতাকে সম্মান দিতে হয়'। এই কথাটা ধরুন ১৯৮৮ কি ১৯৮৯এর কথা, কিন্তু তখনই কথাটা খুব ভাল লেগেছিল। তার প্রায় কুড়ি বছর পর আমি ক্লাশ নিতে শুরু করলাম। কিন্তু সেদিন থেকে আমি মাথায় রেখেছিলাম যে, জীবনে কক্ষণ আমি এই রকম করব না। ক্লাশ থ্রী ফোরের বাচ্চাদের সামনেও যদি আমাকে বলতে হয়, তার জন্যও আমি একটা প্রস্তুতি নেব। প্রস্তুতি ছাড়া আমি কক্ষণ ক্লাশে যাব না। প্রস্তুতি এই জন্য নেওয়া যে, আমার নিজের জন্যও এটা দরকার। প্রস্তুতি এই জন্য যে, শ্রোতাকে সম্মান জানানো। কারণ একজন সন্ন্যাসীকে শুনতে যাঁরা কষ্ট করে আসছেন, তাঁরা ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঈশ্বরকে খুঁজে না বেড়ালে সে আসবে না।

সব লোক বাগান দেখেই সন্তুষ্ট, বাগানের কর্তার অনুসন্ধান করে দু-একজন। জগতের সৌন্দর্যই দেখে, কর্তাকে খোঁজে না।

আপনার বাড়ির লোক যাঁরা আছেন, পাড়ায় যে কজন আছেন, সবাই কিন্তু জগতের সৌন্দর্য দেখছেন, কর্তার কর্মকে দেখছেন। আপনারা যখন শুনতে চাইছেন, তখন এই চ্যানেল, সেই চ্যানেল, এই বাবাজী, সেই বাবাজী; তখন আপনি বলছেন, না, এই কর্মের যিনি কর্তা তাঁকে আমি চাই। এই যে ঠাকুরের দুটি কথা –'তোমরা সংসারে আছ, তাতে দোষের কিছু নেই'; আর 'সুবিধা আছে, যেমন কেল্লা থেকে যুদ্ধ করা'। কেল্লার ভিতরে থাকলে মনের অন্দরমহলে যে ইমোশানজনিত আবর্জনাগুলো রয়েছে সেগুলোকে সামলে নেওয়া যায়। আবর্জনাগুলিকে ভিতরে রেখে কেল্লার বাইরে এসে যুদ্ধে নামলে শেষ করে দেবে, বুলডোজার চালিয়ে দেবে। দ্বিতীয় কথা, 'সংসারে শবসাধন'। যতটুকু দরকার, ততটুকু দিয়ে দিলেন, এর বাইরে আর কিছু না। আর ইমোশানালি যাদের উপর আপনি নির্ভর করে আছেন, তাকে ততটুকু দিয়ে মিটিয়ে দিতে হয়। বাজারের যাওয়ার সময় একটা লিস্ট থাকে আমার এই এই

জিনিস দরকার, ঠিক তেমনি ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন বলেই এসব কথা শোনা। এই বোধটাকে জাগিয়ে রাখতে হয়।

ঠাকুরের এই কথাটা আমাদের যেন বারবার শুনতে মন চায় –তোমরা এত কষ্ট করে এখানে এসেছ, তোমরা ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াচ্ছ। আপনারা যাঁরা এই ধরণের ক্লাশগুলো শোনেন, বিশেষ করে এই ধরণের শাস্ত্রের কথা যাঁরা শোনেন, বুঝতে হবে যে, আপনারাও ঈশ্বরকেই খুঁজছেন। কেউ সকালে খাবে, কেউ দুপুরে খাবে, কারুর আবার খেতে খেতে অনেক বেলা হয়ে যাবে, কিন্তু খাবে সবাই। ঈশ্বর সবাইকে অবশ্যই কৃপা করবেন। এরপর ঠাকুর ষড়চক্রের কথা বলবেন।

যিনি গান করছিলেন, ঠাকুর সেই গায়ককে দেখিয়ে বলছেন –**ইনি ষড়্চক্রের গান গাইলেন। সে-সব যোগের কথা। হঠযোগ আর রাজযোগ। হঠযোগী শরীরের কতকগুলো কসরৎ করে, উদ্দেশ্য – সিদ্ধাই, দীর্ঘ আয়ু হবে, অষ্টসিদ্ধি হবে; এই সব উদ্দেশ্য**।

এর মধ্যে সিদ্ধাই, হঠযোগে সিদ্ধাই হয়, ঠাকুর কয়েকটা জায়গায় সিদ্ধাইএর বিষয়ে বলেছেন। ছোটবেলা সিদ্ধাই আদির কথা শুনে আমাদের জিনিসটাকে ভাল মনে হত। মঠে জয়েন করার পাঁচ-ছয় বছর শুধু ঠাকুরের কথা পড়তাম আর সেখানে তাঁকে সিদ্ধাইয়ের নিন্দা করতে দেখতাম। কিন্তু মনে মনে ভাবতাম, ইস্ কতকগুলো সিদ্ধাই যদি পেতাম, কি ভালই না হত। এখন বুঝে গেছি যে, ঈশ্বরের পথে গেলে সিদ্ধাই নিজে থেকেই আসে। তাহলে হঠযোগ আর রাজযোগে তফাৎ কোথায়? হঠযোগের কাছে সিদ্ধাই হল শেষ কথা। রাজযোগ বলেন, সিদ্ধাই আপনা থেকেই আসবে, কিন্তু ওর মধ্যে যদি ফেঁসে যাও তাহলে তুমি গেলে, ওখানেই আটকে থাকবে, আর এগোন যাবে না। এটা যে শুধু সিদ্ধাইতেই হবে তা না, জীবনে যা কিছু প্রলোভন আসবে আর ওর মধ্যে যিনি ফেঁসে যাবেন; তাঁর জীবনের উদ্দেশ্যটা ওখানেই ইতি হয়ে যাবে। ট্রেনে করে কোথাও যাচ্ছেন। যেতে যেতে ট্রেন থেকে একটা সুন্দর জায়গা দেখে আপনার খুব ভাল লাগল। সৌন্দর্যের প্রলোভনে আপনি ট্রেন থেকে নেমে গেলেন, আপনি আপনার গন্তব্য থেকে সরে গেলেন। কিন্তু যদি চলতে থাকেন, যেতে যেতে আরও কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য আসবে। সুন্দর দৃশ্য মানেই প্রলোভন; প্রলোভনের ফাঁদে পা দিলে গন্তব্যে পৌঁছাতে অনেক বিলম্ব হয়ে যাবে। সিদ্ধাই এমনিই আসে, আপনাদের যদি কোথাও মনে হয়ে যে, ঈশ্বরের পথে গেলে সিদ্ধাই আসবে কি আসবে কিনা জানা নেই; কিন্তু না, সিদ্ধাই নিজেই আসবে।

রাজযোগের উদ্দেশ্য –ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান, বৈরাগ্য। রাজযোগই ভাল। আজকাল লোকের 'যোগ' না বলে 'যোগা' বলে, শব্দটা হল 'যোগ'। যোগ দুই প্রকার –একটা হল শরীরের প্রতি প্রচুর জোর দেয়, আর-একটা হল, মন-নিয়ন্ত্রণের দিকে জোর। ঠাকুর বলছেন, রাজযোগই ভাল, এই কথা বলেই বলছেন –

বেদান্তের সপ্তভূমি আর যোগশাস্ত্রের ষড়চক্র অনেক মেলে। এরপর ঠাকুর কুলকুণ্ডলিনী নিয়ে বলবেন। এর উপর আলোচনা শুরু করার আগে দু-চারটে অত্যন্ত সাধারণ কথা বলা দরকার।

আজকেই আমার একজনের সঙ্গে কথা হল, ভদ্রলোক বিহারের একজন বিচারক। ওনার বেদ জানার খুব ইচ্ছা। আমার সঙ্গে আগে কখন সেভাবে দেখা হয়নি, উপর উপর আমাকে জানতেন। আমার নম্বর জোগাড় করে ফোন করে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, আপনার বেদের ক্লাশগুলো শুনছি খুব ভাল লাগছে। কিন্তু আমার এখন খুব ইচ্ছে গভীর ভাবে বেদ অধ্যয়ন করি আর পণ্ডিতের কাছে গিয়ে বেদমন্ত্রোচ্চারণ শিখি।

বেদ ক্লাশে আমরা বেদের অনেক মন্ত্রের বর্ণনা করেছি এবং ব্যাখ্যা করেছি। ওখানে বেদের একটা খুব সুন্দর মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে। মন্ত্রটা সূর্যদেবতার প্রতি। ঋষি সূর্যদেবতার কাছে প্রার্থনা করে

বলছেন –*চক্ষুর্নো ধেহি চক্ষুষে চক্ষুর্বিখ্যৈ তনুভ্যঃ,* হে সূর্যদেবতা আমাকে দৃষ্টি দিন, শুধু চোখে দৃষ্টি দিলে হবে না, পুরো শরীরে চোখের দৃষ্টি দিন, যাতে *স চেদং বি চ পশ্যেম,* এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সম্পূর্ণ রূপে আমি জানতে পারি আর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে পারি। একটা হল একটা ছবিকে পুরোটা দেখা। যেমন কোলাজ্, কোলাজকে দেখার জন্য দৃষ্টি দিলেন। আবার কোলাজের প্রত্যেকটা যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজ আছে, সেগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখা। একটা ছবিকে দূর থেকে দেখে খুব সুন্দর লাগছে। ছবির কাছে গিয়ে যখন দেখছেন, তখন আরও অবাক হয়ে দেখছেন, উঃ কি দারুণ সূক্ষ্ম কারুকাজ। ঋষি মনে মনে সূর্যদেবতাকে এটাই বলছেন, হে সূর্যদেবতা আমাকে দৃষ্টি দাও, আমার শরীরকে দৃষ্টি দাও, যাতে আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানতে পারি –এক ছবিতে আর পুরো বিস্তারে।

আপনারা অনেকেই আমাদের কাছে আসেন আপনাদের সংসারের কোন সমস্যা বা ধর্মজীবনের সমস্যা নিয়ে। আপনাদের উদ্দেশ্যে আমাদের একটাই উত্তর থাকে –ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করুন। আমরা আবার যোগ করে দিয়ে বলি, আমরাও তাই করি, আপনিও তাই করুন। আপনি কোন সম্প্রদায়ে যদি যান, যদি কৃষ্ণ সম্প্রদায়ের লোকের কাছে যান, তাঁরা আপনাকে এটাই বলবেন –কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা কর। শিবের ভক্ত বলবেন, শিবের কাছে প্রার্থনা করুন। সেখান থেকে আমাদের মনে একটা ভাব এসে গেছে, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলেই হবে। কিন্তু আপনি যদি কথামৃত পড়েন, তাহলে দেখবেন, ঠাকুর কোথাও এটা বলছেন না যে, মা কালীর প্রার্থনা কর। স্বামীজীর রচনাবলী যদি পড়েন, দেখবেন কোথাও স্বামীজী এ-ধরণের কিছু বলছেন না। গীতাতে তাও টুকটাক আছে, কিন্তু উপনিষদে একেবারেই নেই। রাজযোগ, যার কথা ঠাকুর বলছেন, সেখানে ঈশ্বরপ্রণিধানের কথা আছে, তার বাইরে আর কোন কিছু নেই, ওখানেই শেষ। উপরন্তু এও বলছেন যে, এই সংসারের সাথে ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক নেই। ঋকবেদ পুরোটাই প্রার্থনা –হে প্রভু আমাকে টাকা দাও, হে প্রভু আমাকে সম্পদ দাও, ভোগ দাও, হে প্রভু আমাকে স্বর্গ দাও। হিন্দু শাস্ত্রের মূল হল, যেটা রাজযোগ বলছেন –*চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ*। এটাকেই স্বামীজী অন্য ভাবে বলছেন, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াও।

ঠাকুর যখন বলছেন, মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন; উপনিষদ এটাকেই বলছেন –*অন্য বাচো বিমুচ্যন্থঃ,* অন্য সব কথা ছেড়ে আত্মজ্ঞানের দিকে যাও। কেন বলছেন? ইদানিং কালে এই যে এত শরণাগতি, শরণাগতি বলা হয়; শরণাগতি অত্যন্ত উচ্চ অবস্থার জন্য, শরণাগতি সাধারণ লোকেদের জন্য নয়। এই যে ঠাকুরের উপর খুব প্রচলিত গান –পাখি তুই ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক রামকৃষ্ণনামের মাস্তুলে। ঠাকুরের খুব নামকরা উদাহরণ, জাহাজের উপর পাখি বসেছিল। জাহাজ কখন ডাঙা ছেড়ে সমুদ্রে অনেক দূর চলে এসেছে, পাখিটা টের পায়নি। পাখিটা একবার পূব দিকে গেল, কোন ডাঙা দেখতে পেল না। এই ভাবে একবার পশ্চিমে, একবার দক্ষিণে, একবার উত্তর দিকে উড়ে গেল, কিন্তু কোন ডাঙা দেখতে পেলে না। তখন সে বুঝে গেল ডাঙায় যাওয়ার কোন উপায় নেই, পাখি এবার জাহাজের মাস্তুলে চুপচাপ বসে রইল।

সাধনজীবন ঠিক এভাবেই হয়। সব রকম ভাবে সব কিছু করে মানুষ যখন অবসন্ন হয়ে যায়, তখন তার শরণাগতি আসে। কিন্তু কতবার ঠাকুর এটাকে নিয়ে বলেছেন, খুব বেশি না; তার থেকেও বেশি এটা আছে দেখবেন, যেটা আমরা এক্ষুণি দেখব, যেটা আগেও এসেছে, পরেও আসবে। একটু আগেই যেটা বলা হল, ঋষি যেমন প্রার্থনা করে বলছেন –আমরা যেন সব কিছু এক দৃষ্টিতে দেখতে পারি আবার বিস্তারেও যেন দেখতে পারি। এখানে ঠাকুর বিস্তারের কথাই বলবেন। ধর্মজীবনে যখন ধর্মের প্রচলিত কথাগুলো; ঠাকুরমা, পিসিমার কথাগুলো যখন আমাদের কাছে ধর্মের শেষ কথা হয়ে যায়, তখনই ওটাই আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য হয়ে যায়। আপনাকে চোখ বন্ধ করে এখান থেকে হাওয়াই জাহাজে কিডন্যাপ করে আমেরিকা নিয়ে গেল, সেটা একটা জিনিস। কিন্তু আপনি যখন ট্রেনে করে কলকাতা থেকে দিল্লি যাচ্ছেন, সমস্ত শহর, গ্রামগঞ্জ, প্রকৃতি দেখতে দেখতে যাচ্ছেন, তখন সেটা একটা পুরো অন্য জিনিস।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে বলি, আমি যখন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি তখন এটাই প্রার্থনা করি – হে ঠাকুর আমি শুধু তোমার দর্শন পেতে চাই না, তোমার জমিদারিটাও আমাকে দেখতে হবে। স্থূল জগৎ যতটুকু দেখার দেখা হয়ে গেছে এবার সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎ সবটাই জানতে চাই; আমাকে যে সবটাই জানতে হবে। অনেক আগে থেকেই আমার এই ইচ্ছার ব্যাপারে আমি অবহিত ছিলাম। তারপর বেদের এই মন্ত্রটা হঠাৎ দেখার পর ইচ্ছাটা আরও জোরালো হয়ে গেল। এই নয় যে আমি ওখানে থাকতে চাইছি। ঠাকুর যেমন বলছেন, সবাই বাবুর বাগান দেখতেই ব্যস্ত, বাবুকে কে চায়। কিন্তু বাবুকে যে জেনে গেছে সে কেন বাবুর বাগান দেখবে না, অবশ্যই দেখবে। আমি বাবু ও বাবুর বাগান দুটোকেই সম্পূর্ণ রূপে দেখতে চাই। তবে এটা এক-একজনের এক-এক রকম মনের ভাব।

কিন্তু ঠাকুর কি বলছেন? ঠাকুর এটাই বলছেন, যেটা আমরা এখন কুণ্ডলিনী জাগরণের কথা বলছি, সেখানে তিনি এটাই বলছেন। এই যে আমরা যখন এগুলো ব্যাখ্যা করছি, দেখবেন কোথাও আপনার যে ধারণাগুলো আছে, সেগুলো হয়ত পাল্টে যাচ্ছে, কিংবা মনে একটা ধাক্কা লাগছে এই ভেবে যে এটা ভাল লাগছে না। কারণ মানুষ প্রচলিত ভাবগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। ঠাকুর এখানে প্রচলিত কথা বলছেন না। আধ্যাত্মিক যে সত্য ঠাকুর সেই সত্যকে বলছেন। তাই বলে কি আমরা কাঙালির মত গিয়ে ঠাকুরকে বলব, ঠাকুর শেষ সময় আমায় নিয়ে যেও। শেষ সময় ঠাকুরই সবাইকে নিয়ে যান, ঠাকুর ছাড়া আর কেউ নিয়ে যায় না। ঠাকুরের যারা ভজনা করছে না, তাদেরও ঠাকুরই নিয়ে যান। কাউকে তার কর্মফল রূপে নিয়ে যান, কাউকে যমদূত, কাউকে যমরাজ রূপে নিয়ে যান। ঠাকুর নিজে কোথাও আসেন না, ঠাকুরের ভাব আসে। এগুলো ভাল না। ঠাকুর কথামৃতেই এক জায়গায় বলছেন, এরা ধর্মকে ডাইলিউট করে দিচ্ছে। ধর্মকে ডাইলিউট করতে নেই।

বেদে অগ্নিসূক্তম একটা নামকরা সূক্তম্, যেখানে শুরু হয় *অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং* দিয়ে। অগ্নিসূক্তমে সাত নম্বর মন্ত্র যেখানে ঋষি অগ্নির স্তুতি করছেন, আবাহন করে বলছেন, *উপ ত্বাগ্নে দিবেদিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্। নমো ভরন্ত এমসি*।। হে অগ্নিদেবতা, এই যজ্ঞশালায় সকাল-সন্ধ্যা রোজ আমি আসি, রোজ আপনার স্তুতি করি। কবে থেকে? যবে থেকে আমার উপনয়ন হয়েছে, সেদিন থেকে আমি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করে যাচ্ছি। তাই এটা আমার অধিকার, আমি আপনার কাছে কাঙালীর মত কোন ভিক্ষা চাইছি না। আমি এই যে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি আসুন, আপনি দেবতাদের নিয়ে আসুন আর আমাদের শুভ হোক আর আমাদের অর্থ আর কাম যেন পরিপূর্ণ থাকে। কাম এখানে মানে পরিজনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ থাকা। এখানে আমি কোন ভিক্ষা চাইছি না; এটা উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ না; রাস্থায় যেতে যেতে একটা মন্দির দেখলাম আর পাঁচ টাকা দক্ষিণা দিয়ে দায় সারা না। ভক্তরা এসে ধরাম্ করে একটা এক টাকা কি দু টাকার কয়েন ছুঁড়ে প্রণামি দেবে, দেখে ভাবি ঠাকুরের কপালে এখনও ওই এক টাকা, দু-টাকাই আছে। দেওয়ার পর একটা লম্বা লিস্ট ধরিয়ে দেবে –হে ঠাকুর, ছেলের যেন চাকরি হয়, মেয়ের যেন ভাল বিয়ে হয়, স্ত্রীর অসুখটা যেন সেরে যায় ইত্যাদি। ঠাকুর কি এতই বোকা, এতই কি বাজে বিজনেসম্যান? দু টাকা পাঁচ টাকার প্রণামীতে তিনি এত কিছু আপনাকে দিয়ে দেবেন?

ঋষি বলছেন, *দিবেদিবে*, আমি তোমার কাছে রোজ সকাল-সন্ধ্যা আসি, একটা দিনও বাদ নেই। মনুস্মৃতিতে বর্ণনা আছে, আপনি যদি বাড়ির বাইরে দূরে কোথাও থাকেন তাহলে সেখানে আপনি আপনার নিত্যকর্ম অগ্নিহোত্রাদি কিভাবে করবেন? ঈশোপনিষদেও বর্ণনা আছে, ব্রাহ্মণ মৃত্যুশয্যায়, আর কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি মরতে যাচ্ছেন, তখন তিনি সূর্যদেবতাকে প্রার্থনা করে বলছেন, *সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে*, হে সূর্যদেবতা সত্য ধর্মে আমি প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য *তত্ত্বং পূষণ্ অপাবৃণু*, তোমার ওই আবরণ সরিয়ে দাও, যাতে আমি সেই সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। আমি কোন কাঙালি ভিখারী না, আমি সাধনায় প্রতিষ্ঠিত।

কথামৃত যখন পড়বেন, শাস্ত্র যখন শুনবেন, শাস্ত্র যখন পড়বেন, তখন আপনারা এই দুটি কথা মনে রাখবেন –শুধু ছবি নয়, এক ঝলক নয়; বিস্তারে দেখতে চাই। বাবু আর বাবুর বাগান দুটোই দেখতে চাই। দ্বিতীয় কাঙালী ভিখারী রূপে না। আপনি রাজার ব্যাটা আপনি কাঙালী ভিখারী রূপে যাবেন কেন? ঠাকুরের সামনে গিয়ে বলবেন, ঠাকুর, তুমি রাজা, আমি রাজকুমার। এই তো আমি তোমার কাছে এসেছি, আশা করি আমাকে দেখে তুমি খুশি হয়েছ। এই আত্মবিশ্বাসটা আপনার মধ্যে থাকতে হবে। আত্মবিশ্বাসটা কখন হয়, যখন বণ্ডিং হয়। মা ও ছেলের যখন বণ্ডিং হয়, ছেলে বাড়ি আসে, দিনে তিনবার হয়ত আসছে, এসে হাঁক পাড়ে, মা এসে গেছি। ছেলেরও আনন্দ, মায়েরও আনন্দ। এক বছর পরে এলো, তখনও ডাকবে, মা এসে গেছি বলে। ঠিক সেই রকম বণ্ডিং, ঠাকুর তোমার সঙ্গে আমি জুড়ে আছি। তোমার কাছে এসে শুধু আমার খুশি হচ্ছে না, তোমারও যেন আমাকে দেখে খুশি লাগে। তখনই আপনার অধিকার হবে প্রার্থনা করার।

একজনের সঙ্গে দেখা হল, বলছেন, বেদের ক্লাশে আপনার কথাগুলো শুনেছি। আমি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করছি, আমার টেনশান কিন্তু যাচ্ছে না। সারা জীবন ধরে আবর্জনা জমিয়ে গেছেন আর দু-দিন মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করে ভাবছেন আপনার সব টেনশান চলে যাবে, এভাবে কি কখন হয়? যখন বুক ঠুকে বলবেন, *সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে*, নিজে থেকেই আপনার সব টেনশান চলে যাবে। সেই আত্মবিশ্বাস কেন আপনার নেই? কারণ কিছু করেননি। রোজ রোজ যদি আপনি কারুর কাছে চাইতে যান; ঠাকুরই বলছেন, কেউ যদি রোজ রোজ বাবুর কাছে চাইতে যায়; ঠাকুর আমাকে মুক্তি দিও, ঠাকুর আমাকে ভক্তি দিও; ঠাকুর বিরক্ত হয়ে তাড়িয়ে দেবে, যাঃ বের হ। রোজ রোজ এসে সেই এক কথা। স্বামীজী বলছেন, নিজের পায়ে দাঁড়াও, stand in your own feet। আধ্যাত্মিক জীবনে আপনার যে পাপ, আপনার যত আবর্জনা কিভাবে সরাবেন? সকাল সন্ধ্যা, সকাল সন্ধ্যা কেন, ওটা তো বৈদিক ঋষিদের সাধনা, আপনার জন্য চব্বিশ ঘন্টা সাধনা। ঠাকুর পরে বলছেন, ঘুষকীর মত; ঘুষকী গ্রাম্য শব্দ, যার অর্থ নষ্টা মেয়ে, যার মন সব সময় উপপতির উপর থাকে, চব্বিশ ঘন্টা মন উপপতির দিকে। তাহলে কি বলবেন, ভক্তি কি কোন পথ নয়? অবশ্যই ভক্তি সেই পথ। এক্ষুণি ঠাকুর বললেন, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য বা আরও যত রকমের সাধনা হতে পারে, সাধনা মানেই কুণ্ডলিনী জাগরণ, কুণ্ডলিনী জাগরণ না হলে চৈতন্য হয় না।

কথামৃতের পাঠক-পাঠিকারা এতদিন কথামৃত পড়ে পড়ে কুলকুণ্ডলিনীর কথা শুনে শুনে পরিচিত হয়ে গেছেন। নিচে মূলাধার থেকে তিনটে, সেখান থেকে হৃদয়ে, হৃদয় থেকে কণ্ঠে, কণ্ঠ থেকে ভ্রূ মধ্যে আর সবার শেষে মস্তকে। এই সপ্তভূমির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎ ও মহাকারণের সাথে। যে জগতে আমরা ঘুরঘুর করছি, সব কিছু চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, এটা হল স্থূল জগৎ। সূক্ষ্ম জগৎ হল আলোর জগৎ, দেবী-দেবতাদের জগৎ, যেখানে বিভিন্ন রকমের স্বর্গ আছে। সেখান থেকে মন এবার কারণ জগতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কুণ্ডলিনী তখন কণ্ঠদেশে এসে গেছে, ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন কথা মুখ দিয়ে বেরোবে না, কান দিয়ে ঢুকবে না। ভ্রূ মধ্যে এসে যাওয়া মানে, কুণ্ডলিনী পুরো কারণ জগতে প্রবেশ করে গেছে। এখানে সে ঈশ্বরকে সব সময় সাক্ষাৎ দর্শন করছে। কিন্তু লণ্ঠনের কাঁচের মত ঈশ্বরের সাথে তার একটা ব্যবধান থেকে যায়। বেশির ভাগ যোগী বা ভক্ত এখানে এসেই থেমে যান; এর বাইরে যান না। কুণ্ডলিনী ওখান থেকেও যখন উঠে আসে তখন কুণ্ডলিনী মস্তকে সহস্রারে চলে আসে; মহাকারণে সে মিশে গেল, এটাই অদ্বৈত জ্ঞান। একজন খুব নামকরা মহারাজ মজা করে বলতেন, ঠাকুরের কথামৃত আসার পর কেউ আর অদ্বৈত জ্ঞান, নির্বিকল্পের নিচে কথাই বলে না, আর গুরুদের জীবনমুক্তের নিচে রাখবেই না। তাদের আলোচনায় এই তিনটে থাকতেই হবে, ঈশ্বরকোটি, জীবনমুক্ত আর অদ্বৈত জ্ঞান। কে কোন স্তরে আছেন, কোন অবস্থায় আছেন আমরা কি করে জানব? তার থেকেও বেশি, এই জিনিসগুলোকে নিয়ে আলোচনা করাটাই ভাল না। আপনি বুঝে নিলেন, এবার সাধনা করতে থাকুন, বাকিটা ঠাকুর নিজে দেখিয়ে দেবেন। কে কত এগোল, কে কোন

অবস্থায় আছে, এগুলোর অনুসন্ধান বন্ধ করে নিজের গুরুর নির্দেশ অনুসরণ করে নিষ্ঠা সহকারে সাধনা করে যান।

সেদিন একজন এসে খুব গর্ব করে আমাকে বলছে, আমার না বেলুড় মঠে দীক্ষা হয়েছে। তো কি হয়েছে, মনে করছে বেলুড় মঠে দীক্ষা হলে এক রকম হবে আর কাশীপুর উদ্যানবাটীতে দীক্ষা নিলে অন্য রকম কিছু হবে। আর তার সাথে বলবে, অমুক মহারাজের কাছে আমার দীক্ষা হয়েছে। এগুলো দিয়ে কিচ্ছু হয় না। আমাদের কাছে গুরুকৃপা মানে হল ঠাকুরের কৃপা। ঠাকুরের কৃপা একমাত্র তাদেরই হয়, যাদের মাঠ চাষ করা আছে। এই ধরণের ভুল ধারণাগুলো থেকে বেরিয়ে আসুন। যার জন্য বারবার বলা হচ্ছে, *সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে* বা যেখানে বলছে *দিবেদিবে*, হে অগ্নিদেবতা, তোমার যজ্ঞশালায় আমি রোজ অগ্নিহোত্রাদি করার জন্য আসি, তোমার উপর তাই আমার অধিকার আছে।

এই যে আলোচনা হল, আমি বিস্তারে জানতে চাই; এই বিস্তারের বর্ণনা দিতে গিয়ে আমরা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ জগতের কথা বললাম। এবার ঠাকুর এখানে বলছেন –**বেদান্তের সপ্তভূমি, আর যোগশাস্ত্রের ষড়চক্র অনেক মেলে। বেদের প্রথমে তিনভূমি, আর ওদের মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর। এই তিনভূমিতে গুহ্য, লিঙ্গ, নাভিতে মনের বাস**।

এগুলোকেই প্রাণবায়ু বলা হয়, আর এই জিনিস বাস্তব হয়। খুব বড় নিওরোসার্জনকে দিয়ে পরীক্ষা করালে তাঁরা এসব কিছুই খুঁজে পাবেন না, কারণ এগুলো পুরোটাই আধ্যাত্মিক জিনিস। যাঁদের কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়, তাঁরা সত্যিকারের বুঝতে পারেন বায়ু এক-একটা ভূমিকে অতিক্রম করে উপরে উঠছে। আমাদের পেটে যে বায়ু হয়, এই বায়ু তা না, এটা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। যাঁর এই বায়ু উপরের দিকে উঠে আসতে থাকে তিনি তাঁর মেরুদণ্ডে পরিষ্কার বুঝতে পারেন যে বায়ু উঠছে। আমার এক বন্ধু মহারাজ সবাইকে বলতেন যে, ওনার কুণ্ডলিনী জেগেছে, তিনি নাদ ধ্বণি শুনতে পান। উনি সত্যিই আমার একজন ভাল বন্ধু, আমি জানি উনি একজন তপস্বী। তাঁর কথা শুনে অন্য মহারাজরা হাসাহাসি করেন। আমি ওনাকে ভালবেসে বললাম, 'দাদা, আপনার ও-রকম কিছু হয়েছে ঠিক আছে, এগুলো সবাইকে বলার কি দরকার'? আমি জানি উনি একটু খ্যাপাটে টাইপের। কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি বিশ্বাস করেন ওনার কথা? আমি তাহলে বলব, একশ ভাগ বিশ্বাস করি। কারণ উনি যেভাবে তপস্যা করেন, যেভাবে মৌন সাধন করেন, না হওয়ার কোন কারণ নেই। আর হৃদয় পর্যন্ত কুণ্ডলিনী উঠে আসাটা এমন কিছু না। যাঁর হয় তিনি বুঝতে পারেন।

মন যখন চতুর্থভূমিতে উঠে অর্থাৎ অনাহত পদ্মে, জীবাত্মাকে তখন শিখার ন্যায় দর্শন হয়, আর জ্যোতিঃদর্শন হয়। সাধক বলে, 'এ কি! এ কি'! দয়া করে আপনারা মনে রাখবেন, এগুলো পুরোপুরি বাস্তব এবং সত্যিকারের এই রকমই হয়। আপনাদের যে একটা ভাব হয়ে আছে যে, শেষ সময় ঠাকুর এসে নিয়ে যাবেন; না এ-রকম হয় না। ঠাকুর যাঁকে যেভাবেই নিয়ে যান না কেন, সবাইকে এই পথেই যেতে হবে। উপেন মহারাজ মজা করে আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করছেন, 'কেমন আছ'? সবাই যা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন, আমিও সেই উত্তর দিলাম, 'ভাল আছি মহারাজ'। মহারাজ তখন বলছেন, 'কচু ভাল আছ। এখনও তোমার ঈশ্বরদর্শন হল না, আত্মজ্ঞান হল না, জীবনমুক্ত হতে পারলে না, এরপরেও কি করে বলতে পারছ –ভাল আছি মহারাজ। কিসের তুমি ভাল আছ বলছ'? এগুলো মুখের কথা না, এগুলো বাস্তব হয়। ঠাকুরের কথা শোনার পরেও আপনার যদি এই বোধ না হয়ে থাকে যে, এগুলো বাস্তব, বুঝতে হবে আপনার কিছু গোলমাল আছে। দ্বিতীয় হল, আমাকেও এটা পেতে হবে। তাই বলে এটাকে নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করবেন, তা না। এগুলোকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কিছু নেই, আপনার হয়েছে ঠিক আছে, চুপ থাকুন। কারণ ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনিই আসবে।

আপনার চৈতন্য যদি জেগে যায়, লোকেরা নিজে থেকেই আপনার কাছে আসবে। ঠাকুর বলছেন, ফুল ফুটলে ভ্রমন আপনিই আসবে। এর সাথে আমি একটা লাইন যোগ করছি –ঘা হলে মাছি

আসবে। আপনার চারপাশে লোকজন যদি ঘুরঘুর করা শুরু করে, আপনাকে তখন দেখতে হবে কি ধরণের লোক আসছে, মৌমাছি না মাছি? চিল মুখে মাছ নিয়ে উড়ে যাচ্ছে আর তার পিছনে শত শত কাক তাড়া করে যাচ্ছে। আপনার যদি টাকা-পয়সা থাকে, অভাবগ্রস্থ কয়েকজন লোক আপনার কাছে আসবেই; দু-চারজন সেয়ানা লোক আপনার গাঁটরি ফাঁকা করতে আপনার কাছে আসবেই। দুটো ভাল কথা যদি বলতে থাকেন, চার-পাঁচজন লোক দৌড়ে আপনার কাছে আসবে আপনারা কথা শোনার জন্য। আধ্যাত্মিক জাগরণ একটা আলাদা জিনিস। আপনার যদি ওই জাগরণ হয়, অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু লোক আপনার কাছে ছুটে আসবে। ভাল করে লক্ষ্য করুন, আপনার কাছে কারা আসছে? আর ভাল করে বিচার করে দেখবেন, আপনারা কাছে কি ধরণের লোক আসছে। আপনি কার কাছে যাচ্ছেন সেটাও একটা জিনিস, তাতে বোঝা যায় আপনার মনের ভাব কেমন। আপনার কাছে কারা কারা আসে, তারা কিসের জন্য আসে? আপনার জন্য তার মাছি না মৌমাছি? আপনার জন্য বলা হচ্ছে, কারণ আপনার জন্য যারা মৌমাছি, অন্যের জন্য মাছি হতে পারে। বিচার করলে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন আপনার কুণ্ডলিনী উঠেছে কিনা। উঠে থাকলে কাউকে বলার দরকার নেই। বড়লোকেরা কখন কাউকে বলতে যায় না তার কত ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স।

লীলাপ্রসঙ্গে আমরা হৃদয়রামের বর্ণনা পাই, যদিও হৃদয়রামের সব কথা বিশ্বাস করতে মন সায় দেয় না। ঠাকুর একবার হৃদয়রামকে ছুঁয়ে দিয়েছেন, আর হৃদয়রাম জ্যোতিঃদর্শন করতে লাগলেন, সমস্ত কিছু জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। হৃদয়রাম এটা প্রশংসা করার জন্য বলছেন কিনা বোঝা যায় না। কারণ যাঁর জ্যোতিঃদর্শন হয়ে গেছে, তা যাঁর কৃপাতেই হোক, তিনি ওই ভাবে ঠাকুরকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন, এই জিনিসটা যুক্তিতে দাঁড়ায় না, অথবা এটাও হতে পারে যে, ঠাকুর অপাত্রে দান করেছিলেন। লীলাপ্রসঙ্গে এই বর্ণনা অনেকবার আছে। স্বামীজী ছোটবেলা ঘুমোনর সময় জ্যোতি দেখতেন। যোগীরা কত সাধ্যসাধনা করে যে কুণ্ডলিনীকে হৃদয়ে আনতে চান, সেই জিনিস স্বামীজীর ছোটবেলাতেই হত, তাও আবার ঘুমের সময়।

পঞ্চমভূমিতে মন উঠলে, কেবল ঈশ্বরের কথাই শুনতে ইচ্ছা হয়। ঠাকুর এই কথা কথামৃতে অনেকবার বলেছেন। **এখানে বিশুদ্ধচক্র। ষষ্ঠভূমি আর আজ্ঞাচক্র এক। সেখানে মন গেলে ঈশ্বরদর্শন হয়। কিন্তু যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো –ছুঁতে পারে না, মাঝে কাচ ব্যবধান আছে বলে**। আবারও বলছি, এগুলো বাস্তব দেখতে পারবেন।

এখানে অতি সংক্ষেপে কুণ্ডলিনীর বর্ণনা করা হল। স্বাভাবিক ভাবে মনে প্রশ্ন আসবে, কুণ্ডলিনী জাগবে কি করে? আমাদের যে সমগ্র ধর্মজীবন, আমাদের শাস্ত্র যত কথা বলছেন, সব কথা শুধু এই একটি বিষয়ের জন্য, অর্থাৎ কুণ্ডলিনী জাগরণের জন্যই বলছেন। যোগশাস্ত্রে যে যম, নিয়ম, আসন, ধারণা, প্রত্যাহারদি করতে বলা হয়েছে, এখানেও যোগ কুণ্ডলিনী জাগরণের কথাই বলছেন। স্বামীজী ঠাকুরের আরাত্রিক ভজনা, খণ্ডন ভববন্ধন রচনা করলেন, রামকৃষ্ণ ভাবধারায় বিশ্বে যত আশ্রম আছে, সব আশ্রমে সন্ধ্যাবেলা আরতির সময় খণ্ডন ভববন্ধন গান করা হয়; এটাও সেই কুলকুণ্ডলিনী জাগানোর চেষ্টা। এই যে রামকৃষ্ণ মিশন কত রকম সেবাকার্য করছে, এও সেই কুণ্ডলিনী জাগানোরই চেষ্টা। আপনি বাড়িতে যখন জপ করছেন, পূজাপাঠ করছেন, আপনি কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করারই চেষ্টা করছেন। কিভাবে হয়? মন যখন লয় হয়। যখন সেবাদি কার্য করছেন বা যে কোন কাজ যখন করছেন তখনও সেই ভাব; জপ করছেন তখনও সেই ভাব; পূজা করছেন তখনও সেই ভাব। মন লয় হওয়াটা কি রকম? রাজযোগ বলে দিচ্ছেন, মন লয় হয় চিত্তবৃত্তিনিরোধ দ্বারা। যেমন যেমন মন একাগ্র হয়, তেমন তেমন এই সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎএর সাম্রাজ্য ছোট হয়ে আসে। আর এই স্থূল জগৎ, স্থূল জগৎ মানে ভারত, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা না; স্থূল জগৎ সূর্য, তারা, নক্ষত্র, কোটি কোটি গ্যালাক্সিস সবটাই স্থূল জগৎ। তাহলে কল্পনা করতে পারেন সূক্ষ্ম জগৎ আরও কত বড় হবে। কারণ সূক্ষ্ম জগৎ এই স্থূল জগৎকে ঘিরে রেখেছে। আর কারণ জগৎ কত বড় কল্পনাই করা যায় না। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড তার

মধ্যে। এগুলো শুনলে, পড়লে হাত-পা সব অবশ হয়ে যায়। আমাদের জন্য আরও দুঃখের কথা যে – এর প্রত্যেকটি কথা সত্য। এগুলো কোন বইয়ের কথা না, এর সব কিছু ঠাকুর প্রত্যক্ষ করেছেন, শুধু নিজেই প্রত্যক্ষ করেননি, নিজের শিষ্যদেরও প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। সবাইকে সাধনা করে নিজেকে এই সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। প্রত্যক্ষ না করলে কিছুই হবে না, প্রত্যক্ষ না করলে *পুনরপি জননং পুনরপি মরণং*, জন্ম-মৃত্যুচক্রে ঘুরতেই থাকবে।

জনকরাজা পঞ্চমভূমি থেকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেন। একজন মহারাজ, বয়স হয়ে গিয়েছিল, সব সময় বেদান্তের কথা বলতেন। অনেক আগে আমি যে সেন্টারে ছিলাম, একবার উনি সেই সেন্টারে এসেছেন। একজন নূতন ব্রহ্মচারী মহারাজ এসে আমাকে বলছেন, 'মহারাজ, কথামৃতের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে'। 'কি রকম মিলে যাচ্ছে? নিশ্চয় এনার কুণ্ডলিনী কণ্ঠ পর্যন্ত চলে এসেছে, কারণ তিনি সব সময় ঈশ্বরের কথাই বলছেন'। আমরা অনেকে মিলে চা খাচ্ছিলাম, সেখানে ওই মহারাজও আছেন। আমি নূতন ব্রহ্মচারীকে বললাম, 'আমি এক্ষুণি কি ওনার কুণ্ডলিনী নামিয়ে দেব'? 'তা কি কখন হয়, আপনি পারবেন'? ওই বয়স্ক মহারাজ একটা মজার কথা আমাকে অনেক দিন আগে বলেছিলেন। আমি ওনাকে ওটা মনে করিয়ে দিতেই, উনি ওই টপিকে ঢুকে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে, বাজনা, গান, উচ্চাঙ্গ, লঘু সব নিয়ে আলোচনা শুরু, ঈশ্বরীয় কথা কোথায় পড়ে রইল উনি টেরই পেলেন না। ব্রহ্মচারী মহারাজ খুব আপসেট হয়ে গেলেন দেখে।

ব্রহ্মচারী মহারাজকে বোঝালাম, সব কিছু দেখতে থাক, হুটহাট করে কোন স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে কাউকে বলতে যেও না যে, ওনার কুণ্ডলিনী এতদূর এসেছে, কি ভ্রুর মাঝখানে এসে গেছে, কি উনি জীবনমুক্ত। অপরের দিকে তাকানোর কিছু নেই, তুমি নিজেরটা দেখ। সংসার এমনই এক জায়গা যে, এখানে মনকে কোন একটা কিছু দেখিয়ে দিলে ওতেই রোমে যাবে। যেটা দুধ মনে হচ্ছিল, সেটাকেই পরে জলের থেকেও নিকৃষ্ট মনে হবে। রাজা জনক কি সুন্দর শুকদেবকে বলছেন –*মিথিলায়াং প্রদগ্ধয়াম্*, পুরো মিথিলা নগরী যদি পুড়ে ছাই হয়েও যায়, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমরা পরম্পরাগত যেটা শুনে এসেছে, ঠাকুর সেই পরম্পরা থেকেই রাজা জনকের এই কথা বলছেন।

ঠাকুর আবার রাজা জনকের কথা বলছেন –**তিনি কখনও পঞ্চমভূমি, কখনও ষষ্ঠভূমিতে থাকতেন**। ঠাকুর তো আর রাজা জনককে দেখেননি, কিন্তু ওনার জীবনী আমরা যেটা পাই, তাতে এটাই বলা হয়। ঈশ্বরকে নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকা আর ঈশ্বরীয় কথা বলা, এই দুটোতে তফাৎ আছে। এটাই চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনে দেখা যেত, মহাপ্রভুর জীবনীতেও এই জিনিসের বর্ণনা রয়েছে –বাহ্যদশা, অর্ধবাহ্যদশা ও অন্তঃদশা। অন্তঃদশাতে তিনি সমাধিতে চলে যান –এটাকে আমরা ষষ্ঠভূমি বা সপ্তমভূমি বলতে পারি। পঞ্চমভূমি আর ষষ্ঠভূমির মধ্যে যখন বাচ খেলা হয় তখন ওটাই হয়ে যায়, অর্ধবাহ্যদশা, তখন তিনি মাতোয়ারা কখন নৃত্য করছেন, কখন হরিনাম করছেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর মত মানুষ আমাদের মত চতুর্থ ভূমিতে যাওয়ার জন্য ছটফট একেবারেই করেন না। ওনারা হলে অবতার, অবতার পঞ্চমভূমি, ষষ্ঠভূমি আর সপ্তমভূমি এর মধ্যে থাকবেন। আর যাঁরা ঋষি তাঁরা পঞ্চম ও ষষ্ঠভূমির মধ্যে ঘুরঘুর করতে থাকেবন। চতুর্থভূমি আর পঞ্চমভূমির মধ্যে যাঁরা ঘুরঘুর করেন, তাঁরাই কবি হয়ে যান।

ষড়চক্র ভেদের পর সপ্তমভূমি। মন সেখানে গেলে মনের লয় হয়। জীবাত্মা পরমাত্মা এক হয়ে যায়। মন যখন ধ্যানে আরও গভীরে প্রবেশ করে যাচ্ছে, পুরোপুরি একাগ্র হয়ে যাচ্ছে, কুণ্ডলিনী তখন আরও উপরে উঠে আসে। স্বামী যতীশ্বরানন্দজী তাঁর ধ্যান ও আধ্যাত্মিক জীবন বইতে এই জায়গাগুলিকে বলছেন, Center of Consciousness। আপনার চেতনা কোথায় ডুবে আছে? বিদেশী লোকেদের বোঝানর জন্য উনি এই শব্দটা ব্যবহার করতেন। আমাদের কাছে যখন এটা কুণ্ডলিনী, তখন এটা কুণ্ডলিনীই। ঠাকুর সপ্তমভূমির কথা বলছেন, মন সেখানে গেলে মনের লয় হয়। জীবাত্মা পরমাত্মা এক হয়ে যায় –সমাধি হয়। ঠাকুর যোগের দৃষ্টি থেকে এই কথা বলছেন; জীবাত্মা পরমাত্মা আলাদা

কিছু না। আসলে পরমাত্মা ওই অর্থে নেওয়া হয় না। কিন্তু ঠাকুর সমস্ত কিছুকে একটা জায়গায় নিয়ে আসছেন, যেমন শঙ্করাচার্য সব কিছুকে এক জায়গায় নিয়ে এসেছেন। **দেহবুদ্ধি চলে যায়; বাহ্যশূন্য হয়; নানা জ্ঞান চলে যায়; বিচার বন্ধ হয়ে যায়**।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী বলেছিল, বিচারে অনেক বোধ হচ্ছে; নানা বোধ হচ্ছে। সমাধির পর শেষে একুশদিনে মৃত্যু হয়।

ঠাকুরের খুব নামকরা কথা –সমাধির পর শেষে একুশদিনে মৃত্যু হয়। এগুলো টেকনিক্যাল ব্যাপার, এর মধ্যে আমাদের বেশি যাওয়ার দরকার নেই। একুশ দিনে শরীর যাওয়ারই কথা, শরীরের সব ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যায়, খাওয়া-দাওয়া নেই, এমনিই শরীরের পতন হয়ে যাবে। ঠাকুরেরও এই অবস্থা হয়েছিল, কিন্তু সেই সময় কোথা থেকে এক যোগী এসে ঠাকুরের মুখ দিয়ে যে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল, সেই রক্তের রঙ দেখে বলেছিলেন, 'এই অবস্থায় ওনার শরীর চলে যাওয়ার কথা, কিন্তু কোন এক দিব্য শক্তির জোরে উনি রক্ষা পেয়েছেন'। উনি ঠাকুরের মাথায় কিল মেরে মেরে একটু একটু করে দুধ ওনার মুখে ঢেলে দিতেন।

কিন্তু কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ না হলে চৈতন্য হয় না। আমরা যে ভক্তি করি, নানা রকমের জিনিস করি, কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের জন্যই করি। কিন্তু ইদানিং কালে, বিশেষ করে বিদেশীদের সৌজন্যে মানুষ এটাকে খেলো করে দিয়েছে। ভারতে যত না যোগী তার থেকে ফ্রড যোগী অনেক বেশি। একবার শুনেছিলাম, একজন চেয়ারে তার দিয়ে ব্যাটারির সাহায্যে এমন ব্যবস্থা করে রেখেছিল, যাদের টাকা-পয়সা বেশি আছে তাদের একদিন দুদিন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে নানা রকমের কিছু ট্রেনিং দিয়ে ওই ব্যাটারি অপারেটেড চেয়ারে বসিয়ে দিত। বসিয়ে একটা কিছু অপারেট করত তখন একটু কারেন্ট লাগত। জিজ্ঞেস করত, কি কুণ্ডলিনী জাগছে? যে চেয়ারে বসেছে, সে তো মহাখুশি যে তার কুণ্ডলিনী জেগেছে। তারপর তার থেকে মোটা টাকা আদায় করে নিত। যার কুণ্ডলিনী জাগত, তার আচার ব্যবহারে কোন পরিবর্তন নেই, পুরোটাই ফ্রডগিরি। কুণ্ডলিনীর নাম করে আজকাল যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, বেশির ভাগই ফ্রডগিরি। 'তন্ত্র এণ্ড সেক্স', এগুলো কি জিনিস? কাজের কাজ কিছুই নেই, মাঝখান থেকে দুর্নাম করে দিচ্ছে। এত উচ্চমানের জিনিসটাকে কিভাবে ফ্রডগিরি করে নষ্ট করে দিচ্ছে, দেখে কষ্ট হয়।

যে ঈশ্বরলাভ করেছে, তার লক্ষণ আছে। কয়েক বছর আগে টাইমস অফ ইণ্ডিয়া থেকে আমার লেখা চেয়েছিল, সেই থেকে কিছু দিন ওদের কাগজে লেখালেখি করতাম। কিন্তু পরে দেখলাম, একেবারেই খেলো জিনিস, লেখা বন্ধ করে দিলাম। সবারই একটা বুদ্ধিবৃত্তির মনোরঞ্জন দরকার, আধ্যাত্মিক মনোরঞ্জন দরকার, যার জন্য স্পীচ দেওয়া, লেখালেখি করা; কিন্তু আমি এখন সব ছেড়ে দিয়েছি। সবাইকে আমার না করে দেওয়া হয়ে গেছে। যদি একটা নির্দিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীকে আটটা দশটা স্পীচ দিতে বলেন, তাহলে দেব। কিন্তু শ্রদ্ধা ও ধৈর্য ধরে শোনার অত সময় কার আছে। সবাই এখন টু-মিনিটস-নুডুলস্ চাইছে। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও দেখুন, ঠাকুরকে এসে বলছেন –মহাশয়, আমাকে সমাধিটুকু শিখিয়ে দিন।

টাইমস অফ ইণ্ডিয়া আমাকে জীবনমুক্তির উপর একটা ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য বলল। আমি বললাম, আমি জীবনমুক্ত। সঞ্চালক শুনে চমকে উঠেছে। আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি প্রমাণ করুন, আমি জীবনমুক্ত নই'। পরে ওরা পুরোটাই পেপারে ছেপে দিয়েছিল। যে কোন লোক বলতে পারে, আমার ঈশ্বরদর্শন হয়েছে। যে কোন লোক বলে দিতে পারে আমার জ্যোতিঃদর্শন হয়, আমি নাদধ্বণি শুনতে পাই। ঠাকুর এই জিনিসটাকে আটকাবার জন্য, সব কিছুকে কেটে-ছেঁটে একেবারে পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়েছেন –ঈশ্বরদর্শনের এই এই লক্ষণ আছে।

যে ঈশ্বরলাভ করেছে, তার লক্ষণ আছে। সে হয়ে যায় –বালকবৎ, উন্মাদবৎ, জড়বৎ, পিশাচবৎ। তিনি শিশুর মত সহজ সরল হয়ে যান, কোন সাতেপাঁচে থাকেন না। ভাগবৎ যাঁদের পড়া আছে, তাঁরা জানবেন যে, ভাগবতে শিশু কৃষ্ণকে নিয়ে একটা খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণ তখন দু-তিন বছরের শিশু; গোপীরা তাঁকে হাতের পুতুল বানিয়ে নাচাচ্ছে। কান্‌হা একটু নেচে দেখাও তো; একটু নেচে দেখিয়ে দিল; কান্‌হা কুস্তি কিভাবে লড়তে হয়? তিন বছরের বাচ্চা নিজের জঙ্ঘাতে তালি মেরে দেখাচ্ছে কিভাবে কুস্তি লড়ে। আমরাও বাচ্চাদের দেখাতে বলি, বেড়াল কিভাবে ডাক, কুকুর কিভাবে ডাকে। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের এই বর্ণনার করার উদ্দেশ্য হল, তিনি বালকবৎ। আইনস্টাইনের বায়োগ্রাফি খুব চিত্তাকর্ষক। আইনস্টাইনের দুটো জিনিস খুব মজার ছিল। প্রথম হল, কোথাও তাঁর মনে হত যে, লোকেরা ওনার কথাগুলো বুঝবে না। সেইজন্য যাঁরা শুনছেন, তাঁদের চেহারাতে যদি একঘেঁয়েমির ছাপ না দেখায় আর খুব বেশি উৎসাহিত না দেখায়, এই দুটো যদি না হয়, উনি আরামসে বলে চলে যেতেন। কারণ উনি জানতেন, এই বিষয়টা কেউ বুঝবে না; তাই তিনি সেখানে যাবতীয় যা কিছু বলতেন, সবটাই তিনি নিজেই নিজের সঙ্গে কথা বলতেন। ঠাকুর যে এত কথা বলছেন, সেখানেও তিনি নিজের সঙ্গেই কথা বলছেন; ঠাকুর কাউকে শিক্ষা দিচ্ছেন না। কারণ ঠাকুরের শিক্ষা নেওয়ার মত নেই কিনা। ঠাকুর নিজেই বলছেন, কাকেই বা বলব কেই-বা বুঝবে।

দ্বিতীয় –আইনস্টাইনকে ফোটগ্রাফাররা বলত, স্যার, আপনার জিভটা একবার বার করুন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জিভ বের করে দিচ্ছেন। আইনস্টাইনের এটা খুব নামকরা ছবি, জিভ বার করে আছেন। অন্য এক সাংবাদিক হয়ত বলল, স্যার আপনার টুপিটা একবার আকাশে ছুড়ে দিন। সঙ্গে সঙ্গে টুপিটা খুলে ছুঁড়ে দিলেন। বাচ্চার মত হয়ে গেছেন –He doesn’t care। উনি এত উঁচুতে চলে গেছেন যে, তিনিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মত করছেন। কৃষ্ণের ঘটনার সাথে আইনস্টাইনের কোন রিলেশান নেই। বক্তব্য হল, কেউ যখন অনেক উপরে চলে যান, তাঁর ব্যবহার অন্য রকম হয়ে যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধকও নন, সিদ্ধপুরুষও নন; তিনি ভগবান। তাঁর চরিত্রের বর্ণন করে বোঝান হচ্ছে উচ্চমার্গের মহাত্মারা কেমন হন; বালকবৎ।

উন্মাদবৎ, পাগলের মত তাঁর কোন কিছুতে হুঁশ নেই। জড়বৎ, চুপ করে আছেন। পিশাচবৎ, শুচি-অশুচির পারে।

আর তার ঠিক বোধ হয় ‘আমি যন্ত্র আর তিনি যন্ত্রী; তিনিই কর্তা, আর সকলেই অকর্তা। বাইরের লক্ষণগুলো যেমন দেখালেন, এবার ভিতরের লক্ষণগুলো দেখাচ্ছেন। মাতৃসঙ্গীতের যে গানগুলো আছে, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী; এই জিনিস এনারা বাস্তব দেখেন। ঈশ্বর, ঈশ্বরের কৃপা, ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা, এগুলো অত্যন্ত সিরিয়াস জিনিস; এগুলোকে খেলো করতে নেই। যারা কথায় কথায় ঠাকুরের কৃপা বলে, ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে। মনের ভিতর তিন-চারটে বাছাই করা শব্দগুলো আসে, মুখ দিয়ে একটাই বেরোয়; তাতেই অনেক বোঝা যায়। আমাদের এক মহারাজ ছিলেন, কাজটাজ ভালই করতেন। আমি দেখা হলেই বলতাম, ‘আপনি কত ভাল কাজ করছেন’। সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, ‘সব ঠাকুরের ইচ্ছাতেই হচ্ছে’। তারপর কোন কারণে কিছু ঝামেলার জন্য তিনি অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। আমিও দেখা হলে বলতাম, ‘কি মহারাজ, এখনও বলবেন, ঠাকুরের ইচ্ছাতেই হচ্ছে’? ‘না, না, এখন আর তা মনে হচ্ছে না’। ‘তাহলে এই বৈষ্ণব বিনয় কেন? বলুন, আমাকে কাজ দেওয়া হয়েছে, ঠাকুর আমাকে নিমিত্ত করেছেন, আমি করে দিয়েছি, ব্যস্‌ সব ওখানেই শেষ’।

আমাকেও ঠাকুর মাধ্যম করেছেন বলে আজ আমি এই ক্লাশ নিতে পারছি। কিন্তু যদি বলি, ঠাকুর আমার মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন, এটাই তখন ঢপ্‌বাজি হয়ে যাবে। এই ঢপবাজী করে করে হিন্দু ধর্মের সর্বনাশ করে ছেড়েছে।

শিখরা যেমন বলেছিল, পাতাটি নড়ছে সেও ঈশ্বরের ইচ্ছা। ঠাকুর সেই সময় সঙ্গে সঙ্গে শিখদের আটকে দিয়েছিলেন, তিনি জন্ম দিয়েছেন, তিনি দেখবেন না তো কে দেখবে! **রামের ইচ্ছাতে সব হচ্ছে – এই বোধ**। একটু আগে বলা হল, আইনস্টাইন কাউকে লেকচার দিতেন না, তিনি নিজের সঙ্গে কথা বলতেন। এখানে ঠাকুর যে কথা বলছেন, আসলে তিনি নিজের সঙ্গে কথা বলছেন। **তাঁতী যেমন বলেছিল, রামের ইচ্ছাতেই কাপড়ের দাম এক টাকা ছয় আনা, রামের ইচ্ছাতে ডাকাতি হল; রামের ইচ্ছাতেই ডাকাত ধরা পড়ল। রামের ইচ্ছাতে আমাকে পুলিশে নিয়ে গেল, আবার রামের ইচ্ছাতে আমাকে ছেড়ে দিল**। কথামৃতে আগেও এই গল্প এসেছে, আলোচনাও হয়েছে। তাঁতী একজন ভক্ত ছিলেন, তিনি রামের মধ্যেই সব সময় ডুবে আছেন, তাঁর মুখে 'রামের ইচ্ছা' এই কথা মানায়। ছোট বাচ্চা যদি পাকা পাকা কথা বলে, আমরা শুনে হাসি, ঠিক আছে; তখন সেটা অন্য রকম। কিন্তু এইট, নাইনের একটু ধেড়ে হয়ে ওঠা ছোকরাগুলো যখন বেশি পাকা পাকা কথা বলে, বিরক্তি লাগে।

সন্ধ্যা আগত প্রায়। ঠাকুর একবারও বিশ্রাম করেন নাই। ভক্তসঙ্গে অবিশ্রান্ত হরিকথা হইতেছে। মণিরামপুর ও বেলঘরের যত ভক্তরা এসেছিলেন, সবাই ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। সেদিনকার দিনের বর্ণনা শেষ। এরপর দশহরা, ১৫ই জুন আবার দেখা হবে, যেখানে ঠাকুরের খুব নামকরা কথা আলোচনা হয়েছে –ঘুষকীর মত থাকতে হয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে দশহরাদিবসে গৃহস্থাশ্রমকথা-প্রসঙ্গে

পাঁচদিন পর ১৫ই জুন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। ভক্তরা আবার দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে এসেছেন। ভক্তদের মধ্যে অনেকেই আছেন। রাজা মহারাজ পরে যিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ হয়েছিলেন, তাঁরা পিতৃদেব এবং পিতৃদেবের শ্বশুর দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। রাখালের বাবা দ্বিতীয় বিবাহ করেছিলেন। রাখালের পিতার শ্বশুর ঠাকুরের নাম অনেকদিন থেকে শুনে আসছেন। মাস্টারমশাইয়ের কথানুযায়ী শ্বশুর নিজেও একজন সাধক লোক, শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে এসেছেন। তখনকার দিনে সেই সময় এই বাংলায় তথা ভারতে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অনেক সাধক-সাধিকা ছিলেন। যাঁরা ঘর-সংসার সামলাতেন তাঁরাও অনেকে সাধক হতেন। কোন কারণে স্বামী যদি গত হয়ে যেতেন, তাঁর স্ত্রী আরও বেশি সাধনাতে ঢুকে যেতেন। সমাজ তখন ওই ভাবেই তৈরী ছিল। এখন দিনকাল অনেক পাল্টে গেছে। রাখালের বাবার শ্বশুরকে ঠাকুর এক-একবার দেখছেন। ভক্তরা মেঝেতে বসে আছেন। শ্বশুর ঠাকুরকে প্রশ্ন করছেন।

শ্বশুর –মহাশয়, গৃহস্থাশ্রমে কি ভগবান লাভ হয়?

এই প্রশ্ন কথামৃতে অনেকবার এসেছে। ঠাকুর একজন আচার্য। আচার্যরা একই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন ভাবে বুঝিয়ে দেন, বিভিন্ন উপমা দেন। এইভাবে এই কারণেই দেন, যাতে আমাদের বোঝার যতটুকু ক্ষমতা হয়েছে, সেই ক্ষমতা অনুযায়ী আমরা বুঝে নিতে পারি। আমরাও যখন উপনিষদ ব্যাখ্যা করি, সেখানে আমরা অনেক ধরণের উপমা দিই, যার যেটা লেগে যায়। একটা মজার ঘটনা আমি জানি, একটা কোম্পানীতে গ্রুপ ইনসিওরেন্স করতে গিয়ে একজন কর্মচারী কিছুতে সই করতে রাজী হচ্ছিল না; গ্রুপ ইনসিওরেন্সে সে থাকবে না। কোম্পানীর মালিক সেই কর্মচারীকে ডেকে পাঠালেন। লোকটি আসার পর মালিক তাকে বললেন, 'সই কর, তা নাহলে চাকরী যাবে; কারণ, সবাই সই না করলে গ্রুপ ইনসিওরেন্স হবে না'। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে সই করে দিল। মালিক বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এতক্ষণ সই করছিলে না কেন'? লোকটি তখন বলছে, 'না, আমাকে তো এত পরিষ্কার ভাবে কেউ বলেনি'। আমাদের সমস্যা এটাই, এটা সব সময় বোঝা যায় না যে, কে কোন জিনিসটা দিয়ে বুঝবে। সেইজন্য অনেক ভাবে বলতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) –কেন হবে না? পাঁকাল মাছের মত থাক। সে পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক নাই। আবার ঘুষকীর মত থাক।

ঘুষকী হল, একজনের সঙ্গে ঘর করছে, তার ছেলে-মেয়ে আছে; শ্বশুর-শাশুড়ী, ভাসুর-দেওর, ননদ সবাই আছে আর সংসারের সব কাজকর্ম করছে কিন্তু সব সময় চিন্তা করে পরপুরুষের, অর্থাৎ মনটা তার পরে আছে নিজের প্রেমিকের দিকে। এই সমস্যা চিরদিনের, নূতন কিছু না। তবে আগেকার দিনে এই জিনিস আইনগত ভাবে নিষিদ্ধ ছিল, সামাজিক দিক থেকে নিষেধ ছিল, ধর্মের দিক থেকেও নিষেধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে সব কিছু খুলে গেছে, আর তাই এখন এগুলোতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু খুলে গেলেও কি হবে, এর পরিণতিগুলি থাকবে। ঠাকুরের ছিল তীক্ষ্ণদৃষ্টি, যেখানে যেটা দেখতেন সেটাই তাঁর মনে বসে যেত, সেটাকেই ধর্মের উপদেশ দেওয়ার সময় কাজে লাগাতেন।

এখানেও ঠাকুর ঘুষকীর ব্যাপারটা ব্যবহার করছেন – **সে ঘর-কন্নার সব কাজ করে, কিন্তু মন উপপতির উপর পড়ে থাকে। ঈশ্বরের উপর মন ফেলে রেখে সংসারের কাজ সব কর। কিন্তু বড় কঠিন**।

সেদিন এক ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। ওনাকে বললাম, বর্তমানকালে দুটো জিনিস – একটা হল আধ্যাত্মিকতা, আর-একটা হল বেদান্ত; এই দুটো এখন লোকেদের মুখের কথা হয়ে গেছে। অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের সামনে ধর্ম নিয়ে কোন কথা বললে, প্রথেমেই বলবে, I am spiritual, I am not religious। আর-একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল, বিদেশে থাকেন; বর্তমানে ওখানে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে এসে বলছেন, এক বছর ধরে তিনি সারা ভারতে ঘুরবেন। কেন ঘুরবেন? স্পিরিচুয়ালিটিকে তিনি এ্যক্সপ্লোর করবেন। এসব কথা শুনলে হাসি পেয়ে যায়, হাসিটা চেপে ভদ্রলোককে বললাম, 'স্পিরিচুয়ালিটি তো ভিতরে এ্যক্সপ্লোর হয়, বাইরে কি এ্যক্সপ্লোর করছেন? স্পিরিচুয়ালিটিতে যেতে গেলে মানুষকে শুদ্ধ-পবিত্র হতে হয়, ধার্মিক হতে হয়; তার জন্য সারা ভারত ঘোরার দরকার হয় না'। তিনি বলছেন, 'ধর্ম তো আধ্যাত্মিকতারই একটা ছোট্ট অঙ্গ'। আমি ওনাকে বললাম, 'না ভাই, উল্টো; ধর্মের একটা বিশেষ অঙ্গ হল আধ্যাত্মিকতা। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ মিলিয়ে হিন্দু ধর্ম। এই চারটের মধ্যে যাঁরা মোক্ষ পথের পথিক, এনারা হলে আধ্যাত্মিক'। আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, উনি আমার কথা শুনে আমার উপর খুব রেগে গেলেন। আমি বলতে বাধ্য হলাম, 'আপনি তো রেগে যাচ্ছেন'? 'কেন, আপনি কি কখন রাগেন না'? 'না, আমার আচার্যের উপর আমি রেগে যাই না। শ্রোতাদের প্রতি, ছাত্রদের প্রতি আমি কখন-সখন রাগ আসে'। নিজের মনের মত ধারণা করে নিয়েছেন আবার উনি কথামৃত থেকে কোট করে বলছেন, 'কেন ঠাকুরও তো বলছেন, কেন সংসারে হবে না'। 'করুন না। আপনি করবেন কি করবেন না, তাতে আমার কি'।

সমস্যাটা কি হয়, অনেক সময় লোকেরা ভুলভাল জায়গা থেকে কিছু ধর্মীয় কথা, শাস্ত্র কথা শুনে সেখান থেকে একটা ধারণা করে এগোতে থাকেন। কিছুদিন পরে মনটা যখন ভেঙে যায়, তখন বলবে –কই কিছুই তো হলো না, আমার সময়টাই শুধু নষ্ট হল। সোস্যাল মিডিয়ায় আমাকে একজন প্রশ্ন করছেন, রামকৃষ্ণ মিশনে জয়েন করলে আমার কি কি লাভ? আমি বললাম, সবচেয়ে বড় লাভ হল, জীবনে যত বোঝা তুমি বহন করে চলেছ, সব বোঝা খসে পড়ে যাবে, বদলে তুমি কিছুই পাবে না। সব ইয়ং ছেলেমেয়েরা প্রশ্ন করে, সন্ন্যাসী হলে আমার কি কি সুবিধা হবে, গীতা আমি কেন পড়ব? এসব প্রশ্ন শুনে ভাবি, সত্যি দেশের কি অবস্থা। এটা তোমার স্বধর্ম; কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, নিজের স্বধর্মের দিকে তোমাদের কারুর দৃষ্টি নেই।

এই যে ঠাকুর বলছেন, বড় কঠিন, লোকেরা এই কথা মেনে নেবে, শুনবে। কিন্তু এই কথাই আমরা যখন বলি, তখন আমাদের বলবে, আপনি আমাদের নিরুৎসাহ করছেন। কেন আমি নিরুৎসাহিত করব। কাল আপনার মনটা যখন ভেঙে যাবে, তখন পুরো ব্যাপারটাকে গালাগাল দেবেন; যদিও ঠাকুরের সময় এই জিনিস কম হয়েছিল, কিন্তু স্বামীজীর সময় প্রচুর হয়েছে। স্বামীজীর একজন খুব

নামকরা ভক্ত ই ডি স্টার্ডি, পরে স্বামীজীকে গালাগাল দিতে দিতে স্বামীজীকে ছেড়ে বেরিয়ে গেল। লিও ল্যাণ্ডসবার্গ, মূলার, সবাই গালাগাল দিয়ে স্বামীজীকে ছাড়ল। কোথাও এসে মানুষের মনটা ভেঙে যায়। স্বামীজীর মত লোকের কাছে থেকেও মানুষের মন ভেঙে যাচ্ছে, সেখানে এই ধরণের ধারণাগুলো –হ্যাঁ হ্যাঁ সংসারে থাকলেও হবে; কিছুদিন পরে দেখছে কই কিছুই তো হচ্ছে না। তখন মনে হয় যে, সব কিছু বৃথা হয়ে গেল, সব নষ্ট হয়ে গেল।

আমি ব্রহ্মজ্ঞানীদের বলেছিলুম, যে-ঘরে আচার তেঁতুল আর জলের জালা সেই ঘরেই বিকারের রোগী! কেমন করে রোগ সারবে? আচার তেঁতুল মনে করলে মুখে জল সরে। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক আচার তেঁতুলের মতো। এখানে ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের লোকদের উদ্দেশ্য করেই বলছেন। জেনেটিক্যালি আমরা এমন ভাবে তৈরী যে, নারী-পুরুষের এই ব্যাপারটাকে কাটিয়ে ওঠা খুব মুশকিল। একটা খ্রীশ্চান গল্পে একজন খ্রীশ্চান পাদরীর সাথে একজন নানের মাখামাখি চলছিল। ফাদার সেই পাদরীকে ডেকে তিরস্কার করে সাবধান করে দিয়েছেন। খ্রীশ্চান পাদরী ফাদারকে তখন বলছেন, 'না না, আমরা শুধু ধর্মের কথা বলি, আমাদের পবিত্র সম্পর্ক'। ফাদার ছিলেন একজন বিচক্ষণ মানুষ, তিনি পাদরীকে খুব সুন্দর কথা বলছেন –মাটি ভাল, জলও পবিত্র; দুটো মিশলে কাদা।

ফেমিনিস্ট, লিবারিজম, এই জিনিসগুলো সমাজে আছে, কোন অসুবিধা নেই। আমাদের এখানে আগেকার দিনে, বর্তমানে নেই, যারা নিম্নশ্রেনীর তাদের অনুমতি ছিল –তুমি মদ খেতে চাও খাও, চারটে বিয়ে করতে চাও কর, চারটে বিয়ে করে ছেড়ে দিতে চাও, ছাড়; আমাদের কোন অসুবিধা নেই। তুমি কামভোগে আছ, ঠিক আছে, কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি ধর্ম পথে আসো, তাহলে এসব জিনিস একেবারেই করা যাবে না। কারণ কামভোগ পুরো সত্তা হরণ করে নেবে, উভয় উভয়েরই, এক অপরকে টেনে নেবে। পুরুষ তা তিনি সন্ন্যাসীই হন, সাধু-মহাত্মাই হন, যাই হন; যখন কোন নারীর কাছে যাবেন বা নারীর মন যখন সন্ন্যাসীর দিকে যায় তখন উভয় উভয়ের সত্তাকে নাশ করে দেয়। সে আর সে থাকে না, সত্তা হরণ হয়ে যায়।

আর বিষয় তৃষ্ণা সর্বদাই লেগে আছে; ওইটি জলের জালা। বিষয় তৃষ্ণা হল, এই জগৎকে আমি যখন জগৎরূপে দেখছি। জগৎকে যখন জগৎরূপে দেখি তখন কি হয়? তখন দুটো সত্তা হয়ে যায় –এক আমি, আর দুই জগৎ। আমি আলাদা, জগৎ আলাদা; তখন স্বাভাবিক ভাবেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য থাকবে। বেদের পুরুষসূক্তমের দ্বিতীয় মন্ত্রে বলছেন, *পুরুষ এবেদং সর্বম্ যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্*, পুরুষ, অর্থাৎ ভগবানই সব কিছু হয়েছেন, আর যেটা হয়েছেন সেটাও তিনি আর যেটা হবেন সেটাও তিনি বা ঈশোপনিষদে *ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ*, সমস্ত কিছুকে ঈশ্বররূপে দেখ। তখন কি হবে! এই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ থাকবে না। কিন্তু এই বোধ কজনের থাকে? মুখে বলা যায়, আমরা রাজা জনকের মত কিন্তু বাস্তবে সম্ভব না। আমরা অনেক দিন ধরে এই পথে আছি, আমরা জানি, অত সহজ নয়। কারণ যতক্ষণ আপনি জগৎকে জগৎরূপে দেখছেন, ততক্ষণ এগোন খুব মুশকিল। সংসারে থাকলে জগৎকে জগৎরূপেই না দেখতে হবে, বিশেষ করে যাদের রোগ আছে।

আমি এক সময় আমাদের হরিদ্বার আশ্রমে ছিলাম। সেই সময় দিল্লি থেকে একজন এসেছিলেন; উনি একাধারে একজন খুব সুসংস্কৃতিসম্পন্ন, বড়লোক আবার একজন বড় ভক্ত। ওনার পরিবারের ছয় কি সাত বছরের একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে এসেছেন, মেয়েটির ডায়বেটিস। তখন শুনিওনি যে বাচ্চাদেরও ডায়বেটিস হয়। মেয়েটির মা কয়েকজনের সাথে কথা বলছিলেন, আমিও ওনার সেই কথা শুনছিলাম –যখন পার্টি আদিতে যায়, আমরাই সঙ্গে নিয়ে যাই। সেখানে সবাইকে আইসক্রিম খেতে দেখে, চকলেট খেতে দেখে; বাচ্চা তো, কি করবে ও-ও খেতে চায়। কিন্তু ওটা যে ওর জন্য বিষ বুঝতে পারে না। কথাগুলো শুনে আমার ভিতরটা করুণায় আর্দ্র হয়ে যাচ্ছিল। আমি, আপনি, তিনি আমরা সবাই রোগী। শ্রীরামকৃষ্ণরূপী হাসপাতালে আমরা সবাই হস্পিটালাইজড্ হয়ে আছি, চিকিৎসা

করাচ্ছি। কত রকমের রোগ –কাম-ক্রোধ-লোভাদির রোগ, কামিনী-কাঞ্চনের রোগ, বিষয়তৃষ্ণার রোগ। এটাকে ছেড়ে সংসারে থাকছেন, সংসারে থাকাটা সমস্যা না। সংসারে আপনি কোন জিনিসকে ভোগ করছেন? সারাদিন এনজয় করার পর দিনের শেষে সব কিছুর অন্ত হয়ে যায়। সন্ধ্যা সাতটা কি আটটা হয়ে গেল, এবার আপনি কি করতে চাইছেন? যেটা করতে চাইছেন, প্রকৃতপক্ষে এটাই আপনার আসল রূপ। কারণ তখন জগৎ নেই, বাড়ির লোকেরা নেই, সংসার নেই; আপনি এখন নিজের মত আছেন, এটাই হল আপনার আসল রূপ। তখনই বোঝা যায়, আপনি কি এনজয় করতে চাইছেন। ওটাই আপনার সবচেয়ে বড় রোগ। সেই সময় যদি আপনার মনে হয়, ঈশ্বরচিন্তন ছাড়া আমি অন্য কিছু করব না, তাহলে সংসারে থেকেও আপনি একজন মহাপুরুষ।

এ তৃষ্ণার শেষ নাই। বিকারের রোগী বলে, এক জালা জল খাব। বড় কঠিন। আজকে আমরা ভগবান বুদ্ধকে প্রণাম করি, তিনি অবতার। আমরা খুব প্রশংসা করে বলি, তিনি রাজ্য-রাজত্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সুন্দরী স্ত্রীকে পিছনে ছেড়ে গেলেন। আবার সদ্যোজাত পুত্র রাহুলকে তিনি বলছেন গ্রন্থি, বন্ধন। আমি মাঝে মাঝে একটা মজার কথা ভাবি। হিন্দুদের অনেক কিছুকে নিয়ে নিন্দা করা হয়। কোথায় কোথায় থেকে হিন্দুদের নিন্দা করার জন্য এমন এমন জিনিস খুঁজে বার করে আনবে যে, দেখে আমার অবাক লাগে। এমন এমন সব বই বার করবে, যে বইয়ের নামও আমরা কোন কালে শুনিনি। কিন্তু বৌদ্ধদের নিন্দা করার সাহস কারুর নেই। ইসলামের নিন্দা করার তো কোন প্রশ্নই নেই। কেউ যদি প্রশ্ন করেন, বুদ্ধ কেন তাঁর নবজাতক শিশুকে ফেলে রেখে বেরিয়ে গেলেন? বর্তমান কালে একজন নেতাকে নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন উঠেছিল, তিনি নিজের স্ত্রীকে কেন ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই দেশ ভগবান বুদ্ধকে পূজা করে, বিশেষ করে নিজের সদ্যোজাত সন্তানকে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরেও মানুষ আজও তাঁকে পূজা করে আসছেন। অভাবে তিনি সংসার ছাড়েননি, সমস্ত রকম ভোগের পরিপূর্ণ অবস্থায় তিনি ছিলেন। কতটা বুকের পাটা লাগে এটা করার জন্য। তিনি বৈদিক ধর্মমতে অগ্নিকে সাক্ষী রেখেই বিবাহ করেছিলেন। সন্তান যখন হয়েইছে, তখন মাথায় এটা পরিষ্কার যে, আমার সন্তান আছে। অথচ তিনি সব ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন, কতটা বুকের পাটা লাগে; নিন্দুকরা নিন্দা করতে পারে; করে দেখাও না। খুব কঠিন।

সংসারে নানা গোল। এদিকে যাবি, কোঁস্তা ফেলে মারব; ওদিকে যাবি, ঝাঁটা ফেলে মারব; এদিকে যাবি জুতো ফেলে মারব। কোঁস্তা মানে কাস্তে। আর কি? ঝাঁটা, জুতো। এই প্রসঙ্গে আমার একটা নামকরা গল্প মনে পড়ে গেল। সংস্কৃতে খুব নামকরা একজন কবি ছিলেন, তাঁর নাম দণ্ডি। ওনার খুব নামকরা বই হল দশকুমারচরিত। সংস্কৃত ভাষায় এই একটা বই উপন্যাসের আকার নিয়েছিল। দশ কুমারের একজন ছিলেন, যিনি রাজকুমার। তাঁর অন্যান্য যে রাজকুমার এনারা সবাই মন্ত্রীর সন্তান। রাজকুমারের মনে ঈশ্বর, জীব, জগৎ, জীবন-মৃত্যু এইসব নিয়ে কিছু প্রশ্ন জেগেছে। রাজকুমারকে বলা হল, মারীচি নামে একজন ঋষি আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারলে আপনি আপনার সব উত্তর পেয়ে যাবেন। কুমার সেখানে গিয়ে দেখে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে আছেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোককে মারীচি ঋষির কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, মারীচি নামে একজন এখানে ছিলেন, তবে এখন আর উনি সাধু সন্ন্যাসী নন। কুমারের তখনই সন্দেহ হল এর মধ্যে কিছু গোলমাল আছে। 'কেন, কি হয়েছিল ওনার? আমি পুরো ঘটনাটা শুনতে চাই'।

গল্পটা হল, ওই শহরে এক নর্তকী ছিল। হঠাৎ একদিন সেই নর্তকী সব কিছু ছেড়ে মারীচি ঋষির সাথে দেখা করার জন্য ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে। 'আমি আপনার শরণাপন্ন হলাম, আপনার কাছ থেকেই আমি শিক্ষা গ্রহণ করব'। পুরো শহর জুড়ে হৈ হৈ পড়ে গেছে। ঋষি মেয়েটিকে অনেক করে বোঝালেন, 'বাছা, এই জীবন অনেক কষ্টের জীবন'। মেয়েটা ঋষির কথা মানবে না। যাই হোক এবার থাকতে শুরু হল। আশ্রমে সেবা করতে শুরু করল, আশ্রম ঝাঁড়ু দেয়, এটা ওটা অনেক কাজ করছে। অন্য দিকে প্রচণ্ড নিষ্ঠার সঙ্গে শাস্ত্রপাঠ শোনে। মরীচি মেয়েটির উপর খুব খুশী। শাস্ত্রের

নানা রকম আলোচনা চলতে লাগল। একদিন মেয়েটি জিজ্ঞেস করছে –প্রভু, ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ নিয়ে অনেক কিছু বললেন, কিন্তু কাম নিয়ে তো কিছু বললেন না। আমাদের তো চারটে পুরুষার্থ, তার মধ্যে কাম সম্বন্ধে কিছু তো বললেন না। মরীচি বললেন, 'এ ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই, আর তুমি তো এই ব্যাপারে বেশি জানবে, তুমিই আমাকে শিখিয়ে দাও না কেন'। বাবাজীর মাথা গেল ঘুরে। মেয়েটি তখন বলতে লাগল, 'তা কি করে হয়, আপনি একজন ত্যাগী পুরুষ, কি করে আপনাকে আমি কাম সম্বন্ধীয় শিক্ষা দেব'। কোন সাধুকে যদি বলে দেন, আপনার মত ত্যাগী সাধু কে আছে, সাধুর মাথাটা ঘুরে যাবে; ঠাকুরও বলছেন, সাধুর সব যায় কিন্তু সাধুত্বের অহঙ্কার যায় না। শেষে শর্ত রাখা হল, আপনি আগে আমাকে বিয়ে করুন, তারপর আপনাকে আমি কামের শিক্ষা দেব। মরীচি অত বড় ঋষি, সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। মাথাটা ঘুরে গেছে, যা সবার হয়ে থাকে। মেয়েটি তখন বললেন, 'আপনাকে রাজার সামনে গিয়ে তিন সত্য করতে হবে'। আবার শহরে হৈহৈ পড়ে গেছে, মারীচি এত বড় সাধু তিনি কিনা ওই নর্তকীকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। রাজার কাছে গিয়ে তিন সত্য হল। এরপর এই নর্তকী রাজাকে বলছে, 'অমুক নর্তকীকে ডেকে আমার দাসী বানাতে হবে'।

ব্যাপারটা হল নর্তকীর সঙ্গে একদিন তার সখীর সাথে জোর বিবাদ লেগেছে। নর্তকীকে তার সখী বলছে, 'তুমি এমন অহঙ্কার করছ যে, মনে হচ্ছে মারীচি মুনির মাথাটাও তুমি ঘুরিয়ে দেবে'। নর্তকী বলল, 'তুমি দেখতে চাও মারীচি মুনির মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারি কিনা'? 'ঠিক আছে, যদি ঘুরিয়ে দিতে পার তবে আমি তোমার দাসী হয়ে থাকব, আর যদি না পার, তুমি আমার দাসী হয়ে থাকবে'। সত্যিই কয়েকদিনের মধ্যে মাথা ঘুরিয়ে দিল, বেশি দিন লাগেওনি। রাজার সামনে পুরো ঘটনাটা বলা হল। ওদিকে মারীচি বলছেন, 'আমাদের বিয়ের কি হবে'? নর্তকী বলছে, 'ভাগ্ বুড়ো! তোকে কি বিয়ে করবে! আমার এই বাজী জেতার ছিল বলে এত নাটক করলাম, এবার তুমি বেরোও'। মারীচি মুনি আর কি করবেন, নারীর পাল্লায় পড়ে তাঁর সমস্ত সাধনা গেল, সম্মান গেল, সব শেষ হয়ে গেল। এই কুমার তখন বুঝে গেল, এই বৃদ্ধই হলেন সেই মারীচি। কুমার তখন বোঝালেন, 'আপনি এত তপস্যা করেছেন, আপনি আবার তপস্যা করুন, দেখবেন আপনি যেখানে ছিলেন সেখান থেকেও অনেক উপরে চলে যাবেন'।

সবাই মনে করি আমি বেশ আছি। সংসারে কি কেউ বেশ থাকতে পারে? চারিদিকে তাকালে আতঙ্ক লেগে যায়। আপনি বলবেন, কই আমার তো আতঙ্ক মনে হচ্ছে না। এটাই খুব মজার জিনিস, এটাকেই আমাদের শাস্ত্র বলে তন্ময়তা। মানুষের মন এমন একটা জিনিস, যেখানে আছে, সেখানে যেমন আছে, তাতে তন্ময় হয়ে গেলে তখন ওর ওটাকেই ঠিক বলে মনে হয়। অনেকদিন কেউ যদি জেলে থাকে, ছাড়া পেলে জেল ছেড়ে যেতে চায় না। কারণ ওর মন ওতেই তন্ময় হয়ে গেছে। একটা নামকরা সিনেমা আছে, যার নাম শশাঙ্ক রেডিমশান, সেখানে ওই রকম একটি কয়েদির কথা আছে। কয়েদিটা অনেক বছর ধরে জেলে আছে। তাকে যখন ছেড়ে দেওয়ার কথা হল, তখন সে আর জেল থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে না। এই ধরণের প্রচুর কাহিনী আছে। মাণ্ডুক্য উপনিষদে আছে, জাগ্রত অবস্থাতে আমরা এত বেশি তন্ময় হয়ে থাকি যে, এটাকেই আমাদের সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তব হল, জাগ্রত আর স্বপ্ন দুটোই সমান, কোন মতেই জাগ্রত স্বপ্ন থেকে বেশি সত্য না। পুরো তফাৎটা হয় তন্ময়তার জন্য, জাগ্রত অবস্থায় আমরা তন্ময় হয়ে আছি। আমি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, আমি বেলুড় মঠে আছি, এখানে আমি তন্ময় হয়ে আছি। এমন তন্ময় হয়ে আছি যে, এখানকার সব কিছুই আমার ঠিক বলে মনে হয়।

স্বামী স্বাহানন্দজী মহারাজ, আমাদের খুব নামকরা বড় মহারাজ ছিলেন, দেহ রেখেছেন। আমেরিকার বার্কলেতে অনেক বছর ছিলেন, পরে অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। উনি একবার এই জিনিসটাকে নিয়ে আলোচনা করছিলেন। আমি তখন অদ্বৈত আশ্রমে থাকতাম, অল্প বয়স, ব্রহ্মচারী। একবার খুব সিনিয়র মহারাজ, অত্যন্ত জ্ঞানী পুরুষ, তিনি মহারাজকে বললেন, 'মহারাজ, আপনার কি

মনে হয় না যে, রামকৃষ্ণ মিশনের যে আধ্যাত্মিক দর্শন, এটা সত্যিকারের একটা শ্রেষ্ঠ দর্শন'? মহারাজ বারবার হেসে ঠিক এই কথাই বলছেন, এখানে থেকে তুমি এই আলোচনা করতে পারো না।

গিডল্ ছিলেন খুব নামকরা একজন গণিতজ্ঞ, তিনি একটা থিয়োরান দিতে গিয়ে বলছেন, যেটা আমাদের ভাষায় হবে; যে সিস্টেমে আছেন, সেই সিস্টেমে থেকে সেই সিস্টেমের সাহায্য নিয়ে আপনি প্রমাণ করতে পারেন না যে এই সিস্টেমটাই ঠিক। গিডল্ ম্যাথমেটিক্যাল থিয়োরান দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন, এটা হতে পারে না –Incompleteness Theory। যখন আপনি সংসারে আছেন, সংসারে এমন তন্ময় হয়ে যান যে, আপনি বুঝতেও পারেন না যে, আপনাদের কিছু গোলমাল আছে। চীন, রাশিয়ায় যখন সোস্যাল রিভেলিউশান হচ্ছিল, ভারতে কম্যুনিস্টরা যখন তাদের মতবাদ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে গিয়ে বলতে লাগল, তোমরা বুঝতে পারছ না যে তোমরা কত খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়ে আছ। লোকেরা তাদের এটাই বলল, আমরা ঠিকই তো আছি, কোন অসুবিধা নেই তো, আমাদের কোন শোষণ তো হচ্ছে না। এই জাগরণ ধীরে ধীরে আসে।

বড়ই দুঃখের –এদিক যাবি কোঁস্তা ফেলে মারব, ওদিকে যাবি, ঝাঁটা ফেলে মারব; এদিক যাবি জুতো ফেলে মারব। সংসারে আছে, স্ত্রী-পুত্র, বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি এক গুচ্ছ সম্পর্কের সাথে জড়িয়ে আছে। আপনি একটা কিছু করতে যাচ্ছেন, আর তখনই খবর এলো পরিবারের অমুক মারা গেছে বা হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে, সেই রাত্রেই সব কিছু ফেলে আপনাকে দৌড়াতে হচ্ছে। এড়িয়ে যাওয়া যায় না, কি করে এড়িয়ে যাবেন, আপনিই তো দায়ীত্ব নিয়েছেন। আবার কেউ যদি বলে আমি বিয়ে করব না; কি করে থাকবেন, সময় কাটাবেন কি দিয়ে? সবচেয়ে বড় সমস্যা, বুড়ো বয়সে আপনাকে কে দেখবে? ছেলেমেয়ে থাকলেই যে দেখবে তাও না। ছেলে বিদেশে পড়ে আছে, বাবা-মাকে পাড়ার লোকেরা দেখছে। কিন্তু ঠাকুর এবার যেটা বলছেন, এটা আমার আপনার জন্য খুব জরুরী দরকার।

আর নির্জন না হলে ভগবানচিন্তা হয় না। নির্জন না হলে ভগবান চিন্তন কোন ভাবেই হবে না। আপনাদের যাঁদের মনে ঢুকে আছে যে সংসারে থেকেও হবে, তাহলে নিজেকে প্রশ্ন করুন। আপনি কি নির্জন হতে পারছেন? নির্জনে থাকতে পারেন? আমরা যদি কিছু বছর আগে চলে যাই, সেই সময় বাড়িতে যাঁরা ছিলেন, যেমন আমরা রাখালের পিতার শ্বশুরকে দেখলাম, তিনি একজন সাধক। তাঁর স্ত্রী সংসারের কিছু জিনিস সামলে দিচ্ছেন, তাঁর ভাই অন্য কিছু সামলে দিচ্ছেন, বাজার-হাট অন্য একজন করে দিচ্ছেন। ইনি এনার অল্প একটু যে কাজ আছে, সেই কাজটুকু করে দিয়ে বাকি সময়টা ঈশ্বরকে দিতে পারছেন। বর্তমান কালে এই জিনিস সম্ভবই না। আগেকার দিনে ওষুধপত্রের জন্য সে-রকম খরচা হত না, হোম রেমিডিজ ছিল। এখন কোন ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তারের দক্ষিণাতেই পাঁচশ টাকা চলে যাবে। শুধু ওষুধ লিখে দিলে তাও ভাল, যদি দামী ওষুধ লিখে দেয় তাহলে তো শেষ। শুধু ওষুধে তো চিকিৎসা হবে না, সাথে সব রকম প্যাথলজিক্যাল টেস্ট, যেটা করতে কয়েক হাজার টাকা বেরিয়ে যাবে। আমরা ছোটবেলা যখন স্কুলে পড়াশোনা করতাম তখন স্কুলের সব কিছু ফ্রী ছিল। এখন বাচ্চাকে দামী স্কুলে না দিলে হবে না, আর তাদের এত ফী যে শুনলে মাথা ঘুরে যায়। আমার তো মনে হয়, আমাকে হয়তো পড়াশোনা না করেই থাকতে হত। কারণ বাড়ির লোকেরা কোথা থেকে এত টাকা খরচ করবেন। এর পরেও কেউ যদি বলেন, আমি ভগবানের চিন্তন করব, তাহলে এই ঝামেলাগুলো কে সামলাবে? খুব মুশকিল, ভগবানচিন্তন সম্ভব না।

আর দিনে দিনে পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাচ্ছে। একটা প্লেন বা ট্রেনের টিকিট যদি কাটতে চান আপনাকে কত জটিলতার সম্মুখীন হতে হবে। স্মার্টফোন না থাকলে হবে না, পেমেন্ট মোবাইল ফোন দিয়ে করতে হবে। ওই মোবাইল ফোনকে হ্যাকিং করার জন্য লোকজন সব ওৎ পেতে আছে। আগেকার দিনে পকেটমার হত, এখন ফোনমার হচ্ছে। আজকের দিনে যাঁরা বয়স্ক, তাঁরা কি করবে? কোথা থেকে এনারা এত কিছু শিখবেন? আগেকার দিনে ভারতবর্ষ ছিল বৃদ্ধদের জন্য স্বর্গ।

কারণ তখন খাওয়া-পরা জুটে যেত আর অবসর সময়ে ঈশ্বরধ্যান, ঈশ্বরচিন্তন করতেন। দিনে দিনে বয়স্ক মানুষরা সমাজে অবাঞ্ছিত হয়ে যাচ্ছেন, তারপর আধার করাও, প্যান করাও, রেশনকার্ড করাও, ওই সাথি সেই সাথির কার্ড করাও; বয়স্করা কোথায় দৌড়াদৌড়ি করবেন। এই পরিস্থিতির মধ্যে কিসের ঈশ্বরচিন্তন করবেন আর কিসের ঈশ্বরধ্যান করবেন।

সোনা গলিয়ে গয়না গড়ব তা যদি গলাবার সময় পাঁচবার ডাকে, তাহলে সোনা গলানো কেমন করে হয়? চাল কাঁড়ছ একলা বসে কাঁড়তে হয়। এক-একবার চাল হাতে করে তুলে দেখতে হয়, কেমন সাফ হল। কাঁড়তে কাঁড়তে যদি পাঁচবার ডাকবে, ভাল কাঁড়া কেমন করে হয়?

ঠাকুর বিভিন্ন রকম উদাহরণ নিয়ে আসছেন, এত ধরণের উদাহরণ নিয়ে আসেন যে, কোথাও না কোথাও আমাদের মনটা বসে যাবে। আপনারা পাঁকাল মাছ দেখেছেন, বাড়িতে এখন আর মায়েরা চাল কাঁড়েন না, আর কোথাও যদি দেখে থাকেন, তাহলে দেখবেন চাল সব সময় একা একাই কাঁড়েন, অনেকে মিলে কাঁড়লে চালের মধ্যে অনেক আজেবাজে জিনিস থেকে যাবে। তাই একা বসে চাল কাঁড়া, বলতে চাইছেন, নির্জন না হলে হবে না। এখানে একজন ভক্ত আবার প্রশ্ন করছেন।

একজন ভক্ত –মহাশয়, এখন উপায় কি?

এই জায়গাতে এসে লোকেরা ভুল বুঝে নেয়। ঠাকুরের কথামৃত নিছক ধর্মোপদেশ নয়, কথামৃত উপনিষদের তত্ত্ব। উপনিষদে যেমন তত্ত্ব কথার বাইরে অন্য অন্য কথা আছে, ঠিক তেমনি কথামৃতেও কিছু কিছু অন্য কথা আছে, যেমন সংসারে কিভাবে থাকতে হয়; কিন্তু কথামৃত মূলতঃ উপনিষদের তত্ত্ব। এগুলোই আধ্যাত্মিক সত্য, ধর্ম এখান থেকেই জন্ম নেয়। যখন জীবনে আমরা এই সত্যকে নামাতে যাব, তখন কি হয়? আমাদের ধর্মজীবন তৈরী হয়। আজকে যাঁরা অলিম্পিকে পদক জয় করছেন, একদিনে কেউ তাঁরা খেলাধূলা প্রতিযোগিতার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মঞ্চে পৌঁছে যাননি। তাঁদেরও এক সময় শৈশব অবস্থা ছিল, একটা সময় থেকে বাবা-মার হাত ধরে হাঁটতে শিখেছেন, আজ অলিম্পিক একশ মিটার দৌড়ে পদক জিতে বিশ্বের একজন সেরা দৌড়বাজের সম্মান পাচ্ছেন। রাখালের পিতার শ্বশুর এটাই যেন জিজ্ঞেস করতে চাইছেন, অলিম্পিকে যাঁরা পদক জিতছেন, তাঁরা কিভাবে জয়ী হচ্ছেন? সবাইকেই কোথাও তো শুরু করতে হবে।

এই শুরুটা যখন হয়, তখন প্রথম একটা পা ফেলতে হয়। সংসারে যাঁরা আছেন, তাঁদেরও প্রথম পা ফেলতে হয়। তারপর ধীরে ধীরে সব ব্যবস্থা হয়ে যায়। ঠাকুরই বর্ণনা করছেন, ঠিক ঠিক সময় যখন হয়, তখন ঈশ্বরই সব রকম ব্যবস্থা করে দেন; হয়ত কেউ সংসারের দায়ীত্ব নিয়ে নিল। একটা সময় দেখেন, সংসারটা আর ভাল লাগছে না। এটাকে বলে কমফর্ট লেভেল। আপনি দেখুন, সংসারের কোন জায়গাতে গিয়ে আপনি নিজেকে ভাল মনে করেন? সিনেমার গান শুনতে আপনার কি ভাল লাগে? ওতে কি আপনি রমণ করেন? মূল জিনিস হল রমণ, রমণ মানে যেখানে গিয়ে বাস করে। আপনি কোনটাতে রমণ করেন? যেখানে রমণ করতে চাইছেন, ওটাই আপনার আসল রিয়েলিটি। দ্বিতীয় হল, আপনি কতটা চেষ্টা করেন আর কতক্ষণ ওতে সময় অতিবাহিত করেন? যখন আপনি সত্যিই ঈশ্বরের পথে চলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবেন, ঈশ্বর তখন একটা একটা করে ব্যবস্থা করে দেন। গীতায় যেমন ভগবান বলছে, *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্,* তার যা যা দরকার আমি নিজে বয়ে নিয়ে আসি। আবার সাধনার পথে এগোবার জন্য যা যা দরকার তিনি জুগিয়ে দেন; দরকার হলে মনের মোর ফিরিয়ে দেন।

কয়েকজন ভক্ত একদিন আমার সঙ্গে দেখা করে এসেছেন; একজন ভক্ত বলছেন, 'মহারাজ ঠাকুরকে একবার বলুন না আমার মনের মোর ফিরিয়ে দিতে'। 'কি করে ঠাকুর মোর ফেরাবেন? আপনি অসুস্থ, আপনি বিকারের রোগী; কি করে ঠাকুর আপনাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবেন'। যাঁরা এসে বলেন, মহারাজ আমার মনে অনেক আবর্জনা জমে আছে, ঠাকুরকে একটু বলুন এগুলোকে তিনি যেন

কৃপা করে পরিষ্কার করে দেন। এভাবে কখন হয় না, হবেও না। আপনাকে নিজেকেই লেগে থাকতে হবে। এদিকে চেষ্টাও করে যেতে হবে, ওদিকে লেগেও থাকতে হবে, লেগে থাকতে থাকতে যেই প্রস্তুতি হয়ে গেলে মনের সব হিজিবিজি আপনিই চলে যাবে। আপনি যদি সত্যিই প্রস্তুত থাকতেন, আপনার মনে এই জিনিসগুলো আসতই না। এগুলো আসছে মানে, আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, আপনার সময় লাগবে।

একজন এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা-বাবাকে দিব্যি খেয়ে যে কথা দিয়েছিলাম সেই কথা যদি রাখতে না পারি বা ভগবানের কাছে যদি কোন পণ করি আর পণ যদি ভাঙি তাহলে কি হবে'? আমি তাঁকে এটাই বললাম যে, কিছুই হবে না। দিব্যি খেয়ে বা কথা দিয়ে যদি কথা না রাখতে পারে; এর অর্থটাই হল, বেচারীর ভিতর থেকে কোন বাসনা এত জোর তোড় মারছে যে সে সামলাতে পারছে না, একেবারে অসহায়। কতটা অসহায় হলে গিয়ে সে মা-বাবার কাছে দিব্যি খেয়ে যে কথা দিয়েছিল সেই কথা ভাঙছে, ভগবানের কাছে দিব্যি খাওয়ার পর সে নিজের কথা রাখতে পারছে না। তারপর তাকে এটাই বললাম, 'যদি চেতনা হয়ে থাকে যে, এই রকম ভুল হয়েছে; তাহলে যার কাছে দিব্যি খেয়েছিলে তাঁর সামনে গিয়ে বল, আমি এই রকম দিব্যি খেয়েছিলাম, আমি পারলাম না, আমি ক্ষমাপ্রার্থি, আমি আর এই দিব্যি ভাঙব না'।

তার মানে এই নয় যে পরে তুমি আর ভাঙবে না, পরেও আবার ভাঙবে। প্রথমবার কোন বিধি যদি উল্লঙ্ঘন বা লক্ষ্মণরেখাকে অতিক্রম করে ফেলি, সেটা ভুলেও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয়বার যদি আপনি লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করেন, তার মানে আপনার মধ্যে দুর্বলতা আছে। আমরা বাচ্চাদের অনেক সময় বলি, তোমাকে এতবার করে বলি, তুমি বুঝতে পারছ না? কেন একই ভুল কাজ বারবার কর? কারণ এটা তার স্বভাবেই আছে। স্বভাব পাল্টাতে সময় লাগবে। তাহলে উপায় কি? এটাই একজন ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করেছেন। উপায় –চেষ্টা আর প্রার্থনা, দুটো এক সঙ্গে চলবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ –আছে। যদি তীব্র বৈরাগ্য হয়, তাহলে হয়। যা মিথ্যা বলে জানছি, রোখ করে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ কর।

রোখ মানে, করব না বলে দিয়েছি, ব্যস্ না তো না, আর করব না। অনিত্য বলতে এখানে সেটাকেই বলছেন, যেটা আমাকে ঈশ্বরের পথে নিয়ে যাবে না, আমি বুঝে গেছি যেটা আমাকে ক্ষতি করে, সেটাই অনিত্য; তৎক্ষণাৎ সেই জিনিসকে ত্যাগ করে এগিয়ে যেতে হবে। এই জিনিসটার উপর লাটু মহারাজের জীবনে আমরা খুব সুন্দর একটা ঘটনা দেখতে পাই। বিহারের ছাপড়া অঞ্চলের লোকেরা তাড়ি, হাড়িয়া এই ধরণের নেশার জিনিস পান করে। লাটু মহারাজ ওখানকার বাসিন্দা ছিলেন। গ্রামে বাচ্চা বয়সে তিনি হয়ত তাড়ি বা ওই জাতীয় কিছু লোকেদের খেতে দেখে থাকবেন বা তিনি নিজেও হয়ত কোন সময় খেয়ে থাকবেন। সব জায়গায় নিচু জাতির লোকেরা সবাই তাড়ি খায়।

কলকাতায় ঠাকুরের গৃহীভক্ত রামবাবুর বাড়িতে লাটু মহারাজ থাকতেন আর প্রায়ই তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসতে হত। যাতায়াতের পথে তিনি কোথাও ভাটিখানা দেখেছেন। যখন তাঁর চেতনা হল, তিনি ওই পথ দিয়ে দক্ষিণেশ্বরে আসা ছেড়ে দিয়ে অন্য একটা বিরাট লম্বা পথ ধরে আসা-যাওয়া করতেন।

কাশ্মীরে স্বামীজী বোট হাউসে আছেন, সেখানে লাটু মহারাজও আছেন। স্বামীজী মজা করার জন্য বোটম্যানের এক মেয়ের হাত দিয়ে লাটু মহারাজের কাছে পান পাঠিয়েছেন। লাটু মহারাজ বাচ্চা মেয়েটি আসতেই ডাল লেকের ওই ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপ মেরে দিলেন। সাঁতার জানেন না, শুনলে সারা শরীর আঁৎকে ওঠে। স্বামীজী ছিলেন এক মহা বীরপুরুষ। লাটু মহারাজ কখন নিজেকে সেভাবে মনে

করতেন না। তৎক্ষণাৎ ত্যাগ, যেটা ত্যাগ হয়ে গেল, আর তার ধারে কাছে যাওয়া না –এই কথাই ঠাকুর এখানে বলছেন। ঠাকুর এবার নিজের জীবনের ঘটনা দিয়ে উদাহরণ দিচ্ছেন।

যখন আমার ভারী ব্যামো, গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে লয়ে গেল। গঙ্গাপ্রসাদ বললে, স্বর্ণপটপটি খেতে হবে, কিন্তু জল খেতে পাবে না, বেদানার রস খেতে পার। সকলে মনে করলে, জল না খেয়ে কেমন করে আমি থাকব। আমি রোখ কল্লুম আর জল খাব না। 'পরমহংস'! আমি তো পাতিহাঁস নই – রাজহাঁস! দুধ খাব।

শুধু যে ঈশ্বরের পথে চলার জন্য কামিনী-কাঞ্চন ত্যগ, তা না। সাধারণ জিনিস, শরীর খারাপ, ওষুধ দেওয়া হয়েছে, ওষুধ খাওয়ার বিধি-নিষেধে বলা হল, তুমি জল খাবে না। ঠিক আছে, তাই হবে, আমি জল খাব না। আমি তো পরমহংস, রাজহাঁস, পাতিহাঁস না। কথাটা এত সুন্দর একটা কথা; এটাই যেন একটা সাধনা। আমি, আপনি, আমরা সবাই যেন এটা মনে রাখতে পারি। বেদান্তের কথা অহং ব্রহ্মাস্মি, বেদান্তের এই অহং ব্রহ্মাস্মিকে চেতনাতে সব সময় রাখতে হয়, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা। কিন্তু এই কথাগুলো এত উঁচু কথা, জীবনে যখন নামাতে যাই তখন এত তফাৎ হয়ে যায় যে, আমরা ছেড়েই দিই। কিন্তু এই এতটুকু, আমি তো পাতিহাঁস নই, আমি রাজহাঁস; এটা কিন্তু সহজে মনে রাখা যায় না। আমি রাজহাঁস, পরমহংস; আমি, আপনি সবাই। যখনই আমরা সীমারেখা লঙ্ঘন করতে যাচ্ছি, তখন নিজেকে মনে করানো –আমি পাতিহাঁস নই, আমি রাজহাঁস। এটা যে শুধু ঠাকুরের জন্য তা না, যে কোন সাধক, যিনি ঈশ্বরের পথ বেছে নিয়েছেন, তাঁর এই কথাটা মনে রাখা দরকার –আমি পাতিহাঁস নই, আমি রাজহাঁস; আমি সাধারণ কোন লোক নই, আমি রাজার ব্যাটা। রাজা একমাত্র ভগবান, আমি তাঁর ব্যাটা। এটা কোন সুপিরিয়রিটি ইনফিরিওরিটির ব্যাপার না, অত্যন্ত সহজ জিনিস। আমি স্বভাবে এ-রকম, তাহলে কেন আমি ওই রকম করব?

মুসলমানদের আক্রমণ যখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল তখন বিভিন্ন কারণে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিল। কিন্তু মুসলমানরা যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় উচ্চবর্ণ লোকেদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করল, তখন তাঁদের বেশির ভাগ রাজী হলেন না। গলা কেটে দেবে দিক, মরে যাবেন তবুও নিজের সনাতন ধর্ম ছাড়বেন না। আপনার ধর্ম রাজহাঁস, আপনি কেন পাতিহাঁস হতে যাবেন? সংসারে এত গোল, সেখান থেকে তীব্র বৈরাগ্য, নির্জনবাস চাই; এই সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে রয়েছে –আমি পাতিহাঁস নই, আমি রাজহাঁস। এটাকে সব সময় মনে রাখতে হবে, আর এটাকে দিয়ে মনকে সব সময় ধাক্কা মারতে হবে। প্রত্যেকটি অবস্থায় ধাক্কা মারতে হবে। যখনই মনে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এগুলো আসে, যখনই কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি আসক্তি আসে, যখন ভেঙে পড়ছেন, যখন শোকগ্রস্থ হচ্ছেন, যখনই মনে কোন চাহিদা উঠছে, সব অবস্থায় ওই একই কথা –আমি রাজহাঁস, আমি রাজার ব্যাটা। এগুলো এমনি এমনি হয় না, নির্জনে থেকে এই বিশ্বাস আনতে হয় যে, আমি রাজহাঁস; একান্ত না হলে এই বিশ্বাস আসবে না। সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার করা আমার শোভা পায় না। আমেরিকা থাকার সময় স্বামীজী সব সময় রাজার মত হাঁটাচলা করতেন। ঠাকুর আবার ছটফট করে হাঁটতেন, এটাই ঠাকুরের হাঁটার স্টাইল ছিল।

কিছুদিন নির্জনে থাকতে হয়। বুড়ী ছুঁয়ে ফেললে আর ভয় নাই। সোনা হলে তারপরে যেখানেই থাক। নির্জনে থেকে যদি ভক্তিলাভ হয়, যদি ভগবানলাভ হয়, তাহলে সংসারেও থাকা যায়। (রাখালের বাপের প্রতি) তাই তো ছোকরাদের থাকতে বলি। কেননা, এখানে দিন কতক থাকলে ভগবানে ভক্তি হবে। তখন বেশ সংসারে গিয়ে থাকতে পারবে।

আপনার যদি কোন আশ্রমে ঘুরতে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে, প্রথম চেষ্টা করবেন একা যাওয়ার। দ্বিতীয় চেষ্টা হবে, যত কম লোকের সাথে সম্পর্ক করা। জপধ্যান আমাদের দ্বারা খুব বেশি হয় না, সম্ভব না। ঠাকুরের সান্নিধ্য পাওয়াটা সম্ভব। কিভাবে? যতটা সম্ভব মন্দিরে গিয়ে বসে থাকুন। বাড়িতে

ঠাকুরের ছবির সামনে বসে থাকুন, আর ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকুন। আমাদের সাধনাই হল সান্নিধ্য। আমাদের যা সাধনা করা দরকার ঠাকুরে করে দিয়ে গেছেন; মা, স্বামীজী করে দিয়ে গেছেন। ব্যাকুলতা আমাদের সাধনা না, আমাদের সাধনা সান্নিধ্য।

একজন ভক্ত –ঈশ্বরই যদি সব করছেন, তবে ভালমন্দ, পাপ-পূণ্য-এ-সব বলে কেন? পাপও তাহলে তাঁর ইচ্ছা?

রাখালের বাপের শ্বশুর –তাঁর ইচ্ছা আমরা কি করে বুঝব?

অনেকবার আমরা এই টপিকটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, পরেও আবার আলোচনায় আসবে। এখানে কয়েকটা জিনিস আমাদের ভাল করে বুঝে নিতে হবে। একটা হল কার্য, আর-একটা হল নিয়তি, নিয়তি শব্দ আমরা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি। বিদেশী ধর্মগুলিতে বলে, আগে থেকে সব ঠিক করা আছে; মুসলমানরা যেমন বলে কিসমৎ, ইংরাজীতে pre-destination। কিসমৎ মানে, সব ঠিক করা আছে। কিন্তু আমরা যখন ভাগ্য বলি, আমরা যখন দৈব বলি, সেখানে আমাদের অর্থ কিন্তু পুরো আলাদা। আমাদের হিন্দুদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা কোন শাস্ত্রই মন দিয়ে পড়ি না। বেদ না হয় কঠিন জিনিস, কিন্তু একটা উপনিষদ আমরা ভাল করে পড়ি না, গীতা ভাল করে পড়ি না, শ্রীমদ্ভাগবত ভাল করে পড়ি না; এগুলোই হিন্দু ধর্মের মূল গ্রন্থ। এমনকি কথামৃতও ভাল করে পড়া নেই। সব কিছুই আমরা ভাসা ভাসা পড়ি। ফলে ধর্মের ব্যাপারে সব কিছু এলেমেলো হয়ে যায়; আর এলেমেলো এত বেশি হয়ে যায় যে, জীবনদর্শন সংশয়ের মধ্যে পড়ে যায়।

Pre-destiny বা কিসমৎ রূপে যদি দেখা হয়, সবই আগে থেকে ঠিক করা আছে, এটাই যদি ঠিক হয় তাহলে কি হবে? সবারই মুক্তি হবে, এ-ছাড়া আর কোন কিছু ঠিক করা নেই। যদি মনে করেন আগামীকাল কি হবে, ঠাকুর ঠিক করে রেখেছেন, এটাকে আমাদের একটা ভাবনা ছাড়া কিছুই বলা যাবে না। কারণ তিনি কি ঠিক করে রেখেছেন, কি ঠিক করে রাখেননি আমাদের জানা নেই। এই জিনিসগুলোকে নিয়ে ঠাকুর অনেকবার বলেছেন, আলোচনাও করা হয়েছে, আবার আসবে আবার আমরা আলোচনা করব। ঠাকুর কি ঠিক করে রেখেছেন আমাদের জানা নেই। কারণ আমরা যদি জেনে যাই, তাহলে তো আমরা ঠাকুরের মনকে জেনে গেলাম। আমরা যখন বলি, সবই ঠাকুরের ইচ্ছা, এখানে কয়েকটা জিনিস বোঝা দরকার, মনে রাখা দরকার। তাঁর ইচ্ছা যখনই বলি, ঈশ্বরের ইচ্ছা যখনই বলি; এই কথা বলার প্রথম অর্থ হল –এটা কেন হল আমার জানা নেই। বাকি জিনিসগুলো কি আপনি জানেন? অবশ্যই জানেন।

আমরা একটা কাল্পনিক বর্ণনা করছি। আপনি খেতে বসেছেন, খেতে বসাটা আপনার স্বাভাবিক, খিদে পেয়েছে খেতে হবে। ভাত, ডাল, তরকারি সব খেলেন, আপনার পেট ভরে গেল। কিন্তু হঠাৎ দেখলেন আপনার আবার খিদে পেয়ে গেছে। আমরা স্বাভাবিক বলব যে, কিছু একটা হয়েছে, হয়ত শরীর খারাপ হয়েছে। কিন্তু এমন কিছু যদি হয়, যেটার ব্যাখ্যা নেই; তখন আমরা বলব, কি জানি কেন এমন হল, ঠাকুরের ইচ্ছা তাই হয়েছে। এক জায়গায় ঠাকুর এর খুব সুন্দর ব্যখ্যা করেছেন। কাশী যাওয়ার সমস্ত রকম প্রস্তুতি হয়ে গেছে। হঠাৎ একটা চিঠি এলো যে অমুকের খুব শরীর খারাপ। কাশী যাওয়া পিছিয়ে দিতে হল। এ-রকম কেন হল? জানা নেই কেন হল। আমরা এটাকে দৈব বলতে পারি, তাঁর ইচ্ছা বলতে পারি, দুর্ভাগ্য বলতে পারি। কোন উত্তর যখন পাওয়া যায় না, তখন আমরা বলি – তাঁর ইচ্ছা।

আমি এক সময় আইআইএম ইন্দোরে যেতাম। একবার ওখানকার প্রফেসারদের নিয়ে আমাকে একটা ক্লাশ নিতে বলা হয়। প্রফেসারদের মধ্যে একজন মুসলিম অধ্যাপক ছিলেন। পড়াশোনা করা মুসলমানদের আমি দেখেছি, এনাদের নিজের ধর্মের উপর এবং অন্য ধর্মের উপর প্রচুর পড়াশোনা

থাকে, এখানকার মুসলমানদের মত নয়। উনি আমাকে সেখানে বললেন, 'এই যে কর্মবাদের কথা বলা হয়, আমি এই কর্মবাদ ঠিক মানতে চাই না'। তখন আমি উত্তরে তাঁকে বলেছিলাম –তাহলে জীবনে যা কিছু ঘটে, সেগুলোকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? কোন কারণ নেই হঠাৎ আপনার পা ভেঙে গেল, বা কিছু অঘটন ঘটে গেল। হয় আমাকে বলতে হয় এই জগৎটা একটা ক্যাওস্, এখানে যা কিছু ঘটছে তার কোন মাথামুণ্ড নেই। পদার্থবাদীরা এটাই বলেন। তখন জীবনটাকে কেমন অন্ধকার মনে হয়। জড়বাদীদের যে কোন দর্শন যদি নেওয়া হয়, তার মধ্যে বিজ্ঞানও আছে –জীবন কেমন যেন শূন্য হয়ে যায়। যা কিছু ঘটছে সব এলোপাতাড়ি ঘটছে।

দ্বিতীয় হল, সব কিছু ঈশ্বরের উপর চাপিয়ে দেওয়া। ঈশ্বরের নামে যদি চালিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে আমরা যতটুকু বুঝি তাতে পরিষ্কার মনে হয় ঈশ্বরের মধ্যে বৈষম্য দোষ এসে যাওয়া। তৃতীয়, পুরো জিনিসটাকে নিজের উপর নেওয়া। আপনারা ভক্ত, আপনাদের সব সময় মনে রাখা যে, সবটাই নিজের উপর নিতে হয়। কারণ একটু যখন নাড়াচাড়া করবেন তখন কারণ বেরিয়ে আসবে। কিন্তু বেশি যদি খুঁজতে যান, উত্তর আপনি পাবেন না; কারণ আসলে কোন উত্তর নেই। আর এরপর এই নিয়েই যদি মন সব সময় ঘুরতে থাকে, ও কেন এই রকম করল, আচ্ছা আগে তো কখন করেনি, আচ্ছা আগে তো এই রকম কি একটা যেন বলেছিল; এই সব উদ্ভট ভাবতে ভাবতে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। প্রথমতঃ, আপনার মনের শক্তি বাজে ভাবে খরচ হয়ে যাবে। তখন বলতে হয়, সব এলোপাতাড়ি, এমনিই সব চলে। দ্বিতীয়তঃ, আমার দুর্ভাগ্য, আমার দৈব এই রকমই ছিল, এটাই আমার কর্মে ছিল। তৃতীয়তঃ, তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছে। এই স্তরে গিয়ে কারা বলেন, তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছে? যাঁরা ঠিক ঠিক ভক্ত।

একজনের সঙ্গে দেখা হল, আমি বললাম, 'কি ব্যাপার হঠাৎ এখানে'? 'কাশী যাচ্ছি'। মজা করে বললাম, 'কাশীতে তো মানুষ মরার সময় যায়, এখনই যাচ্ছেন'? 'ঠাকুরই নিয়ে যাচ্ছেন'। যা শুনলে মেজাজ গরম হয়ে যায়, সেটাই আমাকে শুনতে হল। ঠাকুর কি আপনাকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছেন, যে ঠাকুর নিয়ে যাচ্ছেন? এই ধরণের কথা বলে একটা উচ্চ ভাবকে খেলো করে দেওয়া হয়। একটা আধ্যাত্মিক উচ্চ ভাব, যেটা আপনাকে উচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাবে, তা না, আপনি এটাকে খেলো করে পুরো জিনিসটাকে নষ্ট করে দিচ্ছেন। আপনার কাজকর্ম নেই, টাকা-পয়সা আছে, তাই একটা করে মনে আপনার বাই উঠছে আর আজকে কাশী যাচ্ছি, কাল কাশ্মীর যাচ্ছি, পরশু কাঠমাণ্ডু যাচ্ছি। কেন যাচ্ছি? ঠাকুর নিয়ে যাচ্ছেন। আশ্চর্য লাগে, ঠাকুর এত চঞ্চল হয়ে যাচ্ছেন কি করে?

উচ্চ জীবনদর্শন কোন জায়গাতে বুঝবেন কি করে? যে জায়গাতে দেখবেন আপনি উত্তর পাচ্ছেন না। কিন্তু আপনি দেখছেন আপনার মন এই সংসারে ঘুরঘুর করছে, আপনি যখন জানেন আপনার শরীর আছে, যখন আপনি জানেন সংসার আছে, আপনার ক্ষুধা, তৃষ্ণা আছে, যখন আমি-তুমি বোধ আছে, তখন এই ধরণের কথা বলতে নেই। তাতে কি হয়, জীবন খেলো হয়ে যায়। নিজের দোষ, নিজের চালাকি, এগুলো ঢাকা দেওয়ার জন্য এই জিনিসগুলো করা হয়। এর থেকে আস্তে আস্তে কি হয়? ঠাকুর বলবেন, মন যখন আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে শুরু করে, তখন বোঝা যায় না যে, কত নিচে চলে গেছে। সোজা বাংলায় বলতে গেলে বলা যায়, এগুলো ধাপ্পাবাজী। ধাপ্পাবাজী করতে করতে কোন একদিন আপনি দেখবেন একটা বিরাট বড় ধাপ্পাবাজ হয়ে গেছেন, আপনি বুঝতেও পারবেন না। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, ময়লা বইতে বইতে ময়লার প্রতি ঘেন্না চলে যায়। এই যে নিজেকে ঠকাচ্ছেন, অপরকে ঠকাচ্ছেন এতে আপনার এই অমূল্য জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর এবার ভক্তের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –পাপ-পূণ্য আছে, কিন্তু তিনি নিজে নির্লিপ্ত। এট যদি বুঝতে চান তাহলে আমাদের সমুদ্র আর সমুদ্রের ঢেউয়ের উপমাতে যেতে হবে। সমুদ্রে ঢেউ আছে, ঢেউ কখন উপরে যায়, কখন

নিচে যায়। কিন্তু সমুদ্রের দিক থেকে যদি বলেন, ঢেউ উঠলেও সমুদ্র থাকবে, ঢেউ না থাকলেও সমুদ্র থাকবে। ঢেউ উঠছে, ঢেউ নামছে কিন্তু সমুদ্র নির্লিপ্ত। ঠিক তেমনি ঈশ্বর নির্লিপ্ত। আমাদের শাস্ত্রে বারবার বলা হচ্ছে –তিনি নির্লিপ্ত। তিনি আমাদের ভালতেও নেই, আমাদের মন্দতেও নেই। ঠাকুর কেন আপনাকে দিয়ে কিছু করাতে যাবেন? ঠাকুর কাউকে কাশী, কাউকে কাশ্মীর নিয়ে যাবেন না; ঠাকুর কাউকে দিয়ে চুরি-জোচ্চুরিও করাবেন না। আমাদের হিন্দু ধর্মে এটাই ঠাকুরের স্বরূপ। যাঁরা অন্যথা বলেন, তাঁরা হিন্দু শাস্ত্র পড়েননি; না পড়ে নিজের মনের কথা শাস্ত্রের নামে চালিয়ে যাচ্ছেন।

বায়ুতে সুগন্ধ দুর্গন্ধ সবরকমই থাকে, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত। এই যে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলছেন, পাপ-পূণ্য সংসারের ধর্ম। তার থেকেও বড়, কিসের পাপ, কিসের পূণ্য; কিসের ভাল, কিসের মন্দ। সংস্কৃতে একটা কাহিনী আছে, ছোটবেলায় আপনারা অবশ্যই পড়ে থাকবেন। এক রাজার এক মন্ত্রী ছিল। কিছু হলেই মন্ত্রী সব সময় এই কথা বলত –ঈশ্বরের ইচ্ছাতে ভালই হল। একদিন কিভাবে রাজার হাত কেটে গিয়েছিল। মন্ত্রী দেখে বলল, তাঁর ইচ্ছাতে ভালই হয়েছে। এরপর মন্ত্রীর ছেলে মারা গেল, মন্ত্রী তখনও বলছে, তাঁর ইচ্ছাতে ভালই হল। মন্ত্রী আসলে একজন সত্যিকারের ভক্ত, সে মনে করছে যা হওয়ার হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এরপর রাজা আর মন্ত্রী দুজনেই একটা ডাকাতের খপ্পরে পড়ল। ডাকাত ওদের বলি দেবে বলে নিয়ে এসেছে। বলি দিতে গিয়ে দেখা গেল রাজার হাতটা কাটা, একে তো বলি দেওয়া যাবে না। আর মন্ত্রীর ছেলে মারা যাওয়াতে অশৌচ হয়েছে, তাকেও বলি দেওয়া যাবে না। ডাকাতরা আবার তাদের দুজনকে জঙ্গলে ছেড়ে দিল। এগুলো কাহিনী, কাহিনী দিয়ে দর্শনকে কখন প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। কিন্তু একটা জিনিসকে সুন্দর করে বোঝান যায়।

আজকে আপনার যেটাকে মন্দ বলে মনে হচ্ছে, আগামীকাল দেখবেন ওটাই আপনার জন্য একটা বড় মঙ্গলের কারণ হয়ে গেছে। আজকে আপনার মনে হচ্ছে আপনি সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ, আগামীকাল দেখবেন যে জায়গাতে আপনি ব্যর্থ হয়েছিলেন মনে হচ্ছে, ওই জায়গাটাই আপনার জন্য এমন একটা শক্তি হয়ে দাঁড়াল যে, আপনার আশেপাশে কেউ দাঁড়াতে পারছে না। ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্য, শুভ-অশুভ; এগুলোকে আপনার মন তৈরী করে। একটা দু-তিন বছরের বাচ্চা জানে না সত্য কি, মন্দ কি, পাপ কি, পূণ্য কি; আমরা ওদের শিখিয়ে শিখিয়ে এগুলোকে ওদের মাথায় বসিয়ে দিই; ধীরে ধীরে ওরা এগুলোতেই ট্রেইনড্ হয়ে যায়। ঈশ্বরের মধ্যে ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্য, ধর্ম-অধর্ম কিছুই নেই। এই জিনিসগুলোকে বুঝতে হয়।

তাঁর সৃষ্টিই এইরকম; ভালমন্দ, সদসৎ; যেমন গাছের মধ্যে কোনটা আমগাছ, কোনটা কাঁঠালগাছ, কোনটা আমড়াগাছ। দেখ না দুষ্ট লোকেরও প্রয়োজন আছে। ঠাকুর এটা অন্য ভাবে বলছেন। **যে-তালুকের প্রজারা দুর্দান্ত, সে-তালুকে একটা দুষ্ট লোককে পাঠাতে হয়, তবে তালুকের শাসন হয়**।

সংসারেও যদি দেখেন কোন জায়গায় খুব বাজে অনৈতিক কাজ হচ্ছে, ওখানকার লোকগুলো দুর্দান্ত এবং খুব বদমাইশি। তখন সেখানে পুলিশের এমন একজন বড় অফিসারকে পাঠানো হয়, যিনি নিজেও দুর্দান্ত। সৃষ্টির খেলা এভাবেই চলে, জীবন-মৃত্যুর খেলা এইরকমই। করোনা ভাইরাস এসেছে, করোনা একদিকে লোক মেরে যাচ্ছে; অন্য দিকে ওর ভ্যাকসিনও বেরিয়ে যাচ্ছে। সবটাই সৃষ্টির খেলা। স্বামীজী এটাকে খুব সুন্দর বলছেন –এই জগৎটা একটা খেলা; এখানে ঈশ্বরও খেলা করছেন, আমরা তাঁর সঙ্গী। এই বোধটাকে জাগিয়ে রাখা –এই খেলাতে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গী, আমরা ঈশ্বরের চাকর নই, ঈশ্বরের গোলাম আমরা নই।

আবার গৃহস্থাশ্রমের কথা পড়িল। ঠাকুর এবার খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলছেন। আসলে যাঁরা ঠাকুরের কাছে এসেছেন, তাঁদের মনে যেমনটি সমস্যা তেমনটিই তো তিনি বলবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) –কি জানো, সংসার করলে মনের বাজে খরচ হয়ে পড়ে। আমাদের মনটাই সব কিনা। আপনার যাই টাকা-পয়সা থাকুক, আপনার যে সম্বলই থাকুক, শেষমেশ আপনার সমস্ত শক্তি হল আপনার মন। যার মনে শক্তি আছে সেই রাজা, যার মনে শক্তি নেই সে কাঙাল। মনের শক্তি কিভাবে হয়? মন যত শান্ত থাকবে, মনে তত শক্তি আসবে। মন যত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে, মনের শক্তি তার তত কম আসবে। ম্যাগনিফাই কাঁচের দ্বারা সূর্যের আলোকে যদি এক জায়গায় কেন্দ্রিত করা হয় তখন সে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা পেয়ে যায়। সেই সূর্যের আলোই যখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তখন সেই আলো দিয়ে কিছুই পুড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এক সময় আমি আইআইটি খড়্গপুরে প্রত্যেক সপ্তাহে ক্লাশ নিতে যেতাম। আইআইএম ইন্দোরে বছরে পনেরো ষোল দিন করে ক্লাশ নিয়েছি। আবার সাধারণ জায়গাতেও অনেক ক্লাশ নিয়েছি। সাধারণ গ্রামের লোকেদের সঙ্গেও ছিলাম, আর যাঁরা খুব উচ্চমানের শিক্ষাবিদ তাঁদের সঙ্গেও অনেকদিন কাটিয়েছি। শিক্ষিত অশিক্ষিতে যে স্কেল এখনও আমি সেভাবেই আছি। এখন আমি ইউনিভার্সিটিতে আছি, এখানে যে মহারাজরা আছেন এনারা কত উচ্চমানের কল্পনাই করা যায় না, বুদ্ধি এনাদের শুধু তীক্ষ্ণই না, সুতীক্ষ্ণ; এত সুতীক্ষ্ণ যে লেজারের মত কচকচ করে সব কথাকে কেটে দেবেন। সাধারণ আর অসাধারণের মধ্যে কোথায় তফাৎ? যাঁরা শ্রেষ্ঠ পুরুষ, যাঁরা অসাধারণ, তাঁদের মন কেন্দ্রিত; যাঁরা সাধারণ তাঁদের মন বিকেন্দ্রিত। এটাকেই ঠাকুর বলছেন –মনের বাজে খরচ।

কত রকম ভাবে যে মনের আমরা বাজে খরচ করি বলে শেষ করা যাবে না। একটা সাধারণ জিনিসকে নিয়ে আমরা কত সময় ব্যয় করি। আমার ব্রহ্মচারী অবস্থার সব কিছুই আমার মনে বসে আছে। কম বয়সে শক্তি বেশি থাকে। সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে গেছি, বাইরের ঝুটঝামেলা নেই ফলে মনের শক্তি বেড়ে গেছে। তার মানে চাঞ্চল্য বেড়ে গেছে। ফলে কি হত, মন একবার যখন আলতুফালতু জিনিসে লেগে যেত, ব্যস্ ওটা নিয়ে চলছে তো চলছেই। আমাদের একজন মহারাজ আছেন, প্রত্যেক রবিবার মন্দিরে সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এক আসনে বসে জপ করতে থাকেন। বয়সে আমার থেকে ছোট, কিন্তু খুব গভীর ভালবাসার সম্পর্ক। ওনাকে একদিন মজা করে বলছিলাম '–আরে, আপনি তো মহারাজ একজন বিরাট তপস্বী'। উনি আমাকে খুব সুন্দর একটা কথা বললেন, 'দেখুন মহারাজ, মন তো কিছু না কিছু নিয়ে থাকবে, আমিও কোন না কোন ভাবে থাকব, হয় বসে থাকব নয় শুয়ে থাকব। ঠাকুরঘরে ঠাকুরকে নিয়ে বসে আছি, এতে আমি এমন কি তপস্বী হয়ে গেলাম! কিসের তপস্বী'!

মহারাজের উত্তরটা খুব সুন্দর। মন যখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়, ঠাকুর বলছেন মনের ক্ষতি হয়। মন তখন স্থূল হয়ে যায়। একটা জিনিসকে যে চটপট বুঝে নেবেন, এই ক্ষমতা চলে যায়। তার সাথে একটা জিনিসকে বুঝে নিয়ে সেটাকে যে মনে ধরে রাখবেন, গভীর ভাবে মনে রাখবেন; এই ক্ষমতা চলে যায়। সকালে ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই জিজ্ঞেস করা চাই, হ্যাঁ গো আজ কি রান্না হবে? এই খাওয়া-দাওয়া নিয়েই মন কত দিকে ছড়িয়ে যায় –আজ ভাতটা নরম হয়েছে, আজ ভাতটা চাল-চাল লাগছে, তরকারীতে নুন কম হয়েছে, মাছের ঝোলটা আরও ফুটতে হত, মাংসটা সেদ্ধ হয়নি –কত মনের বাজে খরচ। খাওয়ার সময় জপ করুন, এক-আধটা কথাও বলবেন না। আমাদের হিন্দু পরম্পরায় খাওয়ার সময় কথা বলা নিষেধ। কথা বলে যাওয়াটা একটা ব্যাধির পর্যায়ে নিয়ে গেছি আমরা। বাচ্চাদের মত কথা বলেই যাচ্ছি। খবরকাগজ অবশ্যই পড়বেন, দুনিয়াকে আপনার জানতে হবে, আশেপাশের খবর রাখতে হবে। কিন্তু সেগুলোকে নিয়ে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের যে, আমরা ওটাই করি।

ক্ষুদ্র মন যাদের, তারা মানুষকে নিয়ে আলোচনা করে। এটাকেই আমরা বলি পরনিন্দা-পরচর্চা। যারা মাঝারি মনের, তারা কোন ঘটনাকে নিয়ে আলোচনা করে। শ্রেষ্ঠ মনের অধিকারী যাঁরা তাঁরা আদর্শকে নিয়ে আলোচনা করেন। আমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে পাঁচ মিনিট পর আমি বুঝতে

পারি না আমি কি কথা বলব। মনের এই বাজে খরচ হতে হতে কি হয়, যে মন পুরো সলিড এক বস্তু, তাতে চিড় ধরে যায়। মনের উপর যদি চিড় এসে যায় তাতে কি হয়, চিড় ধরা মনকে একাগ্র করা খুব কঠিন, একাগ্র করা যায়ই না। আপনাদের বাড়ির লোকেদের যদি বলেন, স্বামী সমর্পণানন্দ মহারাজ কথামৃতের ক্লাশ নিচ্ছেন, চল একটু শুনবে। শুনবে না। কেন? এই নয় যে তাঁদের শাস্ত্রের কথা শোনার রুচি নেই, খুব রুচি আছে। খোল-করতাল নিয়ে কীর্তন যদি করি, অবশ্যই তাঁরা শুনতে আসবেন। আপনারা দেখুন, খোল-করতাল নিয়ে কীর্তনে কত লোকের সমাগম হয়; আর যদি নাচ হয়, তাহলে আরও বেশি লোক আসবে শুনতে। কারণ এরা এদের মনকে একাগ্র করতে পারছে না।

আর কি হয়? নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। মনুস্মৃতিতে মনু এদের নিয়ে খুব সুন্দর বলছেন –হস্তচপল, বাকচপল, পদচপল। এদের সব ইন্দ্রিয়গুলি চঞ্চল থাকে। হাত নাড়ছে, পা দোলাচ্ছে, চোখ নাচছে; কেন? নিজের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। একেই তো প্রথমে মনকে একাগ্র করার শক্তি চলে গেছে। দ্বিতীয় হল –নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা, সেই ক্ষমতাও চলে যায়। মনের শক্তি ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি চলে গেলে কি হয়? তখন এমন এমন সব কাজকর্ম করি যে, যার ফলে মনের মধ্যে অত্যন্ত অশুভ সংস্কার তৈরী হয়। অশুভ কর্মের কিছু ফল আপনি সঙ্গে সঙ্গে পাবেন, কিছু ফল কয়েক বছর পর পাবেন। সব থেকে খারাপ হল, বৃদ্ধাবস্থা আপনার অত্যন্ত বাজে ভাবে কাটবে। কেন এ-রকম হবে? মনের বাজে খরচ করে করে আপনার মধ্যে অশুভ সংস্কার অনেক আগেই তৈরী হয়ে আছে, আজ বৃদ্ধাবস্থায় এসে আপনি এখন হা-হুতাশ করছেন, আপনিই এই অবস্থার জন্য দায়ী। অশুভ সংস্কার তৈরী হওয়া মানে, আপনার মনের ভিতর যে সংস্কারগুলো আছে, সেই সংস্কারগুলো আপনার মনকে এমন ভাবে এমন এমন অশুভ কাজের দিকে নিয়ে যাবে, আপনার মনে অশান্তি সৃষ্টি করে দেবে। আপনার জীবনের একটাই মূলধন –সময় আর মনের শান্তি।

এছাড়া আর-একটা যেটা হয়, তা হল –তামসিক ভাব প্রচণ্ড বেড়ে যায়। তামসিক ভাব –নিদ্রা, আলস্য; যে কাজে মন লাগানো দরকার সেই কাজে আলস্য। তার থেকে বেশি হল –হিংসাভাব বড্ড বেশি বেড়ে যায়। আপনি বলবেন, মহারাজ, ঠাকুরের অশেষ কৃপায় আমার কিন্তু হিংসা ভাব নেই। তমোগুণ বাড়লে হিংসাভাব আসবেই। হিংসা অনেক রকমের হয়। বাণীর হিংসা হয় –যখন আপনি মিথ্যা কথা বলেন, কথাকে চাপা দেন, কটূ কথা বলে অপরকে কষ্ট দেন; এগুলোই বাণীর হিংসা। চিন্তা-ভাবনার হিংসা হয়, মনে মনে আপনি দশটা অশুভ জিনিসকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছেন। শুধু কোন প্রানীকে হত্যা করলে হিংসা হয় না। হিংসা মনের বিভিন্ন যে ক্রিয়া হয়, সেই ক্রিয়া দিয়ে হিংসা হয়। সহজ ভাষায় বলা যায়, আমাদের ভিতরে যে রাগ আর দ্বেষ, রাগ মানে অনুরাগ, কোন জিনিসকে পাওয়ার ইচ্ছা। মনের বাজে খরচ হলে আমাদের ষড়রিপু কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রচণ্ড বেড়ে যাবে। একটু বিচার করে দেখুন, আপনার মধ্যে এগুলো কি আছে? যতগুলো দোষ বলা হচ্ছে, এই দোষগুলো হয় মনের বাজে খরচ হওয়ার ফলে। তাহলে কি নরকে আপনার সিট বুকিং হয়ে গেছে?

না, ঠাকুর তখন বলছেন –**এই বাজে খরচ হওয়ার দরুন মনের যা ক্ষতি হয়, –সে ক্ষতি আবার পূরণ হয়, যেদি কেউ সন্ন্যাস করে**। ওই ক্ষতি আবার সারিয়ে নেওয়া যায়। ক্ষতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পূরণ করা যায়; যদি কেউ সন্ন্যাস করে। সন্ন্যাস নিয়ে নিলে ক্ষতি পূরণ হয়ে যায়। **বাপ প্রথম জন্ম দেন, তারপরে দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নের সময়। আর-একবার জন্ম হয় সন্ন্যাসের সময়**।

ঠাকুর এটাকে বোঝানর জন্য দুটো খুব সহজ জিনিস নিয়ে আসছেন। কিন্তু শুধু দুটো জিনিসে হয় না, মনুস্মৃতি আদিতে ষোড়শ সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। আমার 'The Hindu Way' বই, বাংলায় 'হিন্দুধর্ম জীবন' সেখানে আরও সহজ করে আমরা দশটি সংস্কারের নাম নিয়ে এসেছি। সংস্কার মানে শুদ্ধিকরণ, সংস্কার হওয়া মানে এরপর থেকে আপনি একটা নূতন জন্ম পেলেন, এবার আপনি নূতন ভাবে জীবনযাপন করুন। উপনয়নে গায়ত্রী মন্ত্র দেওয়া হয়; গায়ন্ত্রী মন্ত্রে নূতন জন্ম হয়। কিন্তু

যাঁদের উপনয়ন হয় না বা উপনয়ন হয়নি, তাঁদের কেউ যদি গুরুর কাছে দীক্ষা নেন, সেটাও তাঁর নূতন জন্ম। উপনয়নে যা হয়, দীক্ষাতেও তাই হয়। উপনয়নে গায়ত্রী মন্ত্র দেওয়া হয়, আর দীক্ষা হলে গুরু তাঁদের পরম্পরা অনুসারে একটা ইষ্টমন্ত্র দিয়ে দেন। উপনয়ন হয়ে যাওয়ার পরেও কেউ দীক্ষা নিতে পারে, তখন দুটো মন্ত্রই জপ করতে হয়, গায়ত্রী মন্ত্রও জপ করতে হয়, দীক্ষা মন্ত্রও জপ করতে হয়। এগুলো সব হচ্ছে সংস্কার, আপনাকে শুদ্ধ করছে। এমনকি অন্তিমকৃত্য যেটা, শেষ সংস্কার, মৃত্যুর পর যে দাহসংস্কার হয় সেখানেও এই শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়াই চলে। সবটাই আপনাকে শুদ্ধ করছে।

তবে এর মধ্যে জীবদ্দশায় সবচেয়ে বেশি শুদ্ধি করে সন্ন্যাস। সন্ন্যাস দুই প্রকার –বহিঃসন্ন্যাস ও অন্তঃসন্ন্যাস। সন্ন্যাস মানে ত্যাগ তপস্যা। সন্ন্যাসের ত্যাগ মানে, সংসারের সব কিছুকে ত্যাগ করে দেওয়া। আর তপস্যা হল একটা জিনিসকে নিয়ে এগোতে থাকা। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, এই জিনিসটাকে নিয়ে এগোতে থাকা, এটাই তপস্যা। যদি কেউ অন্তঃসন্ন্যাস, অর্থাৎ ভিতরে সন্ন্যাস নেন, তিনিও একই জিনিস পালন করতে পারেন। আমি অনেককে জানি, যাঁদের সন্ন্যাস নেওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিভিন্ন কারণে সন্ন্যাস নিতে পারেননি, তাঁদেরকে আমাদের মহারাজরা বলেন, কোন সন্ন্যাসী যাঁকে তুমি শ্রদ্ধা কর, তাঁর পরিধাণের এক টুকরো গেরুয়া বস্ত্র পূজোর জন্য নিয়ে রেখে দেওয়া, এই ভাবকে মনে রাখা যে, এটা আমার আদর্শ। এতে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছেন না, গেরুয়া ধারণ করছেন না, কিন্তু আদর্শ রূপে পূজা করে যাচ্ছেন। তাঁকেও কিন্তু নিজের জীবনটাকে ত্যাগ তপস্যার উপর ঢেলে দিতে হবে। ত্যাগ তপস্যা এসে গেলে, মনের এই যে এতদিন বাজে খরচ হয়েছে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

পারদ যদি আপনারা দেখে থাকেন, পারদ হাত থেকে পড়ে গেলে পারদ হাজারটা টুকরো টুকরো হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে যায়। আমরা তখন স্কুলে পড়ি, একবার কিভাবে পারদ ভর্তি একটা ব্যারোমিটার কার হাত থেকে ফসকে আমাদের ল্যাবরটরির মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। পুরো ল্যাবরটরিতে পারদ ছড়িয়ে গেল। শিক্ষক খুব রেগে গিয়ে বললেন, সব পারদকে এক জায়গায় জড়ো কর। পুরো পারদটা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেছে, অথচ যখন সব কটা কাছে এসে গেল, পুরোটা এক হয়ে গেল। ব্যারোমিটারে যখন কাজ করে, সব পারদ এক হলে তখন কাজ করে। এই জিনিসটাকে বোঝাবার জন্য পারদ হল সবচেয়ে ভাল উপমা। তা নাহলে সরষের পুটলির উপমাও নেওয়া যায়। জিনিসটা একই, ছড়িয়ে যাওয়া। এই হল মূল জিনিস, সংসার করলে মনের বাজে খরচ হয়ে যায়। মন সংসার ল্যাবরটরিতে ছড়িয়ে গেলে মনের শক্তি নষ্ট হয়ে যানে, নষ্ট হয়ে যাওয়া শক্তিকে ফিরিয়ে আনার পথ –ত্যাগ তপস্যা। মানুষ যখন বিবাহ করে, সেখানেও ত্যাগ তপস্যা। কেন? আগে ছাড়া বাছুর ছিল, যেখানে খুশি চলে যেতে পারত; এখনা আর পারবে না, বিবাহ হয়ে গেছে। ঠাকুর একজনের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, স্ত্রী স্বামীকে বলছে, দিনের বেলায় যেখানে খুশি থাক, রাতে এখানে থাকতে হবে। বিবাহ ভোগের জন্য নয়, বিবাহ ত্যাগের প্রতীক।

কামিনী ও কাঞ্চন এই দুটি বিঘ্ন। মেয়েমানুষে আসক্তি ঈশ্বরের পথ থেকে বিমুখ করে দেয়। কিসে পতন হয়, পুরুষ জানতে পারে না। কতবার ঠাকুর এই জিনিসটার বর্ণনা করছেন। যৌন-ভাবনা, তা যে রূপেই হোক, টেনে নামিয়ে কোথায় নিয়ে চলে যাবে যে বুঝতেই দেবে না। একটা ঘটনা শুনেছিলাম। এক জায়গায় একটা হরিণকে আলাদা জায়গায় রাখা হয়েছিল। জায়গাটা সাত কি আট ফুট পাঁচিলে দিয়ে ঘেরা ছিল। হরিণের যখন মেটিং সিজন এসেছে তখন ওই হরিণটা ওই সাত ফুট পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল। হরিণটাকে সামলানো যাচ্ছিল না। হরমোনাল ডিসব্যালেন্স এমন হয়ে যায় যে, সামলানো যায় না। আর সেখান থেকে মন এমন আসক্ত হয়ে যায়, কিছু করার থাকে না, বুঝতেই পারে না যে সে কি করতে যাচ্ছে। ঠাকুরও বলছেন, কিসে পতন হয় বুঝতে পারে না।

যখন কেল্লায় যাচ্ছি, একটুও বুঝতে পারি নাই যে, গড়ানে রাস্থা দিয়ে যাচ্ছি। কেল্লার ভিতর গাড়ি পৌঁছালে দেখতে পেলুম, কত নিচে এসেছি। শঙ্করাচার্য এক জায়গায় বলছেন, একটা বল, আচার্য

বল না বলে কন্দুক বলছেন; সিঁড়ির উপরের ধাপে যদি পড়ে যায়, বলটা নিচের দিকে পড়তেই থাকবে। হিন্দিতে খুব সুন্দর একটা কথা বলা হয়, ডুবনেবালে কো গহরাই কা পাতা নহি রতা; ডুবন্ত মানুষ যখন ডুবে যেতে থাকে তখন সে বুঝতে পারে না কত গভীরে সে তলিয়ে যাচ্ছে, মনে করছে আমি বেশ আছি। তুমি শেষ হতে চলেছ, কিসের বেশ আছ?

আহা, পুরুষদের বুঝতে দেয় না। আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, ঠাকুর পুরুষদের নিয়ে বলছেন, মেয়েদের নিয়ে কেন বলছেন না? আপনারাও জানেন কেন বলছেন না। একটা সুন্দর ঘটনার কথা বলি, একবারই দেখেছি বলে ঘটনাটা আমি ভুলিনি কখন। একবার আমি জয়রামবাটী থেকে কোয়ালপাড়া গিয়েছিলাম। কোয়ালপাড়া আশ্রম থেকে একটু এগিয়ে বাসস্ট্যাণ্ড। দুপুরে প্রসাদ পাওয়ার পর বাসস্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়িয়েছি, জয়রামবাটী ফিরে যাব। কিছুক্ষণ পর একটা বাস এসে দাঁড়ালো, দেখছি গ্রামের অনেক লোক বাসটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গেছে। কি ব্যাপার? জানা গেলে বাসটা কবে কোন সময় একটা মুরগীকে চাপা দিয়ে মেরে দিয়েছিল। বাসটাকে গ্রামের লোকরা মনে রেখেছে। অনেকক্ষণ তর্কাতর্কি হতে লাগল। ড্রাইভার গ্রামের লোকদের বলছে, 'এই আপনাকে বাসটা দিচ্ছি আর একটা মুরগীকে ছেড়ে দিন, এরপর আপনি মুরগীটাকে মেরে দেখান তো। বাস চালিয়ে একটা মুরগীকে আগে মেরে দেখান। মুরগী যদি নিজে না মরতে চায়, মুরগীকে মারা যাবে না'। ড্রাইভার সাহেব একশ ভাগ সত্যি কথা বলছেন। পাতিহাঁসকে যদি রাস্থায় চাপা দিয়ে মেরে ফেলেন, আপনার নামে কেস হয়ে যাবে। কারণ পাতিহাঁস কয়েকটা একসাথে মিলে ঢিমেতালে চলে, ওদের চাপা দিলে ওরা বাঁচবে না, ওরা মরবে। সেইজন্য গ্রাম দেশে হাঁস রাস্থা পারাপার করার সময় গাড়িকে রাস্থায় উপর থামিয়ে দিতে হয়। কিন্তু মুরগী না মরতে চাইলে মরবে না। পৃথিবীর কোন মেয়েমানুষকে কোন পুরুষ সহজে নষ্ট করতে পারবে না। মেয়েমানুষের বুদ্ধি অনেক পাকা হয়, অনেক কম বয়সেই মেয়েদের বুদ্ধি পেকে যায়। ওদেরকে বোকা বানানো সহজ না।

কাপ্তেন বলে, আমার স্ত্রী জ্ঞানী! ভূতে যাকে পায়, সে জানে না যে, ভূতে পেয়েছে! সে বলে, বেশ আছি! (সকলে নিস্তব্ধ) অত্যন্ত কঠিন কথা, মানুষকে স্তব্ধ করে দেয়। হিমাচলে একজন বয়স্ক মহিলা আমাকে বলেছিলেন, পুরুষোকোঁ বাঁধনা পড়তা হ্যায় জী। পুরুষ মানুষ বাছুরের মত ছুটে বেড়ায়, বেঁধে রাখতে হয়। কথাটা শুনে আমার গা শিউড়ে উঠেছিল। জেনেটিক্যালি মেয়েরা হল হোমম্যাকারস্, এনাদেরকে আশ্রয় করেই সংসার চলে। পুরুষরা কখন সংসার বসাতে পারে না।

ঠাকুর এখানে কোন সোসিওলজির ট্রেনিং দিচ্ছেন না। ঠাকুর আধ্যাত্মিক জিনিসগুলিকে নিয়ে বলছেন; মনের যাতে বাজে খরচ না হয়ে যায়; ঠাকুর সেটাকে নিয়ে আমাদের সাবধান করছেন। একজন পুরুষের যত শক্তি, যত টাকা-পয়সা, যত সম্পদ সব কিছু ওখানেই নিঃশেষ হয়ে যায়। কিসে একটা নারীকে সুখে রাখতে পারা যায়, কিসে তার ভাল করা যায়, কিসে তাকে আনন্দে ভরিয়ে রাখা যায়, পুরুষের সব সময় সেই চেষ্টা, সেই চিন্তা নিয়েই থাকে। দেওঘর বিদ্যাপীঠে আমি প্রিন্সিপাল ছিলাম, সংসার-জ্ঞান আমার নেহাতই কম কিন্তু তাতেই আমি ছেলেদের সংসারের জ্ঞান দিতাম। ওদেরকে বলতাম, 'দেখ, সমাজে যদি টিকে থাকতে চাও তাহলে কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় চা খাওয়ানো, আইসক্রীম খাওয়ানো, গিফট দেওয়া, এগুলোর জন্য কোন মেয়ের পিছনে একটি পয়সাও খরচ করবে না'। অনেক দিন পরে একটি ছেলে আমাকে বলেছিল, 'মহারাজ, আপনার বুদ্ধিটা প্রচুর কাজে লেগেছে'।

সংসারে শুধু যে কামের ভয়, তা নয়। একটু আগেই ষড়রিপুর কথা বলা হল, শুধু কাম না, সংসারে সবটাই এসে জুটে যায়, এখানে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য সবাইকে পাবেন। ঠাকুর এখানে যে শুধু কামিনী-কাঞ্চনকে নিয়ে বলছেন, তা না। আলোচনা হচ্ছে, মনের বাজে খরচ। **আবার ক্রোধ আছে। কামনার পথে কাঁটা পড়লেই ক্রোধ**। ক্রোধ কখন হয়? একটা হয় যখন আপনার

মন চঞ্চল হয়। একটা হয়, যখন আপনি মানসিক রোগগ্রস্থ, তখন কথায় কথায় ক্রোধ আসে। একটা সাধারণ কথা –আমরা যে লাইভ ক্লাশ নিই, আমাদের চ্যাট অনেক সময় খোলা থাকে। আমার একটা কামনা আছে ক্লাশগুলো আমি খুব নির্বিঘ্নে চালাব, আমার একটা কামনা আছে যে, যাঁরা শুনছেন তাঁদের জন্য আমি সহজ ভাবে জিনিসগুলিকে বোঝাতে সক্ষম হই। হঠাৎ চ্যাটে একটা বিরক্তিকর মন্তব্যে চোখ পড়ে গেল, তখন আমিও রেগে যাই। এই ক্রোধটা শিক্ষকের, এই ক্রোধ কাউকে ক্ষতি করা বা কাউকে ছোট করা উদ্দেশ্য না। কিন্তু ক্রোধ হবেই। কামনা আপনার যত শুভই হোক, বিঘ্ন হলে ক্রোধ আসবে। কিন্তু ক্রোধ তো করতে নেই, কারণ ক্রোধ হল তমোগুণের লক্ষণ।

মাস্টার –আমার পাতের কাছে বেড়াল নুলো বাড়িয়ে মাছ নিতে আসে, আমি কিছু বলতে পারি না। ছবিটা একটু দেখার চেষ্টা করুন –মাস্টারমশাই খাচ্ছেন। থালাতে মাছ আছে। বেড়াল সেই মাছের দিকে মুখ এগিয়ে দিচ্ছে। মাস্টারমশাই দেখছেন, কিন্তু বেড়ালকে কিছু বলতে পারছেন না, আর-একজন এসে বলছেন। কি হাসির কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ –কেন! একবার মারলেই বা, তাতে দোষ কি? দৈনন্দীন জীবন চালাবার জন্য এটা একটা অত্যন্ত দরকারী কথা। মাস্টারমশাইর মনে কোথাও একটা বৈষ্ণব ভাব ঢুকে আছে –জীবকে মারতে নেই। এক জায়গায় ভাগবতকথা পাঠ হত। শাশুড়ী শুনতে যায়, উদ্দেশ্য কানে দুটি ধর্মের কথা প্রবেশ করবে। শাশুড়ী একদিন কোন কারণে যেতে পারেনি, বৌমাকে পাঠিয়েছে ভাগবতকথা শুনতে। পরের দিন বাড়ির সবাই খেতে বসেছে, পরিবেশন করতে গিয়ে শাশুড়ী দেখছে মাছ নেই। 'বৌমা মাছ কোথায়'? 'বেড়ালে খেয়ে নিয়েছে মা'। 'বেড়ালে কি করে খেয়ে নিল'? 'তা না মা, কাল ভাগবত শুনছিলাম, সেখানে বলছিল জীবের হিংসা করতে নেই, তাই বেড়াল যখন হেঁসেলে ঢুকল আমি আর তাকে তাড়িয়ে দিতে পারলাম না'। শাশুড়ী তখন বলছে, 'ওমা বলো কি! আমি এতদিন ভাগবত শুনছি, আজ পর্যন্ত ভাগবতকে আমি ঘরে আনলুম না, আর তুমি একদিন গিয়েই ভাগবতকে ঘরে ঢুকিয়ে দিলে'? ধর্মকে আমরা ইমোশানালি বুঝলে, তখন এই সর্বনাশটি হয়। এখান থেকে ধর্মান্ধতার উৎপত্তি হয়। আজকে ধর্মের নাম করে কত জায়গায় মারো, কাটো, লুটো হচ্ছে, এটাই হল ধর্মের ব্যাপারে খেলো আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং। ধর্মটা যখন উপর উপর হয় তখন এই সমস্যা হয়।

মাস্টারমশাই অবশ্যই এ-রকম করেননি, তা তো তিনি বলছেন না। এই ভাব অল্প-বিস্তর সবার মধ্যেই থাকে –আহা ঠাকুর কত সুন্দর বলছেন, কামিনী-কাঞ্চন এইসব থেকে সরে আসতে হয়। সেখানে একটু প্রশংসা পাওয়া, হ্যাঁ, আমারও ওদিকে মন যায় না। আমাদেরও যখন কম বয়স ছিল, কোথাও কিছু ভাল বললেই, আমরাও বলতাম, আমারও না এই ভাব। যখন কোন গুণ রূপ নিয়ে বলছেন, তখন দেখানো যে আমারও ও-রকম আছে। বেড়াল পাত থেকে মাছ নিতে আসছে, আপনি মারবেন না? তাহলে সংসারে আছেন কেন? সংসারী ফোঁস করবে, বিষ ঢালবে না। হিন্দু ধর্মে বিষ ঢালার প্রথা নেই। ক্ষত্রিয়দের রাখা হয়েছিল ধর্মকে রক্ষা করার জন্য। তারাও কিন্তু বিষ ঢালত না, যুদ্ধ হয়ে গেল, যে হেরে গেল তাকে গিফটস দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হত।

বিষ ঢালা উচিৎ নয়। কাজে কারু অনিষ্ঠ যেন না করে। প্রথমে পাপ-পূণ্য ভাল-মন্দ দিয়ে শুরু হয়েছিল। আমরা এই সংসারে আছি, সংসারে আপনি একটা ফোকাস করে নিয়েছেন যে, আমাকে এদিকে যেতে হবে, আমাকে জীবনে এগোতে হবে। তা আপনি বিজ্ঞানেই যান, চিকিৎসা বিজ্ঞানেই যান, যেখানেই যান কিংবা ধর্মসাধনেই যান, সেখানে যদি বিঘ্ন হয়, সাপ-বিছের যদি ভয় থাকে আপনাকে নিজেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নিতে হবে। গীতাতে আসন কি রকম হবে বলতে গিয়ে বলছেন – *নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্*। আবার বলছেন, বেশি খাবে না, কম খাবে না, বেশি ঘুমোবে না, কম ঘুমোবে না; কারণ এগুলো বিঘ্ন। ঠিক তেমনি সাপ, বিছে, মশা এগুলো সব বিঘ্ন, এগুলোকে থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয়। মশা মাছির উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য দরকার হলে সাবধাণতা

অবলম্বন করুন বা দু-চারটেকে মেরে দিন। ঠাকুর বলছেন –**কিন্তু শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ক্রোধের আকার দেখাতে হয়। না হলে শত্রুরা এসে অনিষ্ট করবে। ত্যাগীর ফোঁসের দরকার নেই**।

এখানেই হিন্দুদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। এই যে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ধর্ম হিন্দুদের আক্রমণ করছে, সেখানে ক্রোধ করা তো দূরের কথা ক্রোধের আকার পর্যন্ত নেই। যারা আপনার শত্রু, আপনার ব্যক্তিগত শত্রু, আপনার পরিবারের শত্রু, আপনার সমাজের শত্রু, আপনার ধর্মের শত্রু, এদের ক্রোধের আকার দেখাতে হয়। হিন্দুরা সহনশীল, হিন্দুরা সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে, হিন্দুদের আদর্শ –*বসুধৈব কুটুম্বকম্*। একটা মজার ঘটনা বলি। এক সময় আমি ছাপড়ায় ছিলাম। ছাপড়া আশ্রম তখন সবে রামকৃষ্ণ মিশন অধিগ্রহণ করেছে। আশ্রমে তখন ঠিক ভাবে বাউণ্ডারি পর্যন্ত নেই। আশেপাশের সব লোকেরা আশ্রমের মাঠে এসে বাহ্য করত। আশ্রমের মাঠ পুরোটাই হল ওখানকার লোকেদের বাহ্য করার মাঠ। আর যেখানটা একটু পরিষ্কার, সেখানে স্থানীয় লোকেরা নিজেদের গাড়ি পার্কিং করত। আশ্রমের দায়ীত্ব নেওয়ার পর আমি গিয়ে প্রথমেই এগুলো সবে বন্ধ করতে শুরু করেছি। লোকজনরা এসে আমাকে বোঝাতে লাগল, 'আরে! কি করছেন আপনি, রামকৃষ্ণ মিশন সমাজসেবার জন্য। আমরা যে এখানে গাড়ি পার্কিং করি, এই গাড়ি নিয়ে আমরা অমুক কাজ করতে যাই, সরকারি কাজ করতে যাই; সমাজসেবায় আপনি সাহায্য করবেন না'? আমিও তখন বললাম, 'আমরা সমাজসেবা করব আমাদের মত, আগে গাড়িগুলো বার করে নিন'। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা শুরু করলাম। পুলিশের সাহায্য নিতে হয়েছিল, কিন্তু করে দিয়েছি। এগুলো হল বদমাইস যারা, দু-নম্বরী যারা, নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য আপনাকে বলবে, নাহলে শত্রুরা এসে অনিষ্ট করবে। ত্যাগী পুরুষের দরকার নেই, যাঁরা ত্যাগী পুরুষ তাঁরা ফোঁস করবেন না। আমরা কেন ফোঁস করব, আপনারা যাঁরা সমাজে আছেন এটা আপনাদের কাজ। হিন্দু ধর্মের রক্ষার দায়ীত্ব আপনার, হিন্দু ধর্মের যারা ক্ষতি করতে আসছে, সন্ন্যাসীদের যারা ক্ষতি করতে আসছে, এটাকে আটকানো আপনাদের কাজ। অনেকগুলো কাজের মধ্যে এটাও একটা দায়ীত্ব আপনাদের।

একজন ভক্ত –মহাশয়, সংসারে তাঁকে পাওয়া বড়ই কঠিন দেখছি। কটা লোক ওরকম হতে পারে? কই! দেখতে তো পাই না।

শ্রীরামকৃষ্ণ –কেন হবে না? ও-দেশে শুনেছি, একজন ডেপুটি, খুব লোক –প্রতাপ সিং; দান-ধ্যান, ঈশ্বরে ভক্তি, অনেক গুণ আছে। আমাকে লতে পাঠিয়েছিল। এইরকম লোক আছে বইকি।

ঠাকুর এই যে কথাগুলো বলছেন, এই নয় যে এগুলো থিয়োরেটিক্যাল, এগুলো বাস্তব। কি গুণের কথা বলছেন? তিনি ডেপুটি, আবার তাঁর দান আছে, ধ্যান আছে আবার ঈশ্বরে ভক্তি আছে। ধর্ম জগতে এনারা হলেন আদর্শ। পরের পরিচ্ছেদে ঠাকুর সাধনার কথা বলছেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সাধনার প্রয়োজন – গুরুবাক্যে বিশ্বাস – ব্যাসের বিশ্বাস

প্রসঙ্গ উঠেছিল 'উপায় কি', সবাই যেমন জিজ্ঞেস করে। ঠাকুর বলছিলেন, সংসারে অনেক গোল। ঠাকুরের কথা শুনে একজন ভক্ত বলছেন, সংসারে তাঁকে পাওয়া খুবই দেখছি; কটা লোক ওরকম হতে পারে। ঠাকুর প্রতাপ সিং নামে একজন ডেপুটির উদাহরণ দিলেন। একেবারেই যে নেই তা নয়, এইরকম লোক আছে বইকি। এইসব বলার পর ঠাকুর সাধনার প্রয়োজন কেন বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –সাধন বড় দরকার। তবে হবে না কেন? ঠিক বিশ্বাস যদি হয়, তাহলে আর বেশি খাটতে হয় না। গুরুবাক্যে বিশ্বাস।

যাঁরা মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছেন তাঁদের জন্য যেমন গুরুবাক্যে বিশ্বাস দরকার, তেমনি যাঁদের দীক্ষা হয়নি তাঁদের জন্যও গুরুবাক্যে বিশ্বাস দরকার। দীক্ষা নেওয়ার সময় গুরু যেমন ইষ্টমন্ত্র দেন, তেমনি আপনার ইষ্টের রূপ যেমনটি তেমনটি রূপ দেখিয়ে বলে দেন –এই তোমার ইষ্ট। তাছাড়া ধ্যানজপ কিভাবে করতে হবে, জীবনযাপন কিরকম হবে গুরু বলে দেন। কিন্তু তাও আমরা কেন এগোতে পারছি না? প্রায়ই আমাদের মনে সংশয় দানাবাঁধে আমি কি সত্যিই এগোচ্ছি, আমার কিছু হবে কিনা; এটা সত্যিকারের সমস্যা। অনেক সময় মনে হয় গুরুবাক্যে সত্যিই আমার বিশ্বাস আছে কিনা, আবার কখন নিশ্চিত ভাবে মনে করি অবশ্যই আছে। কিন্তু ভেবে দেখার আছে –আমাদের আসলে গুরুবাক্যে কি সত্যিকারের বিশ্বাস আছে? যদি ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয়ে থাকে যে, ঠাকুর আছেন, তিনিই সব করছেন; তাহল আমিত্ব ভাব আর কি কারুর থাকবে? ঠাকুর যেমন বলছেন, মাইরি বলছি আমার 'আমি' খুঁজে পাচ্ছি না। ঠাকুর প্রায়ই বলতেন –সবাই বলে রানী রাসমনী এই কালীবাড়ি করেছেন, কেউ বলে না তাঁর ইচ্ছাতে এই মন্দির হয়েছে। বলা সম্ভব না। গুরুবাক্যে ঠিক ঠিক যদি বিশ্বাস থাকে, এই আমিত্ব কখনই থাকবে না।

যাঁরা কথায় কথায় 'ঠাকুরের ইচ্ছা'র কথা বলেন, পরিষ্কার বোঝা যায় এগুলো তাঁদের ভিতরের অনুভূতিলব্ধ কথা না, সব মুখের কথা। ঠাকুর অনেক কিছু পছন্দ করতেন না, তার মধ্যে একটা হল এই মুখের কথা। ঠাকুর বলতেন, বাচ্চারা যেমন খুড়ি, জ্যেঠির কাছ থেকে শুনে বলে 'তোর ঈশ্বরের দিব্যি'; এগুলো সব মুখের কথা। মুখে যেটা বলবেন, সেটা যেন আপনার ব্যক্তিত্বে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত থাকে। আপনার শরীরটাও যেন সেটাতেই থাকে, আপনার মনও যেন সেটাতেই থাকে আর আপনার বাণীও যেন সেখানেই থাকে। আপনি যদি রেগে কাউকে বলেন, আমি তোমাকে শেষ করে দেব, তাহলে আপনি যেন সত্যিকারের মনে করেন আপনি তাকে শেষ করে দেবেন। সবচেয়ে বড় হল, আপনার শরীরে যেন সেই শক্তি ও ক্ষমতা থাকে যাতে আপনি কাউকে শেষ করে দিতে পারেন। তা নাহলে কাউকে এই ধরণের কথা বলবেন না; গুরুবাক্যে তখনই বিশ্বাস সম্ভব হয়। তার আগে ঠাকুর যেটা বলছেন, সাধন বড় দরকার, আর সাধন তখনই সম্ভব যখন মনকে বশ করা হয়েছে। মনকে বশে করা নিয়ে পরে ঠাকুর বলবেন, এখানে পুরো প্রসঙ্গটাই মনকে বশে করা নিয়ে। মনকে পুরো বশে আনার পর তখন যে কথাগুলো বের হয়, সেই কথাগুলো হল খাঁটি সোনা; তখন যে চিন্তা-ভাবনা আসে, একেবারে খাঁটি সোনা, তখন শরীরের গঠনটাও খাঁটি সোনা হয়ে যাবে। ঠাকুর এখন পরপর এটাকে নিয়েই বলবেন।

ঠাকুর বলছেন, ঠিক বিশ্বাস যদি হয়, তাহলে আর বেশি খাটতে হয় না। এই খাটনি জিনিসটাই সাধনা। আগে আমরা কয়েকবার এই বিশেষ উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করেছি। ক্রিস্টাল তৈরী করার সময় সলভেন্ট আইটেম লাগে। কিছু জিনিস জলে দিলে দ্রবিভূত হয়ে যাবে, কিছু জিনিস অন্য কোন দ্রবণে দ্রবিভূত হয়ে যাবে। আপনি প্রথম একটা ক্রিস্টাল দিলেন, যেটা অশুদ্ধ। তার কি হবে? ওর মধ্যে হারিয়ে যাবে। আপনি জলে যদি লবণ দেন, লবণ জলে গলে যাবে, লবণের অস্তিত্ব খুঁজেই পাওয়া যাবে না। আর-একটা ক্রিস্টাল দিলেন, এরপর আর-একটা দিলেন, হয়ে হয়ে জলে পুরো লবণ ভর্তি হয়ে যাবে। কিন্তু তাতেও ক্রিস্টাল তৈরী হবে না। এবার গরম করতে দেওয়া হল। গরম করার পর দেখা যাচ্ছে ওতে আপনি আরও কিছু দিতে পারছেন। দিতে দিতে একটা সময় পুরোটা সুপার স্যাচুরেটেডে অবস্থায় চলে আসে। তখন বাইরে থেকে একটা ক্রিস্টাল দিতে হয়, যেটা আপনি তৈরী করতে চাইছেন। এবার যেমন যেমন ঠাণ্ডা হবে এই ক্রিস্টালটা তত বড় হবে।

ঠাকুর যখন বলছেন, গুরুবাক্যে বিশ্বাস, গুরুবাক্য হল বাইরের সেই ক্রিস্টালটা। যদি ভিতরটা তৈরী থাকে, যেমন সুপার স্যাচুরেটেড সলিউশান, সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে যাবে। কি তৈরী হয়? বাইরে থেকে যে ক্রিস্টাল এসেছে, ঠিক সেটাই তৈরী হয়। আমি যতটা শুদ্ধ পবিত্র হব, ক্রিস্টাল যেটা তৈরী হবে সেটাও ততটাই স্বচ্ছ হবে। আমাদের ভাষায়, যদি খাঁটি সোনা হয়, ওখানে যেটা জমবে সেটাও

খাঁটি সোনা হবে। যখন আপনাকে বলছে, তত্ত্বমসি, তুমি সেই; আপনি যদি তৈরী থাকেন তাহলে আপনার ভিতরটা পুরো তত্ত্বমসি হয়ে যাবে। আপনি যদি তৈরী না থাকেন, তাতেও ওটা হারিয়ে যাবে না। এই যে বলা হল, সলভেন্টের মত, সলভেন্ট হল আমাদের মন। ওই মনে একটা একটা করে পড়ছে আর জমছে; দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, জন্মের পর জন্ম ওখানে একটা একটা করে পড়ছে। এখানেই দরকার মনকে তৈরী করা। কিসের জন্য তৈরী করা। মনকে বশে আনার জন্য। মনকে বশে আনা যা আর মনকে ওই ভাবে পুরোপুরি নিয়ে যাওয়া, একই জিনিস; দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কি ভাবে মনকে বশে আনা?

সংসারে প্রাথমিক স্তরে যত কর্ম আছে, সব কর্মগুলো পুরোদমে করতে করতে মনকে বশে আনা শুরু হয়। সংসারে আপনার যা যা দায়ীত্ব আছে সেগুলোকে আগে পুরোদমে পালন করে যেতে হবে। কর্ম করলে, দায়ীত্ব পালন করলে তমোগুণ কাটে। সংসারের কর্ম করার সাথে সাথে ধর্মকর্ম করা। ধর্মকর্মের মধ্যে সবচেয়ে বড় কর্ম হল পঞ্চ মহাযজ্ঞ। পঞ্চ মহাযজ্ঞের উপর আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। খুব সংক্ষেপে আবারও বলছি –পাঁচটি যজ্ঞ সবারই করতে হয়। ঠাকুরও কথামৃতে পঞ্চ ঋণের কথা বলেছেন, এই পঞ্চ ঋণ থেকে সবাইকে মুক্তি পেতে হয়। পঞ্চ ঋণও যা, পঞ্চ মহাযজ্ঞও তাই। প্রথম হল ব্রহ্মযজ্ঞ; জপধ্যান করা, শাস্ত্র অধ্যয়ন করা। দ্বিতীয় দেবযজ্ঞ –পূজা-অর্চনা করা, মন্দিরে যাওয়া। আপনি বলবেন, মাঝে মাঝে তো করছি; না, নিত্য করতে হয়। তৃতীয় পিতৃযজ্ঞ –আমাদের পূর্বপুরুষরা যাঁরা আছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞ। শ্রাদ্ধ করা, তর্পণ করা আর নিত্য পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে একটু খাবার নিবেদন করা, যেটা পরে পশুপাখিদের খাইয়ে দেওয়া। চতুর্থ মনুষ্যযজ্ঞ –মানুষের সেবা করা, গরীব-দুখী দেখলে তাদের একটু দান করা, অতিথির সেবা করা। পঞ্চম ভূতযজ্ঞ –সাধারণ পশুপাখিদের কিছু খাওয়ানো। সংসারের দায়ীত্ব পালন ও ধর্মকর্ম বা পঞ্চ মহাযজ্ঞ, যখন এই দুটো আপনি করতে শুরু করবেন, এবার আপনার মন তৈরী হতে শুরু করবে।

মনকে বশে আনা যে খুব কঠিন কাজ, তা নয়। আমরা মঠ-মিশনে দেখেছি, প্রথমের দিকে যাঁরা আসেন তাঁদের প্রচুর কাজকর্ম করতে হয়। কাজকর্ম করতে করতে একটা প্রস্তুতি হতে শুরু হয়। আমরা প্রথম প্রথম মনে করতাম, ঠাকুর তো কাজের উপর এত জোর দেননি, বেদান্তও এত কাজের উপর জোর দেননি, তাহলে এখানে এসে এত কাজ কেন করতে হচ্ছে ইত্যাদি। এগুলোকে নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক আলোচনাদিও হত। এখন বুঝতে পারছি কর্ম করাটা কেন অত্যন্ত প্রয়োজন। কাজ করলে এটাই হয়, মনের আবর্জনাগুলিকে কর্ম পরিষ্কার করে। যত চুটিয়ে কাজ করা হবে তত মাঠ তৈরী হবে। কিন্তু তার মধ্যে পঞ্চ মহাযজ্ঞ কিংবা তার মধ্যে কোন একটা যজ্ঞ পুরোদমে করতে হবে।

অনেক দিন ধরে অনেক কাজ করা হল, এরপর ধীরে ধীরে দ্বিতীয় ধাপে আসে নিষ্কাম কর্ম। আমি কাজ করছি কারণ এটা আমার দায়ীত্ব, এই কাজের ফলের প্রতি আমার কোন কামনা-বাসনা নেই। এর সাথে প্রচুর জপধ্যান করা। যতটুকু দায়ীত্ব নিতে হবে ততটুকু দায়ীত্ব নিষ্ঠা সহকারে পালন করতে হবে। সাথে সাথে এই দিকটা নজর রাখা, তা হল –সংসারের কোন কাজে একেবারেই জড়ানো যাবে না। সামাজিক মেলামেশার আর কোন দরকার নেই, যেটুকু মেলামেশা করার ছিল হয়ে গেছে, আর না। হাতজোড় করে বলে দেওয়া, আমি আর এগুলোতে যাই না। এইভাবে চলতে চলতে মনটাও ধীরে ধীরে গুটিয়ে আসে।

কাজকর্ম করে তমোগুণকে কাটিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে, তার সাথে পঞ্চ মহাযজ্ঞ করা হয়েছে, জপধ্যানের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আর নিষ্কাম কর্ম করা হল। এবার মন সত্ত্বগুণের স্তরে চলে এসেছে। সত্ত্বগুণ যত বৃদ্ধি পাবে শাস্ত্রবাক্য তত মাথায় বসবে। আপনি হয়ত অনেকদিন ধরে কথামৃত পড়ছেন, গীতা পড়ছেন কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। বুঝতে না পারারই কথা। কারণ মন তখন তমোগুণে বসে আছে। তমোগুণ থেকে আগে কাজ করে রজোগুণে আসতে হবে। তার সঙ্গে পঞ্চ

মহাযজ্ঞ করতে হবে, জপধ্যানও পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে পড়ে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে নিষ্কাম কর্মের দিকে মনকে নিয়ে যেতে হবে। নিষ্কাম কর্ম থেকে শেষে জপধ্যানের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া। তখন একটাই কাজ –জপধ্যান। সংসারের ভাল করা, জগতের উপকার করা, এগুলো আগেই হয়ে গেছে, এখন আর এর কোন দরকার নেই। এরপর আপনার মন তৈরী হয়ে গেল, কারণ মন এখন শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেছে। এবার কি হবে? গুরু যে কথা আপনাকে আগে বলে দিয়েছিলেন বা এখন যখন শাস্ত্র অধ্যয়ন করবেন, তখন কি হবে?

এই যে ঠাকুর বলছেন –ঠিক বিশ্বাস; তখন পুরো বিশ্বাস হবে। তাহলে এখন কেন বিশ্বাস হয় না? মন বসেনি। মনে বসেনি মানে? মন সত্ত্বগুণে আসেনি; মন হয় রজোগুণে আছে নয় তমোগুণে আছে। নিন্দা করার জন্য বলছি না, আমরাও এখন পর্যন্ত সেই স্তরে আসতে পারিনি, বেশির ভাগ সময় আমরা তমোগুণেই থাকি। আমরা নিজেকে অনেক কিছু মনে করতে পারি, কিন্তু আসলে আমরা তমোগুণে আছি। এই মনকে কাজ করে তমোগুণ থেকে রজোগুণে নিয়ে যেতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কাম কর্ম করা চালিয়ে যেতে হবে, নিষ্কাম কর্ম চিরদিনই থাকবে; যাঁরা সিদ্ধি পেয়ে যান তাঁরাও লোকসংগ্রহের জন্য, মানুষের মঙ্গলের জন্য নিষ্কাম কর্ম করেন। তখন ওই অবস্থায় ঠাকুরের কথায়, শাস্ত্রের কথায়, গুরুবাক্যে ঠিক ঠিক বিশ্বাস আসে।

গুরু কে? আমাদের যত শাস্ত্র আছে সবাই গুরু; বেদ গুরু, উপনিষদ গুরু, গীতা গুরু; যিনি মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন তিনি গুরু, ঠাকুর গুরু, শ্রীশ্রীমা গুরু, স্বামীজী গুরু; সবাই আমাদের গুরু; এনাদের কথা তখন বিশ্বাস হয়। এর আগে পর্যন্ত সংশয় থাকবে; হয় সংশয় থাকবে আর তা নাহলে আপনি অতি নম্র ভাবে বলবেন, বাঃ কি সুন্দর কথা শুনলাম। কিন্তু ভিতরে দাগ কাটবে না, দুদিন পর ভুলে যাবেন। ফলে কি হয়, জীবন পাল্টায় না। জীবন পাল্টানোর জন্য মনের চাঞ্চল্যতাকে আগে এইভাবে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

উদাহরণ দেওয়ার জন্য ঠাকুর ব্যাসদেবের একটা খুব সুন্দর ঘটনা উল্লেখ করছেন। আপনারা এই কাহিনী অনেকেই জেনে থাকবেন। ব্যাসদেব যমুনা পার হবেন, গোপীরা এসে উপস্থিত। কিন্তু খেয়া পারাপার করার কোন নৌকা নেই। ব্যাসদেব গোপীদের তখন বললেন, 'তোমাদের পার করে দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে আমাকে কিছু খেতে দাও, আমার খুব খিদে পেয়েছে। গোপীরা তখন ব্যাসদেবকে দুধ, ক্ষীর, নবনী অনেক কিছু খেতে দিয়েছেন। সব খাওয়ার পর ব্যাসদেব বলছেন, 'হে যমুনে, যদি আজ কিছু খেয়ে না থাকি, তোমার জল দুভাগ হয়ে যাবে, আর আমরা সবাই সেই পথ দিয়ে পার হয়ে যাব'। এগুলো আখ্যায়িকা, আখ্যায়িকার মাধ্যমে আমরা একটা তত্ত্বকে পাই। সঙ্গে সঙ্গে যমুনা দুভাগ হয়ে রাস্থা দিয়ে দিলেন। **গোপীরা অবাক্,; ভাবতে লাগল –উনি এইমাত্র এত খেলেন, আবার বলছেন, 'যদি আমি কিছু খেয়ে না থাকি'**?

এই দৃঢ় বিশ্বাস! আমি না, হৃদয় মধ্যে নারায়ণ –তিনি খেয়েছেন। এই জিনিসগুলোকে ধারণা করা খুব কঠিন। এগুলোকে কেমন একটা কাহিনীর মত মনে হয়। অনেক বছর আগের একটা ঘটনা, আজ থেকে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেকার ঘটনা, আগেও বলেছিলাম। পরিবেশ নিয়ে একটা লেখা আমি পড়েছিলাম। লেখাটা নিয়ে আমার কয়েকজন বন্ধু মহারাজদের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। লেখক যে ভাবে বলছেন, পড়ে মনে হচ্ছে পৃথিবী বোধ হয় আর থাকবে না।

আমার এক বন্ধু মহারাজ তখন বললেন, 'এই সৃষ্টি যদি ঈশ্বরের হয়, তাহলে মানুষের কি দম আছে যে সৃষ্টিকে নাশ করে দেবে? বাইরের লোকেরা এগুলোকে যেভাবেই নিক, আমরা তো আর সেভাবে নিতে পারিনা। এটা ঠিক যে সৃষ্টিটা পাল্টাবে, তখন অন্য প্রজাতি আসবে। তাহলে ভয় কার? ভয় প্রকৃতিকে নিয়ে না, ভয় আপনাকে নিয়ে। খবরে পড়ছিলাম যোশি মঠে বিরাট সমস্যা হচ্ছে, সেখানে ধস নামছে। কার কষ্ট হচ্ছে? মানুষেরই কষ্ট হচ্ছে। প্রকৃতির আর কি হবে, মাটি এখান থেকে সরে

ওখানে যাবে। যে বাড়িগুলো হয়েছিল, যে স্ট্রাকচার দাঁড়িয়েছিল, ওগুলো এবার আবর্জনা হয়ে যাবে। আবর্জনা সরিয়েই না বাড়ি করা হয়। একটা সুন্দর বাড়ি, আসলে তো ওটা একটা মাটির ঢিপি মাত্র। সেই মাটিকে ইট করা হয়েছে, সেই ইটকে সাজিয়ে বাড়ি হয়েছে। প্রকৃতির জিনিসকেই সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। সেই মাটি থেকে ইট তৈরী হয়ে আবার একটা বাড়ি দাঁড়িয়ে যাবে। মাঝখান থেকে ঝামেলা কার হল? মানুষেরই সব ঝামেলা হয়। পর্যাবরণ বিপন্ন, পরিবেশ বিপন্ন বলেই যাচ্ছে। প্রকৃতির কি আছে, এটা না হয়ে ওটা হবে; মাঝখান থেকে ঝামেলা হবে তোমার'।

সেদিন থেকে আমি এই প্রসঙ্গে আর কোন কথা বলি না। সত্যিই তো, ঠিক যদি বিশ্বাস হয়, এই সৃষ্টি তাঁর, তিনিই এই সৃষ্টি রচনা করেছেন; ঠিক যদি বিশ্বাস থাকে তিনি এটা করবেন, *মূকং করোতি বাচালম্ পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্*, তাহলে আর কিসের ভয়, কিসের দুশ্চিন্তা। যতটুকু আপনার দায়ীত্ববোধ আছে, আপনি করে দেবেন, করে দিয়ে ঠাকুরকে বলা, হে ঠাকুর আর যেন আমাকে দায়ীত্বে জড়াতে না হয়। অর্থটা হল আমিত্বটাকে যত কমান যায়।

শঙ্করাচার্য এদিকে ব্রহ্মজ্ঞানী; আবার প্রথম প্রথম ভেদবুদ্ধিও ছিল। ঠাকুর এবার শঙ্করাচার্যের কাহিনী বলছেন। এটাও একটা কাহিনী। শঙ্করাচার্য এত বড় জ্ঞানী, কাশীর রাস্তায় হঠাৎ দেখেন এক চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে আসছেন। শঙ্করাচার্য তখন গঙ্গাস্নান করে উঠে আসছেন। শঙ্করাচার্যের খুব নামকরা কথা –দূরম্ অপসর রে চণ্ডাল, চণ্ডাল তুমি দূরে সরে যাও। কাহিনীটা খুব লজিক্যাল। কারণ তিনি কেরলের লোক, কেরলে ছোঁয়াছুয়ির ব্যাপারগুলো খুব বেশি ছিল। তখন চণ্ডাল বলছে –'তুমিও আমাকে ছোঁও নাই, আমিও তোমায় ছুঁই নাই'। বিভিন্ন জায়গায় কাহিনীটা বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে। চণ্ডাল এক জায়গায় বলছে, আমি যদি জড় হয় আমি কি করে সরব, কারণ জড় সরতে পারে না। আমি যদি আত্মা হই, আত্মা তো সর্বব্যাপী, সরে কোথায় যাব? শঙ্করাচার্য সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, এ মানুষ চণ্ডাল হতেই পারে না, ইনি সাক্ষাৎ কাশী বিশ্বনাথ। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন – **তখন শঙ্করের জ্ঞান হয়ে গেল**।

আচার্য শঙ্কর একজন জ্ঞানী পুরুষ। বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, মহাভারত, পুরাণ সমস্ত শাস্ত্র তাঁর পড়া। আচার্যের ভাষ্যগুলো যখন আমরা পড়ি তখন দেখে অবাক হয়ে যাই যে, কিভাবে তিনি চটপট এখান থেকে সেখান থেকে কোট্ করে যাচ্ছেন, কিভাবে ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে সবাইকে কুচিকুচি করে কেটে আসল অর্থটাকে স্পষ্ট করে দিচ্ছেন, কি ট্যালেন্ট! ভারতে আমরা এই ট্যালেন্ট এর আগে কখন দেখিনি। যুক্তি দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে আসছেন। হিন্দু ধর্ম বলতে ওটাই যেটা শঙ্করাচার্য দিয়ে গেছেন। আমরা যদি ঠাকুরের কথায় এটা মেনে চলি, তাহলে ধরে নিতে হয় যে, হয়ত আচার্যের এই সাক্ষাৎ জ্ঞান তখনও হয়নি। স্বামীজীরও এই সমস্যা হয়েছিল। যাঁকে ঠাকুর সমাধির জ্ঞান দিয়েছেন, সেই স্বামীজী উত্তরপ্রদেশের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। যেতে যেতে এক জায়গায় দেখছেন একজন তামাক খাচ্ছেন। তামাক খাওয়া দেখে স্বামীজীরও তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হল। স্বামীজী তাঁর কাছে তামাক খেতে চাইলে তিনি বললেন, আমি ভাঙ্গি; তখনকার সমাজে ভাঙ্গি খুব নিচু জাতি। 'ভাঙ্গি' শুনে স্বামীজী চলে গেলেন। অনেক দূর চলে যাওয়ার পর স্বামীজীর হঠাৎ মনে হল, আমি তো সন্ন্যাসী, আমার কাছে জাতপাত এগুলো কিছু না। অত দূর থেকে স্বামীজী আবার ফিরে এলেন। যিনি শুদ্ধাত্মা, যাঁর দেহেরই কোন সম্পর্ক নেই, সেখানে জাতপাত কিসের? এই হল বিশ্বাস।

ঠাকুর আবার জড় ভরতের খুব নামকরা কাহিনী বলছেন। জড় ভরত একটা হরিণ শাবককে খুব ভালবাসতেন। মৃত্যুর সময় হরিণের চিন্তা করতে করতে মারা যাওয়ার পর যথারীতি তিনি হরিণ হয়ে জন্মালেন। পরম্পরাতে তিনি জড় ভরত নামেই বিখ্যাত হয়ে গেলেন। গত জন্মে তাঁর প্রচুর তপস্যা করা ছিল বলে এই জন্মে পূর্বজন্মের সব কিছু তাঁর চেতনাতে জাগ্রত ছিল। ঠাকুর বলছেন – **জড়ভরত রাজা রহুগণের পালকি বহিতে বহিতে যখন আত্মজ্ঞানের কথা বলতে লাগল, রাজা পালকি থেকে নিচে এসে**

বললে, তুমি কে গো! জড়ভরত বললেন, আমি নেতি, নেতি, শুদ্ধ আত্মা। একেবারে ঠিক বিশ্বাস আমি শুদ্ধ আত্মা। বেলুড় মঠে আমরা অনেক মহারাজদের দেখেছি, যাঁদের ঠিক এই রকম বিশ্বাস। ঠাকুর হলেন যুগাবতার। অবতারের বৈশিষ্ট্য হল, অবতার কখন একটি কথা বলেন না। আচার্য শঙ্করও তাই, তিনি কখন একটি কথা বলেননি; সমস্ত শাস্ত্রকে নিয়ে চলেছেন, সমস্ত পথকে নিয়ে এগিয়ে গেছেন। গীতার যে ভাষ্য তিনি লিখেছেন, সেখানে তিনি সবটাই নিয়েছেন; যোগকেও নিয়েছেন, বেদান্তকেও নিয়েছেন। কারণ তিনি জানেন সবটাই ঠিক।

'আমি সেই' 'আমি শুদ্ধ আত্মা' –এটি জ্ঞানীদের মত। এই জ্ঞানীদের কথা শঙ্করাচার্য ও জড়ভরতের কাহিনীতে বলা হল। **ভক্তেরা বলে, এ-সব ভগবানের ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য না থাকলে ধনীকে কে জানতে পারে?** আচার্য শঙ্কর তাঁর গীতার ভাষ্যে প্রথমেই এই কথা লিখছেন *স চ ভগবান জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নঃ*। জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য ও তেজ এই ছয়টি ঐশ্বর্য সব সময় ভগবানের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, কারণ ভগবানের ঐশ্বর্য যদি না থাকে তাহলে আমি তাঁকে জানব কি করে!

একটা মজার ঘটনা বলি; বড় বড় আইএএস অফিসারদের সঙ্গে আর্দালি থাকে। আমি একবার একজন আইএএস অফিসারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনাদের সঙ্গে আর্দালি থাকে, আইপিএস অফিসারদের সঙ্গে তো থাকে না কেন'? তখন উনি আমাকে খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বললেন, 'আইপিএস অফিসারদের একটা ইউনিফর্ম থাকে, ইউনিফর্ম দেখে উনি কোন রাঙ্কের অফিসার বোঝা যায়। কিন্তু আইএএস অফিসার, জজ সাহেব, মন্ত্রী এনাদের ইউনিফর্ম থাকে না। ইউনিফর্ম না থাকার জন্য লোকেরা তো চিনতেই পারবে না যে, ইনি কে, ইনি কি কোন আমলা, বা কি কোন জজ সাহেব, বা ইনি কি জেলাশাসক, না কি কমিশনার সাহেব। সেইজন্য এনাদের সাথে একজন আর্দালি থাকে। আর্দালিদের ড্রেসে লেখা থাকে, এই আর্দালি অমুক অফিসারের আর্দালি। তাই আর্দালিকে দেখলে বুঝতে পারে ইনি কোন র্যাঙ্কের অফিসার। বৃটিশ সরকার আমাদের কত কিই না শিখিয়ে দিয়ে গেল'।

ভগবানের ঐশ্বর্য যদি না থাকে, তাঁর কৃপা করার ক্ষমতা যদি না থাকে, কাউকে জাহান্নমে পাঠানোর ক্ষমতা যদি না থাকে তাহলে ভগবান বলে তাঁকে কে মানতে যাবে? যদি বলেন, ভগবান নির্গুণ নিরাকার, তিনি কোন কিছুতে জড়ান না। তাহলে তো ভগবান হাইড্রোজেন গ্যাসের মত হয়ে গেলেন –রঙবিহীন, স্বাদবিহীন।

তবে সাধকের ভক্তি দেখে তিনি যখন বলবেন, 'আমিও যা, তুইও তা' তখন এক কথা। রাজা বসে আছেন, খানসামা যদি রাজার আসনে গিয়ে বসে, আর বলে, 'রাজা তুমিও যা, আমিও তা' লোকে পাগল বলবে। ঠাকুর এই কথা ভক্তদের দিক থেকে বলছেন। আমরা হলাম ভক্ত, আমাদের এই কথা বলার জো নেই, আমরা এই ধরণের কথা কখনই বলতে পারি না। পরে ঠাকুর বলবেন, জ্ঞানীর লক্ষণ আছে, সবাই এই কথা বলতে পারে না। **তবে খানসামার সেবাতে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা একদিন বলেন, 'ওরে, তুই আমার কাছে বোস, ওতে দোষ নাই; তুইও যা, আমিও তা'**।

যাঁরা এই আলোচনা শুনছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বলছি –আমার কাছে বেদ, উপনিষদ ব্যাখ্যা করা খুব সহজ; কিন্তু কথামৃতের ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত কঠিন। বেদ, উপনিষদ আমাদের উচ্চমানের ঋষিরা দিয়ে গেছেন, তখনকার দিনে অবতারের ধারণা সেভাবে তৈরী হয়নি বলে 'ঋষি' শব্দের ব্যবহার ছিল; পরে হলে ঋষিদের আমরা অবতার বলতাম, তাছাড়া জ্ঞানীদের কাছে অবতার নেই। কথামৃত একই ধরণের গ্রন্থ, ঠাকুরকে আজ সবাই অবতার বলেই জানেন। এরমধ্যে দুটো কথা আসে –প্রথম কথা হল, কথামৃত জীবন্ত শাস্ত্র। কথামৃত এই সেদিনকার কথা। এখনও দক্ষিণেশ্বরে গেলে ঠাকুর যে ঘরে বাস করতেন, যেখানে দুটো খাট এখনও আছে, যার একটা খাটে তিনি শুতেন, আরেকটা খাটে বসতেন; একেবারে জীবন্ত হয়ে আছে। যে মন্দিরে ঠাকুর পূজা করতেন, যে মন্দিরের চাতালে ঠাকুর হাঁটাচলা করতেন, সব

যেমনটি ছিল তেমনটি আছে। আর দ্বিতীয় কথা হল, বেদ, উপনিষদ আট হাজার, দশ হাজার বছর আগে এসেছিল, এর মধ্যে আধ্যাত্মিক জগতে, ধর্ম জগতে কত কিছুর পরিবর্তন হয়ে গেছে; মানবজাতি আরও যা যা অনুভব বা উপলব্ধি করেছে, সেইগুলোর অনেক কিছু কথার পুরোটাই কথামৃতে ঢুকে গেছে। কথামৃতে ঠাকুর যে গল্পগুলো বলেছেন, আমরা কথায় কথায় সেই গল্প বলি, অতটা পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু এর বাইরে যে কথাগুলো আছে অত্যন্ত গভীর কথা। কথামৃতের কোন একটা পাতাকে যদি আপনি ছিঁড়ে রেখে দেন, ওই একটি পাতার কথাকে অবলম্বন করে আপনি সারা জীবন সাধনা করে কাটাতে পারেন; কথামৃতের বাকি কথা আপনার আর লাগবে না। আমাদের কাছে ভক্তরা এসে বলেন, মহারাজ আপনার ক্লাশ শুনছি, জীবনযাপনের জন্য কিছু বলুন। শুনে কষ্ট হয়, অসন্তুষ্ট হয়ে যাই। ঠাকুরের কথা ব্যাখ্যা করছি, তাতেও আপনার জীবনযাপন শোধরালো না? আমার কথা শুনলে শোধরাবে ভাবছেন? বুঝতে পারি, খোসগপ্প করতে চাইছেন।

আমরা সামান্য জীব, আমাদের জন্য ঠাকুর বলছেন –**সামান্য জীবেরা যদি বলে 'আমি সেই' সেটা ভাল না**। কারণ এই ধরণের চিন্তা-ভাবনাতে জীবনটাই এলেমেলো হয়ে যায়। ঠিক তেমনি সাধারণ জীব যখন বলে, 'সবই ঠাকুরের ইচ্ছা' তখনই সব কিছু এলেমেলো হয়ে যায়। **জলেরই তরঙ্গ; তরঙ্গের কি জল হয়?** এগুলো ধারণা করতে হয়, ধারণা করার জন্য মনকে বশে আনতে হয়। এটাই ঠাকুর এবার বলছেন।

কথাটা এই –মন স্থির না হলে যোগ হয় না, যে পথেই যাও। ঠাকুর শুরু করেছিলেন এই বলে –সাধনার বড় দরকার। এবার আবার ওই জায়গায় ফেরৎ এসে গেলেন। মন স্থির না হলে যোগ হয় না, তার মানে মন স্থির না হলে ঈশ্বরীয় কথায় বিশ্বাস হবে না, গুরুবাক্যে বিশ্বাস হবে না, শাস্ত্রে বিশ্বাস হবে না। সংসারী লোকেদের তো এমনিই হবে না, কিন্তু যাঁরা ধর্মপথে এসে গেছেন, তাঁদেরও হবে না। বর্তমানে আমি যেখানে আছি সেখানে একজন নূতন ব্রহ্মচারী মহারাজ একদিন শাস্ত্রের কিছু কথা বলছিলেন। নূতন এসেছেন, দেখছেন আমরা গল্প করছি, নিজেরও যোগ দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল। আমি খুব হাসতে শুরু করলাম, হেসে বললাম, 'ভাই কুড়ি বছর আগে থাক, কুড়ি বছর ধরে বেলুড় মঠ, সঙ্ঘ ঘেষে মেঝে তোমাকে যখন তৈরী করবে, তারপর তুমি পাত্রতা পাবে। তা নাহলে জয়েন করেই বই লিখতে শুরু করেছে, ওই রকম তোমার দুরবস্থা হবে; আমিও অনেক আগে জিনিসটা বুঝেছিলাম', এইসব কথা বললাম। আরও অনেকে সেখানে ছিলেন।

জিনিয়াস কে? স্বামীজী জিনিয়াস কে বলতে গিয়ে বলছেন –যেটা অন্যদের জানতে অনেক সময় লাগে, জিনিয়াস সেটাকে চটপট, খুব তাড়াতাড়ি জেনে যান। এটাই জিনিয়াস, এছাড়া আর কিছু জিনিয়াসের সংজ্ঞা হয় না। যেমন আইনস্টাইন একজন জিনিয়াস, কারণ যে জিনিসটাকে জানতে আমাদের হাজার বছর লাগবে সেটাকে উনি দু-বছর, তিন-বছরে করে দিচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন অবতার, সাধারণ দৃষ্টিতে তিনি একজন স্পিরিচুয়াল জিনিয়াস, যেমন স্বামীজী একজন স্পিরিচুয়াল জিনিয়াস। লৌকিক দৃষ্টিতে দেখলে ঠাকুরের, স্বামীজীর সাধনা কত বছরের হল? ঠাকুরের যা কিছু লোকশিক্ষার জন্য, স্বামীজীরটাও মেনে নিলাম সব তাঁর লোকশিক্ষার জন্য। কিন্তু তাতেও কত বছর লেগেছে? খুব কম হলে তিরিশ কি বত্রিশ বছর বয়সে ওনার সেই অবস্থায় এলেন, যেখানে তিনি বুঝতে পারছেন যে এবার জগৎকে তিনি দিতে পারবেন। একজন যিনি স্পিরিচুয়াল জিনিয়াস, তাঁরই জীবনের তিরিশটা বছর লেগে গেল। এখন এই তিরিশ বছর বয়সেই তুমি যদি উপদেশ দিতে শুরু কর, তাহলে তো তুমি ঠাকুরের মত হয়ে গেল, স্বামীজীর মত হয়ে গেলে, ভগবান বুদ্ধের মত, যীশুর মত হয়ে গেলে।

এত বড় ভুল কি আমি করব? এত বড় ভুল কি তুমি করবে? ঠাকুর বলছেন, আমি ষোল আনা করেছি, তোরা এক আনা কর। হিসাব মত শতকরা ছয় কি সাত ভাগ হয়। ঠিক আছে আমরা দশ ভাগই ধরে নিচ্ছি; কিন্তু তাতেও কিছু তো সময় দিতে হবে। আর যাই করুন তিরিশ বছর আগে আপনি

নিজেকে জ্ঞানী বলতে যাবেন না। এটা অতি সাধারণ একটা কমনসেন্স, কাউকে ছোটা করা বা বড় করার জন্য বলা হচ্ছে না। অত্যন্ত সাধারণ এবং বাস্তব কথা –সময় লাগবে। অর্কিমিডিসকে রাজা একটা সোনার মুকুট দিয়ে বলছেন, 'দেখে আমাকে বল তো এর মধ্যে কোন ভেজাল আছে কিনা'? তিনি ল অফ্ বোয়েন্সি বার করলেন, বার করেই রাস্তায় দৌড়াতে লাগলেন এই বলে –ইউরেকা, ইউরেকা, ইউরেকা। ল অফ্ বোয়েন্সি এখন সিক্স সেভেনে পড়ানো হয়। আধ্যাত্মিক সত্যগুলি উপলব্ধ করা এভাবে হয় না, আধ্যাত্মিক জিনিস আয়ত্ত করা সময় সাপেক্ষ; সাধনাতেই কত সময় লাগে।

ঠাকুর একটা খুব সাংঘাতিক কথা বলছেন –**মন যোগীর বশ। যোগী মনের বশ নয়**। দুটো শব্দ –একটা যোগী, অন্যটা অযোগী। যিনি যোগী নন তিনি অযোগী। তাহলে যোগী আর অযোগীর তফাৎ কোথায়? মন যাঁর বসে তিনি হলে যোগী; যারা মনের বশে তারা অযোগী। আপনার মন কি শতকরা একশ ভাগ আপনার নিয়ন্ত্রণে আছে? তাহলে আপনি যোগী। দুটো ঘটনা আমার মনে পড়ছে, খুব মজার ঘটনা। নূতন জয়েন করে আমি দেওঘরে ছিলাম। খুব বেশি দিন হয়নি, একবার আমাদের মঠ মিশনের একজন খুব সিনিয়র মহারাজ পূজ্যপাদ স্বামী অনন্যানন্দজী মহারাজ দেওঘরে একটা প্রোগ্রামে এসেছিলেন। অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে আমারও অদ্বৈত আশ্রমে পোস্টিং হয়। যাবার সময় আমরা সবাই ওনাকে যশিডি স্টেশনে ছাড়তে গিয়েছিলাম। রাত এগারোটায় যশিডি থেকে ছেড়ে ট্রেনটা আবার ভোর পাঁচটা হাওড়া স্টেশন পৌঁছায়। কাউকে ট্রেনে তুলতে যাওয়া, কাউকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসা, এই দায়ীত্বটা মূলতঃ আমার উপরেই ছিল। মহারাজকে আমি বললাম, 'মহারাজ, এখন রাত এগারোটা, ভোর পাঁচটায় উঠে আবার নামতে হবে, আপনার খুব অসুবিধা হয়ে যাবে'। উনি ইংলিশেই বেশি কথা বলতেন, মিষ্টি করে ইংরাজীতে যা বললেন তার বক্তব্য হল –আমার মন এমন হয়ে গেছে, যত রাতেই ঘুমোতে যাই না কেন, ভোর চারটের সময় ঘুম ভেঙে যায়, আর পুরো সতেজ। অবাক হয়ে আমি শুনলাম, তার মানে রাত দুটোর সময় শুলেও ভোর চারটেয় উঠে পড়বেন, রাত এগারোটার সময় শুলেও ভোর চারটেয় উঠে যাবেন।

কিছুদিন আগে আমার এক জুনিয়র সন্ন্যাসী ভাই অন্য কথার প্রসঙ্গে খুব সুন্দর একটা ঘটনা বললেন। উনি যে আশ্রমে নূতন জয়েন করেছিলেন সেই আশ্রমে পূজা-অর্চনার প্রাধান্য খুব বেশি। মহারাজ ছিলেন সেখানকার পূজারী। ভোর চারটের সময় মঙ্গলারতির দায়ীত্ব তাঁর। একদিন কিভাবে ওনার ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ্যলার্ম বাজেনি। দরজায় ধাক্কা মারা শুরু হয়ে গেছে। উনি দৌড়ে মন্দিরে গেলেন। ওখানকার বড় মহারাজ সেদিন ওনাকে দেখে গম্ভীর স্বরে বলছেন, 'মঙ্গলারতিতে দেরী কেন'? উনি বললেন, 'মহারাজ ঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল'। মহারাজ বলছেন, 'ব্যাটারি নিয়মিত চেক করবে'। এটা অনেক আগেকার ঘটনা, প্রায় কুড়ি-পচিশ বছর আগেকার কথা। বড় মহারাজের কথা শুনে আমাদের এই মহারাজের মন এত খারাপ হল যে, রেগেমেগে নিজের মনকে বললেন –'মন! চারটের সময় যেন আমি উঠে যাই'। উনি বলছেন, তারপর যত বছর উনি ওই আশ্রমে ছিলেন, তিন-চার বছর ছিলেন, একটা দিনও উনি এ্যলার্মের শব্দে ঘুম থেকে ওঠেননি। ওনার যখন ঘুম ভাঙছে, ঘড়ির কাঁটা তখন ঠিক চারটেতে যাচ্ছে। কোন দিন এক সেকেণ্ড আগেও না, কি দু সেকেণ্ড পরেও না। পুরো তিনটে বছর এভাবে চলেছে। উনি মজা করে নিজের একটা ভাব বলছেন, মন যেন দৌড়ে দৌড়ে ঘড়ির দিকে যাচ্ছে আর দেখছে চারটে বাজল কিনা। যেমনি চারটে বাজতে এক কি দু সেকেণ্ড বাকি, দৌড়ে এসে মহারাজকে বলছেন, এবার উঠে পড়। এই নয় যে তিরিশ সেকেণ্ড আগে থাকতেই মহারাজকে ঘুম থেকে তুলে দিচ্ছে। তিন বছরে একটা দিনও বাদ যায়নি –এক থেকে দু সেকেণ্ড বাকি, মহারাজ ঠক্ করে উঠে পড়তেন। আমিও যখন এই ঘটনাগুলি শুনি, অবাক হয়ে যাই। আমার মন তো এত নিয়ন্ত্রণে নেই। কিন্তু যখন শুনি আমাদের বংশের যাঁরা, বংশ মানে আমরা সন্ন্যাসী বংশের কিনা, তাঁদের কারুর মন এত নিয়ন্ত্রণের ঘটন যখন শুনি মনটা খুশিতে ভরে যায়। আমরা সন্ন্যাসীরা আমাদের বাবা-মার বংশের নয়। কোথাও একটা জন্ম নিতে হবে তাই জন্ম নিয়েছি। আমাদের বংশের কেউ মনকে বলে

দিয়েছেন, মন চারটের সময় ওঠা চাই। বছরের পর বছর ঠিক চারটের সময় ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। এক মিনিট আগে না, দু মিনিট পরেও না; এক থেকে দুই সেকেণ্ডের মধ্যে। এই হল, মন যোগীর বশ।

মন স্থির হলে বায়ু স্থির হয় –কুম্ভক হয়। স্বাভাবিক কুম্ভক, আপনারা প্র্যাক্টিস করলে আপনাদেরও হবে, এমন কিছু না। আপনার যদি মনে হয় আপনার মন খুব চঞ্চল; আপনাকে খুব বেশি কিছু করতে হবে না। চেয়ারে বা খাটে বা মাটিতে যেখানে খুশি কোথাও একটা বসে যান, শুধু শিরদাঁড়া সোজা করে বসুন। আর কিছু করতে হবে না। হাত কোলে রাখুন আর গভীর ভাবে নিঃশ্বাস নিন, দশ গুনে নিঃশ্বাস নিন, দশ গুনে নিঃশ্বাস ছাড়ুন। পাঁচবার করার পর, দশ গুনে শ্বাস নিয়ে দশ গুনে শ্বাস বাইরে ছেড়ে ধরে রাখুন আর দশ গুনে ভিতরে শ্বাস নিন। এটাও পাঁচবার করুন। মন স্থির হয়ে যাবে, করে দেখুন। বাইরেই ধরে রাখতে বলা হয়েছে, কারণ ভিতরে কুম্ভকটা ভাল না। প্রাণায়াম অনেক ধরণের হয়, কিন্তু এটা সবচেয়ে নিরাপদ, যেটা সবাইকে করতে বলা যায়।

বিদেশে কেউ রেগে গেলে বলে, count upto ten, আসলে এখানে মনকে স্থির করতে বলা হচ্ছে, মন স্থির হলে রাগও প্রশমিত হয়ে যাবে। আমরা জানি এগুলো হলে কি হয়, কুম্ভক হলে মন স্থির হয়ে যায়। প্রাণ স্থির মানে মন স্থির। মন চঞ্চল মানে প্রাণ চঞ্চল। যারা চেয়ারে বসে পা নাড়তে থাকে, বুঝবেন মন চঞ্চল; পা নাড়া মানেই প্রাণ চঞ্চল, প্রাণ চঞ্চল মানে মন চঞ্চল। চঞ্চল মনের লোকেরা ভাল কাজকর্ম বেশি করতে পারবে না; কর্মে সাফল্যের হারও অনেক কম। আমি সেইজন্য প্রায়ই বলি, আপনার জীবনের মূলধন দুটি –সময় ও শান্তি। এই দুটোকে নষ্ট হতে দেবেন না।

আমাদের ছিলেন পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ, ফর্সা রঙ, ভারী শরীর। অনেক আগের ঘটনা, মহারাজ একবার কানপুরে গিয়েছিলেন। মন্দিরে একটা পাশে মহারাজ স্থির হয়ে বসে আছেন। ভক্তরাও আশেপাশে বসে আছেন। মহারাজ অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে আছেন। উনি কোন কারণে হাতটা একটু নাড়লেন, কোন মাছি হয়ত বসেছিল। ওখানে ভক্তদের মধ্যে একটা চার বছরের বাচ্চা মেয়েও বসে আছে। বাচ্চা মেয়েটির দাদা পরে আমাদের সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তিনিই ঘটনাটা আমাদের বলেছিলেন। সেই বাচ্চা মেয়ে চেঁচাতে শুরু করেছে –মা, মা, দেখ ঠাকুর হাত নাড়ছেন। কানপুরে ঠাকুরের বিগ্রহ মার্বেলের। মহারাজ এমন স্থির হয়ে বসে আছেন যে, মনে হচ্ছে ইনিও একজন ঠাকুর – মা, মা, ঠাকুর হাত নাড়ছেন। কুম্ভক যখন হয় তখন প্রাণ স্থির হয়ে যায় আর স্বাভাবিক ভাবে মন স্থির হয়ে যায়। এই কুম্ভক সাময়িক, এই কুম্ভক আপনাকে যোগী বানাবে না, তবে সাময়িক সাহায্য করবে।

এই কুম্ভক ভক্তিযোগেতেও হয়। ভক্তিতে বায়ু স্থির হয়ে যায়। গানেতেও এই রকম হয়, জপেও হয়, জপ করতে করতে কুম্ভক হয়ে গেলে স্বাভাবিক ভাবে জপটাও বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার ধরুন বিরাট মন্ত্র আছে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে, অনেকক্ষণ জপ করতে করতে আপনার কুম্ভক হতে শুরু হয়ে যাবে, তখন আর অত বড় মন্ত্র বলা যাবে না। ওঁ নমঃ শিবায় মন্ত্র জপ করছেন, কুম্ভক হতে শুরু হলে শুধু ওঁ বলতেই মনটা স্থির হয়ে যাচ্ছে। এটাই ঠাকুর এখানে বলছেন –**'নিতাই আমার মাতা হাতি', 'নিতাই আমার মাতা হাতি'। এই বলতে বলতে যখন ভাব হয়ে যায়, সব কথাগুলো বলতে পারে না, কেবল 'হাতি'! 'হাতি'! তারপর শুধু 'হা'! ভাবে বায়ু স্থির হয় –কুম্ভক হয়**।

ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন, একজন ঝাঁটা দিচ্ছে, একজন লোক এসে বললে, **'ওগো, অমুক নেই, মারা গেছে'। যে ঝাঁট দিচ্ছে তার যদি আপনার লোক না হয়, সে ঝাঁট দিতে থাকে, আর মাঝে মাঝে বলে, 'আহা, তাই তো গো, লোকটা মারা গেল! বেশ ছিল'! এদিকে ঝাঁটাও চলছে। আর যদি আপনার লোক হয়, তাহলে ঝাঁটা হাত থেকে পড়ে যায়, আর 'এ্যাঁ'! বলে বসে পড়ে**। এই জগতে কাউকে যার আপন বলে মনে হয় না, সেইজন্য হাত থেকে তার ঝাঁটা কোনদিন পড়বে না। যখন আমরা কারুর সঙ্গে জুড়ে নিই, আপন করে নিই, তখন হাত থেকে ঝাঁটা পড়ে যায়। ঠাকুর বলছেন, **তখন বায়ু স্থির হয়ে**

গেছে; কোন কাজ বা চিন্তা করতে পারে না। স্থির বায়ু মানেই কোন কাজ হবে না। কুম্ভক হলে প্রাণন ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, মন স্থির হয়ে যায়।

মেয়েদের ভিতর দেখ নাই! যদি কেউ অবাক্ হয়ে একটা জিনিস দেখে বা একটা কথা শুনে, তখন অন্য মেয়েরা বলে, তোর ভাব লেগেছে নাকি লো! এখানেও বায়ু স্থির হয়েছে, তাই অবাক, হাঁ করে থাকে। বায়ু স্থির হওয়া, এটা সবারই হয়। বাচ্চারা যখন টিভিতে ক্রিকেট ম্যাচ বা কোন কমিকস্ আদি দেখে, হাঁ করে দেখতে থাকে, বায়ু স্থির হয়ে যায়। কোন রহস্য উপন্যাস পড়ছেন, যেখানে একটা কোন মার্ডার হয়েছে, ওসব জায়গায় পড়ার সময় বায়ু স্থির হয়ে যায়। বায়ু স্থির সবারই হয়, হতে বাধ্য। কিন্তু ওই বায়ু স্থির একটা ঘটনাক্রমে হচ্ছে, সেটা না করে আপনি নিজের চেষ্টায় কুম্ভক এনে করছেন। আর এটাই যখন ধীরে ধীরে যোগী হয়ে যান, তখন মন পুরো বশে, তখন কুম্ভক আপনা-আপনি হবে।

মনকে বশে আনার পদ্ধতি আরও সহজ করে বলি। আমাদের একজন মহারাজ নূতন আমার কাছে জয়েন করেছিলেন। আমি তাঁকে পরে এটা বলেছিলাম। একটা ডাইরি নিন, এবার আপনার যিনি ইষ্ট, ধরুন ঠাকুর আপনার ইষ্ট। আপনি ডাইরিতে খুব সুন্দর করে লিখুন 'জয় শ্রীরামকৃষ্ণ', এক পাতা পুরো লিখুন। দেখবেন আপনার মন পুরো স্থির হয়ে যাবে। তার মানে, আপনি প্রাণায়ম করতে পারেন, ঈশ্বরের কোন নাম লিখতে পারেন, শুধু লেখাটা সুন্দর হাতের লেখা হওয়া চাই। কিংবা সুন্দর একটা আলপনা আঁকুন, কাউকে দেখানোর জন্য না, নিজের মনের আনন্দের জন্য। মন স্থির করার অনেক উপায় আছে। এটাই যখন স্বাভাবিক হয়ে যায়, সব সময় মনকে বশে রাখা যাচ্ছে, তখন তিনি যোগী হয়ে গেলেন। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, মন যোগীর বশ, যোগী মনের বশ নয়।

ঠাকুর এতক্ষণ ভাবের কথা বললেন। 'তোর ভাব লেগেছে নাকি লো', এই জিনিসটাকে নিয়ে বলছিলেন। এবার ঠাকুর অন্য একটা প্রসঙ্গে বলছেন, যে ভাবটা তখনকার সমাজে অনেকের ছিল, এখনও আছে।

সোহহংসোহহম্ কল্লেই হয় না। ইদানিং কালে একটা নামকরা কথা উঠেছে, আজকাল অনেকেই এই কথা বলেন –I am spiritual, I am not religion। যাঁরা এই কথা বলেন, তাঁরা কি বলতে চাইছেন নিজেরাও বোঝেন না, কিন্তু বলেন। এটাই বলতে চাইছেন –সোহম্ সোহম্। ঠাকুর বলছেন সোহম্ সোহম্ করলেই হয় না।

জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। যিনি জ্ঞানী, জ্ঞানমার্গের যাঁরা সাধক, নেতি নেতি যাঁরা করবেন, সমাধিবান যাঁরা হবেন; এনাদের লক্ষণ আছে। **নরেন্দ্রের চোখ সুমুখঠেলা। এঁরও কপাল ও চোখের লক্ষণ ভাল**। ঠাকুর ফিজিওনমিটা জানতেন। ফিজিওনমি একটা বিরাট বিষয়, কিন্তু এটাকে সবাই মানেন না। ঠাকুর পুরোদমে মানতেন, আর হিন্দুরাও এটাকে মানে।

আমরা সবাই আজ যেখানে আছি, সেখানে আমরা যে কাজই করি না কেন, সেই কাজের একটা ছাপ আমাদের মনের উপর পড়ে। মনের উপর যে ছাপ পড়ে, সেই ছাপটাই পরে শরীরের উপর পরিষ্কার ফুটে উঠতে দেখা যায়। শুধু চেহারা না, আপনার যেমন মন হবে আপনার শারীরিক গঠনও তেমন হবে। এই শরীর জন্মজন্মান্তর ধরে যে চলছে, এক বিশেষ মনকে নিয়েই এই শরীর চলে। একজন বিদেশী লেখক এর উপর এক সময় প্রচুর গবেষণা করেছিলেন। তিনি তাঁর একটা গবেষণায় দেখাচ্ছেন, মৃত্যুর ঠিক আগে তার মনের যে অবস্থা ছিল, সেটারই একটা ছাপ যেন বর্তমান শরীরে এসে গেছে। কিছুক্ষণের জন্য জন্মজন্মান্তর ব্যাপারটা যদি সরিয়ে রাখি; এই জন্মে তো পরিষ্কার বোঝা যায়।

একটা রোগের নাম অনেকেই শুনে থাকবেন, যার নাম সাইকোসোমাটিক। মানুষের কিছু কিছু রোগ হয় যে রোগটা সরাসরি মনের সঙ্গে যুক্ত। কোন কারণ নেই, কিন্তু শরীরের কোন অঙ্গে ব্যাথা

অনুভব হয়। কোন কারণ নেই কিন্তু ব্যাথা, এটা খুব নামকরা ব্যাধি। কোন কারণ নেই পেট খারাপ, কোন কারণ নেই ডায়বেটিস, এই ধরণের অনেক কিছু হয় যেটাকে আমরা সাইকোসোমাটিক বলতে পারি। ডাক্তাররা কোন কারণ খুঁজে পাননা। তখন বুঝতে হয়, মনের অত্যন্ত গভীরে কোন ঘা আছে, কিংবা মনের গভীরে রোজ টিপটিপ করে কোন ঘা পড়ছে। আশেপাশে যারা থাকে তারা বুঝতে পারেনা, রোগীকে নিয়ে বিরক্ত হয়ে যায়। কতদিন আর সহ্য করবে? আপনি যদি সৎচিন্তন করেন, শুভ চিন্তন করেন আপনার চেহারা এক রকম হবে। আবার যদি অশুভ চিন্তন করেন, কাম, ক্রোধ, লোভ যদি বেড়ে যায় তখন চেহারা আর-এক রকম হবে। এই জিনিসটাই যখন জন্মজন্মান্তর ধরে চলে, শরীরটাই পুরো ওই রকম হয়ে যায়। সেইজন্য লোকজনদের দেখলে বোঝা যায় সামনের লোকটির মানসিকতা কেমন।

এই জন্মে আপনি যে শরীর পেয়েছেন এই পাওয়াটা আপনার হাতে নেই। আগে আপনারা এত পরিষ্কার ভাবে ধর্মকথা শুনতে পেতেন না, কিন্তু এখন শুনতে পাচ্ছেন, এখন শাস্ত্রের কথা, ধর্মের কথা জানছেন। সেইজন্য এখন আপনাদের কয়েকটা জিনিসের উপর জোর দিতে হবে; জপধ্যান, পূজা-অর্চনা, দান-পূণ্য এগুলো করতে হবে। এগুলো করলে চোখ-মুখ এক বিশেষ প্রকার হয়ে যায়, শরীর এক বিশেষ প্রকার হয়ে যায়। ঠিক তেমনি যাঁরা অনেকদিন জ্ঞানসাধনা করেছেন, উপনিষদ পড়েছেন, উপনিষদের কথা নিয়ে মনন করেছেন, গীতা পড়েছেন, গীতার মর্ম চিন্তন করেছেন; তাঁদের চোখমুখ অন্য রকম হয়ে যায়। ঠাকুর শরীরের লক্ষণ দেখলে পরিষ্কার বুঝতে পারতেন এর স্বভাব কি রকম; ফলে এর জন্য সহজ পথ কি হবে বুঝে যেতেন। যেমন রাজা মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) নিয়ে বলছেন, ওর ভক্তির ঘর, জ্ঞানপথ ওর জন্য নয়।

তাহলে আমরা যে উপনিষদ আদি পড়ছি? আমরা পড়ছি ঠিকই, কিন্তু আমরা তো সাধক নই। এতদিন শাস্ত্র পড়ে আমি যা বুঝেছি, বেশির ভাগ লোকদের জন্য ভক্তিপথ। কাজ সবাইকেই করতে হবে, এটাকে নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু যোগসাধনা আর উপনিষদের সাধনা হল মুষ্টিমাত্র কয়েকজনের জন্য, সবার জন্য নয়।

ঠাকুর বলছেন –**আর, সব্বায়ের এক অবস্থা নয়**। ঠাকুর বলেছেন ঠিক, কিন্তু আমরা এগুলো মেনে নিতে পারিনা। **জীব চার প্রকার বলছে, –বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব, নিত্যজীব**। আমরা এগুলোকে নিয়ে আগে অনেকবার আলোচনা করেছি। **সকলকেই যে সাধন করতে হয়, তাও নয়**। মনে রাখবেন এই কথাটা কিন্তু আমার, আপনার জন্য নয়। আমাদের সবারই সাধনা দরকার। ঠাকুর এই কথা বলছেন, যাঁরা শ্রেষ্ঠতম, ওনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ যাঁরা এসেছেন তাঁদের জন্য।

বলছেন, **নিত্যসিদ্ধ আর সাধনসিদ্ধ। কেউ অনেক সাধন করে ঈশ্বরকে পায়, কেউ জন্ম অবধি সিদ্ধ, যেমন প্রহ্লাদ**। ঠাকুর এই যে ধর্মজগৎ, এটাকে আমাদের সামনে খুলে দিয়েছেন। খুলে দেওয়ার জন্য আজ আমরা অনেক কিছু জানত পারছি, ধর্মজগতের যে জিনিসগুলো স্বাভাবিক ভাবে জানা যায় না। আর ঠাকুরের মুখ থেকে যখন এগুলো আসছে, তখন আমরা জানি যে এর প্রত্যেকটি সত্য। পুরাণাদিতে যে কথাগুলো আছে, সাধু-মহাত্মাদের যে পরম্পরা, সেখানে যে কথাগুলো আছে; সমস্ত কথাগুলো এক জায়গায় এসে যাচ্ছে। কিন্তু ঘুরে ফিরে ওটাই আসছে –এই যে যাঁরা আছেন, জন্মজন্মান্তর ধরে অনেক সাধনা করেছেন বলে আজকে তাঁরা সেই জায়গায় আছেন।

ঠাকুর হোমাপাখির কথা বলছেন। **হোমাপাখি আকাশে থাকে। ডিম পড়লে ডিম পড়তে থাকে। পড়তে পড়তেই ডিম ফুটে। ছানাটা বেরিয়ে আবার পড়তে থাকে। এখনও এত উঁচু যে, পড়তে পড়তে পাখা ওঠে**। এগুলো কাহিনী, মিথলজি। মিথলজিতে বলা হয়, অনেক সময় কিছু জিনিস, এমন অনেক বিচার আছে, যেগুলোকে আমরা সরাসরি মানুষকে বোঝাতে পারিনা। তখন দরকার পড়ে কিছু কাহিনী কিছু ব্যাখ্যা। কিছু জিনিস ব্যাখ্যা দিয়ে হয়ে যায়, কিছু আইডিয়া কাহিনী দিয়ে মানুষের মনে ধারণাটা সহজে স্পষ্ট করে দিতে হয়। হোমাপাখি আর নিত্যসিদ্ধ এই দুটোকে মাধ্যম করে একটা আইডিয়া নিয়ে

আসছেন। যার জন্য পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণে অনেক কাহিনী বলা হয়েছে যাতে কিছু আধ্যাত্মিক সত্যকে আমরা সহজে ধারণা করতে পারি।

যখন পৃথিবীর কাছে এসে পড়ে, পাখিটা দেখতে পায়, তখন বুঝতে পারে যে, মাটিতে লাগলে চুরমার হয়ে যাবে। তখন একেবারে মার দিকে চোঁচা দৌড় দিয়ে উড়ে যায়। কোথায় মা! কোথায় মা!

যাঁরা নিত্যসিদ্ধের থাক, এনাদের যখন মনে হয় এবার আমি সংসারে ফেঁসে যাব, তখন প্রাণ ছেড়ে পালিয়ে যান। ইনি না পালালেও ঠাকুর পালিয়ে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দেন। কিছু একটা করে এমন একটা ধাক্কা মারবেন, যাতে এই সংসাররূপ আবর্জনায় এসে না পড়ে। অনেকেই আমাদের কাছে দেখা সাক্ষাৎ করতে আসেন। ওনাদের সবারই ভাবনা চিন্তা এমন যে, আর এমন ভাবে কথা বলতে চান যে, ওনাদের সবারই অবস্থা একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এগুলো হয় না, কোথাও একটা শুরু করতে হয়। ঠাকুরের কথামৃত বেদ, এখানে সব কিছু আছে। যাঁরা খুব উচ্চমানের সাধক তাঁদের জন্যও আছে, যাঁরা সাধারণ, তাঁদের জন্যও আছে। আপনাকে প্রথমে মনে করতে হবে, আপনি একজন সাধারণ। সেখান থেকে আপনি যখন শুরু করবেন, তখন নিজেই বুঝতে পারবেন, আমি তো এটাকে পেরিয়ে এসেছি।

প্রহ্লাদাদি নিত্যসিদ্ধের সাধন-ভজন পরে। সাধনের আগে ঈশ্বরলাভ। যেমন লাউ কুমড়ো আগে ফল, তারপরে ফুল। ঠাকুর গ্রামে ছিলেন, এই জিনিসগুলো তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। **(রাখালের বাপের দিকে চাহিয়া) নীচ বংশেও যদি নিত্যসিদ্ধ জন্মায়, সে তাই হয়, আর কিছু হয় না। ছোলা বিষ্ঠাকুঁড়ে পড়লে ছোলাগছই হয়**। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী তখন রাখাল। রাখালের বর্ণনা ঠাকুর রাখালের সামনেই করছেন। ছোলা বিষ্ঠাকুড়ে পড়লে ছোলাগাছই হয় –এই কথাটিকে যখন বুঝতে যাই, এই কথার ব্যাখ্যা যখন আমরা করতে যাই, তখন অনেক কথা বেরিয়ে আসে।

প্রথম হল, শুরুতে যে বলা হল, এর আগে আগে যেমন কর্ম করেছি তেমন আমাদের মন, যেমন আমাদের মন তেমন আমাদের শরীর। যেমন শরীর, সেইটাকে আধার করে আমাদের সূক্ষ্ম শরীর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে। মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে কিছু জিনিস মায়ের থেকে নেয় ঠিকই, কিন্তু আসলটা তার নিজের। যমজ সন্তানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বিভিন্ন কারণে তারা আলাদা হয়ে গেছে। পরে জানা গেল যে এরা যমজ। তখন তাদের স্বভাবে অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি তাদের শরীর খারাপ হওয়া, তাদের রোগের মধ্যেও অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুটি আলাদা দেশে যদি জন্মায় স্বাভাবিক ভাবে তাদের ভাষা আলাদা হবে। আপনারা এখন যে কজন এই ক্লাশ শুনছেন, আপনারা সবাই কিন্তু নিজের বাবা-মা থেকে পৃথক, আসলে কিন্তু কোন সম্পর্ক নেই। আমার, আপনার সবারই একটা গর্ভ দরকার, ঘুরে ফিরে একটা গর্ভে প্রবেশ করে। প্রবেশ করার পর অনেক সময় বুঝতে পারে এই গর্ভটা আমার জন্য ঠিক না, তখন সেই জীবাত্মা ওই গর্ভে ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সেইজন্য সমস্ত গর্ভ ফলবান হয় না, হতে পারে না। যদিও যমজ সন্তানের জন্মে দুজনের সময়ের ফারাকটা বেশি হয় না, কিন্তু কথার কথায় যদি ধরে নিই যে, যমজের দুজন যমজ রূপে জন্ম না নিয়ে যদি একজন ইংল্যাণ্ডে জন্ম নেয়, আর একজন ভারতে জন্ম নেয়, সেখানে তাদের ভাষার তফাৎ হয়ে যাবে, খাদ্যাভ্যাস পুরো পাল্টে যাবে, আচার ব্যবহার পাল্টে যাবে, কিন্তু কোথাও একটা সমানতা থাকেবে। ঠিক তেমনি আপনি এই বংশে না জন্মে অন্য বংশে যদি জন্ম নিতেন, সেখানে অল্প একটু তফাৎ হত, কিন্তু মূল সেটাই থাকত।

সেইজন্য কক্ষণ নিজের বাবা-মাকে দোষ দেবেন না। আপনার কর্ম আপনি নিজে নিয়ে এসেছেন। অনেকেই বাবা-মাকে দোষ দেয়, বাবা-মা আমার জন্য কি করল। এখানে বাবা-মার কিছু করার নেই, আপনি এখন ওটাই পাচ্ছেন, যেটা আপনি আগে আগে করে এসেছেন; এরজন্য অন্য কেউ দায়ী না। আর দেখে অবাক হয়ে যাবেন যদি আপনারা নিজেরা চিন্তা-ভাবনা করেন, এই বাড়ির সন্তান

না হয়ে অমুক বাড়ির সন্তান হতাম; দেখবেন ওই বাড়িতে এমন কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা আপনার সহ্য হবে না। মোটামুটি দেখা যায় যে জীব, অর্থাৎ আগে আপনি দেহ বাদে যিনি ছিলেন, তিনি মোটামুটি ঘুরে ফিরে উপযুক্ত গর্ভই নেবেন। উপযুক্ত গর্ভ যদি না নিয়ে থাকেন তাহলে জন্ম নিয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে ওই পরিবার ছেড়ে বেরিয়ে চলে যাবেন। এর সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হল সন্ন্যাসীরা। সন্ন্যাসীদের নিজেদের তো কোন বাবা-মা হবে না, সংসারে তাঁদের জন্ম নিতে হবে, তাই কোন মায়ের গর্ভ আশ্রয় করে নেন। কিন্তু এনারা আলাদা থাক, সময় হলে ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান। এখন আপনি মানবেন কি মানবেন না, তাতে কিছু আসে যায় না। এটা একটা আধ্যাত্মিক সত্য। জীবনকে আরও গভীরে গিয়ে যখন দেখবেন, তখন দেখবেন এটাই সত্য।

তাই বাবা-মাকে দোষ দেওয়া, নিজের সমাজকে দোষ দেওয়া অর্থহীন। আপনি যা কিছু জন্মজন্মান্তর ধরে করে আসছেন, সেটাই আপনি করতে পারবেন, সেটাই আপনি করবেন। একটা ঘটনা বলি, কিছু দিন আগে আমার একজনের সাথে পরিচয় হল, যিনি অন্য দেশের এবং অন্য ধর্মের। দেশ আর ধর্মটা আমি বলছি না। তিনি বিভিন্ন ভাবে আমার সঙ্গে সম্পর্ক করলেন। সেখান থেকে কয়েকবার অনেক কথাবার্তা হল। ঘুরেফিরে উনি আমাকে একটা কথাই বলেন, বাংলায় যার অর্থ –সংসার আর ভাল লাগে না। কিন্তু উনি যে সমাজে আছেন, সেখানে সংসার যদি ভাল না লাগে, তার জন্য সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসার কোন উপায় নেই। শুনে আমার খারাপ লাগল। আমাদের ভারতবর্ষে এখনও অনেক উপায় আছে, সংসার যার ভাল লাগে না, সে ইচ্ছে করলে কাশী, হরিদ্বার, বৃন্দাবনে চলে যেতে পারে। কিন্তু অন্যান্য দেশে বা সমাজে সেই ব্যবস্থাটা নেই। সেখানে আপনি আলাদা হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু ভারতের মত সাধুসমাজ সেখানে পাওয়া যাবে না, এটা একটা বিরাট সমস্যা। তার মানে, নিশ্চয় সেই বেচারী এর আগের আগের জন্মে সাধক ছিল, বিষ্ঠাকুড়ে গিয়ে পড়েছে। তিনি আমাকে যা কিছু বলছেন, তাঁর স্ত্রীর সামনেই বলছেন। স্ত্রীকে খুব ভালও বাসেন, সবই ঠিক আছে, কিন্তু বলছেন, সংসার ভাল লাগে না। আমার নিজের তরফেও ওনার জন্য কিছু করার নেই, কিই বা করতে পারি সেখানে।

তিনি কারুকে বেশি শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন। কোনখানে একটা প্রদীপ জ্বলছে, কোনখানে একটা মশাল জ্বলছে। বিদ্যাসাগরের এক কথায় তাকে চিনেছি, কতদূর বুদ্ধির দৌড়! যখন বললুম শক্তিবিশেষ, তখন বিদ্যাসাগর বললে, তবে কি তিনি কারুকে বেশি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? আমরা আগে আগে এই বিষয়টা আলোচনা করেছি। ঈশ্বরের মধ্যে কোন বৈষম্য দোষ নেই। কিন্তু কারুর ভিতরের শক্তির প্রকাশ বেশি, কারুর ভিতরে শক্তির প্রকাশ কম, এটাকে অস্বীকার করা যাবে না। যিনি রাজা তাঁর কথায় এত লোক ওঠে বসে, আমাদের কথা কে শোনে, কে মানে। শক্তির তো তফাৎ আছেই। এই শক্তির তফাৎ কে করলেন? ঠাকুর ও ঠাকুরের সমস্ত কিছু ঈশ্বরকে নিয়ে, তিনিও তাই বলছেন –এই তফাৎ ঈশ্বরই করেছেন। কিন্তু এই তফাৎটা যখন এসে গেছে, এটা এসেছে নিজের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে। নিজে যেমন চেষ্টা চালিয়েছেন সেই অনুসারে এই তফাৎ এসেছে।

আমি অমনি বললুম, তা দিয়েছেন বইকি। শক্তি কম বেশি না হলে তোমার নাম এত হবে কেন? তোমার বিদ্যা, তোমার দয়া –এই সব শুনে তো আমরা এসেছি। তোমার তো দুটো শিং বেরোয় নাই। বিদ্যাসাগরের এত বিদ্যা, এত নাম, কিন্তু এমন কাঁচা কথা বলে ফেললে, 'তিনি কি কারুকে বেশি শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন'? কি জান, জালে প্রথম প্রথম বড় বড় মাছ পড়ে –রুই, কাতলা। তারপর জেলেরা পাঁকটা পা দিয়ে ঘেঁটে দেয়, তখন চুনোপুঁটি, পাঁকাল এই সব মাছ বেরোয় –একটু দেখতে দেখতে ধরা পড়ে। চুনোপুঁটি, পাঁকাল এই মাছগুলো জাল দিয়ে ধরা যায় না, এগুলোর জন্য পাঁক ঘাটতে হয়।

ঈশ্বরকে না জানলে ক্রমশঃ ভিতরের চুনোপুঁটি বেরিয়ে পড়ে। শুধু পণ্ডিত হলে কি হবে। এটা একটা অত্যন্ত দামী কথা। দেখবেন আমার, আপনার, এনার, ওনার অনেকেরই যে পাণ্ডিত্য রয়েছে,

এতে কোন সন্দেহ নেই। ফরর ফরর করে শ্লোক বলছে, খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছে। কিন্তু একবার ঘাঁটতে শুরু করার পর আরও যখন ঘাঁটতে শুরু করবেন তখন ভিতর থেকে সব চুনোপুঁটি বেরোতে শুরু হয়ে যাবে। চুনোপুঁটি যখন বেরোতে শুরু হয়, তখন বোঝা যায় আসলটা কি। খাঁটি সোনা যদি হয়, খাঁটি সোনাকে আপনি ছেঁদা করতে থাকুন, ওখান থেকে যেটা বেরোবে খাঁটি সোনাই বেরোবে। ঠাকুরকে ভাবুন, ঠাকুরের ভিতরে যত ঢুকবেন, যত নাড়াবেন একটাই জিনিস পাবেন, শুধু সোনা। যাদের শুধু পাণ্ডিত্য আছে, ভিতরে ভাব নেই; আমাদের কাছে এরকম অনেকে আসেন, কথাবার্তা বলেন; একটু যদি সংসারের কথাতে নামলেন, তখন দেখবেন যে এরা কত ঘোর বিষয়ী, এদিকে মুখে বড় বড় ধর্মের কথা। আমার এক বন্ধু মজা করে বলেন, যখন লেকচার দেবেন তখন দেখবেন লোকেদের মধ্যে যেন ত্যাগের ভাব জন্মায়। মন্দিরে গিয়ে দেখি, লোকেরা মন্দিরে আসছে, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছে, সেই প্রার্থনার মধ্যেও খালি সেই সন্তান, সেই টাকা চাওয়া।

অনেক আগে যখন আমার বয়স কম ছিল, তখন আমার কাছে লোকেরা এসে সাংসারিক কথা বললে অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম। বলতাম, 'আপনাদের কি বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে, সন্ন্যাসীর কাছে এই ধরণের কথা বলছেন'? এখন বয়স হয়ে গেছে, ধৈর্যের শক্তিটা একটু বেড়েছে, সেইজন্য এখন আর রুষ্ট না হয়ে চুপচাপ শুনে যাই। লোকেদের এতটুকু এই বোধ নেই যে, সাধু-সন্ন্যাসীর সামনে, এমনকি ঠাকুরের সামনেও সাংসারিক কথা, কাম-ক্রোধ-লোভের কথা বলতে নেই। কোন কারণে আপনার পরিবার যদি অভাবে পড়ে যায়, পরিস্থিতির জন্য যদি কারুর বাড়ি গিয়ে অন্ন চাইতে হয়, সেটা কত লজ্জার কথা হবে ভাবা যায়! একজন ভদ্রলোককে জানতাম, তিনি খুব নামকরা আইএএস অফিসার। কোন কারণে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না, দিনরাত ঝগড়া, চেঁচামেচি করে। স্ত্রী সন্তানদের জন্য রান্নাটুকুও করে না। বেচারী ভদ্রলোক মাথা নীচু করে পাশের বাড়ি থেকে ছেলের জন্য একটু সবজী চেয়ে আনতেন। তিনি নিজে আমাকে বলছিলেন, শুনে আমার মাথাটাই নীচু হয়ে গেল। ঠাকুর আপন, ঠাকুর নিজের লোক, তাঁর কাছে সব কিছু চাওয়া যায়; এগুলো সব মুখের কথা। একদম না, খুবই লজ্জার কথা। ঠাকুর কি জানেন না আপনার কিসের প্রয়োজন, তিনি তো অন্তর্যামী আপনার কিসের অভাব সব জানেন। কেন নিজেকে ছোট করবেন? শ্রীশ্রীমাও বলছেন, হাত পেতেছ কি মাথা বেঁচেছ। যে কোন জিনিসের জন্য কারুর কাছে যদি হাত পাতেন; হে ঠাকুর আমার উপর তোমার কৃপাদৃষ্টি বর্ষিত হোক, এখানেও তো আপনি ভিক্ষাই চাইছেন। বিশেষ করে সংসারে কারুর কাছে যদি কোন কিছু চান, ভিক্ষাই তো চাইছেন। কত লজ্জার কথা।

বলছেন, চুনোপুঁটি বেরিয়ে আসে। ঠাকুরের কাছে যখন আমরা প্রার্থনা করছি, ঠাকুর আমার এই হোক, সেই হোক; তখন তো আমরা ভিক্ষাই চাইছি, এটা কি লজ্জার কথা না? ঠাকুরের কাছে কি চাওয়া যায়? চাওয়া যায় শুধু ত্যাগ, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি। কেন? কারণ ওটাই যে আপনার স্বরূপ। আপনি কিছু চাইছেন না, আপনি বলছেন, আমার ভিতর যে আবর্জনার পাহাড় জমে গেছে, এই আবর্জনা যেন চলে যায়। তার মানে, হে ঠাকুর, আমি যে তোমার সঙ্গে এক, এই বোধটাকে আমি পেতে চাই। কেউ কেউ এক আধবার আমাকে এই প্রশ্ন করেছিলেন, ওটাও তো কামনার মধ্যে পড়ে গেল। কি করে কামনার মধ্যে পড়ছে? কামনা তখন হয়, যখন সংসারকে নিয়ে সমাজকে নিয়ে, এই দেহকে নিয়ে, ইন্দ্রিয়কে নিয়ে কিছু চাওয়া হয়। এখানে আপনি বলছেন, ঠাকুর এগুলো যেন চলে গিয়ে আমার ভিতরটা পরিষ্কার হয়ে যায়। জ্ঞান, ভক্তি, ত্যাগ, বৈরাগ্য, এগুলো যখন চাইছেন, এগুলো চাওয়ার মধ্যে কি করে পড়বে? চাওয়াটা হয় শুধু সংসারকে নিয়ে, দেহকে নিয়ে। এখানে বলছেন, এগুলো চলে যাক। আমি যেটা আমি সেটা হতে চাইছি, ব্যস্ এইটুকু। সেখানে আপনার চাওয়ার অধিকার আছে। আপনার কাছ থেকে কেউ টাকা নিয়েছিল। সে বলেছে এবার আপনার টাকা সে ফেরত দেবে। এখানে চাওয়া-চায়ির ব্যাপার আসছে না।

ব্যাঙ্কে আপনি টাকা রেখেছেন, ওটা আপনার টাকা, আপনার অধিকার আছে সেই টাকা তোলার। আপনি ব্যাঙ্কে যাবেন, গিয়ে বলবেন, আমার ফিক্সড ডিপোজিট ম্যাচিওর করে গেছে, আমার টাকা আমাকে ফেরত দিন। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার যদি গাঁইগুই করে, আপনি কেস ঠুকে দিতে পারেন। এটা আমার অধিকার, আমার টাকা আমাকে ফেরত দিন। ত্যাগ, বৈরাগ্য আপনার অধিকার, জন্মসিদ্ধ অধিকার; মুক্তি আপনার জন্মসিদ্ধ অধিকার। কামনা-বাসনার ত্যাগ আপনার জন্মসিদ্ধ অধিকার; জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য আপনার জন্মসিদ্ধ অধিকার। আপনি বলবেন, হে ঠাকুর এটা আমার সম্পত্তি, আমার সম্পত্তি আমাকে ফেরত দিন। কি সম্পত্তি? আমার স্বরূপ। আগেকার দিনে বণ্ডেড লেবারারস ছিল, তাদের মধ্যে একটা চুক্তি থাকত। তুমি এত টাকা নিয়েছ, এর এত সুদ দিতে হবে, মোট এই টাকা জমা দিলে তুমি মুক্ত। ভাই আমি তোমাকে সমস্ত টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছি, আমাকে এবার মুক্ত কর।

তুলসীদাস খুব সুন্দর বলছেন, অবলোনা সানি আপনা নসিবোঁ, হে রাম! অনেকদিন আমাকে নাচালে, আর না; অনেকদিন আবদ্ধ করে রেখেছিলে, আর না। চুনোপুঁটিকে নাশ করা হল জীবনের উদ্দেশ্য। ঠাকুর কত সহজ ভাষায় ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে বলছে, এসব কথা শুনলে অনেক সময় হয়ত আপনারা ইমোশানাল হয়ে যাবেন; কিন্তু ইমোশানাল হওয়ার কিছু নেই। এখন ঠাকুর এত বড়, আমাদের কাছে ভগবান। কোন বাচ্চা ছেলে যদি বলে, আচ্ছা, ঠাকুর কি ক্রিকেট খেলতে পারতেন। আপনি বাচ্চা ছেলেটিকে কি করে বোঝাবেন যে, ক্রিকেট খেলা ঠাকুরের কাজ না, বোঝাতে গেলে বুঝতেও পারবে না। ঠাকুর কি ইংরাজী জানতেন? কি করে জানবেন, ওই কয়েকটা শব্দ জানতেন। ঠাকুর শাস্ত্র জানতেন? শাস্ত্র অধ্যয়ন করে জানেননি, প্রত্যক্ষ করে জানলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন, ঠিক আছে; তাই বলে যে তিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ হবেন, তা তো না।

কিন্তু এখানে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রধান না, প্রধান আমি, আপনি। চুনোপুঁটি কি? ভিতরে যে কামনা-বাসনা, ভিতরে যে উল্টোপাল্টা, অগোছাল চিন্তা-ভাবনা। অনেক সময় আমি দেখেছি, আমাদের ভক্তরা ঠাকুরের কথা নিয়ে এমন এমন কথা বলেন যে শুনে বিরক্ত লেগে যায়, আমি অসন্তুষ্ট হয়ে যাই। ঠাকুরের কথা, এটাকে আপনারা খেলো করছেন কেন? মহারাজ ঠাকুরের দুটো কথা বলুন। আরে, কথামৃত আপনি পড়েননি, ঠাকুরের কথা কি বলব? এগুলোই মূলতঃ ভিতরের চুনোপুঁটি। ভিতরে চুনোপুঁটি যদি নাশ না করেন, যাঁরা সিরিয়াস লোক, যাঁরা ধর্মপথের মানুষ, তাঁরা বুঝে নেবেন যে আপনার অস্তিত্ব যেটা, এটা প্রচণ্ড খেলো। এখানেই এই অধ্যায়ের শেষ। পরের অধ্যায়ে দুদিন পরে ১৭ই জুনের কথা শুরু হয়।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে

আজ রবিবার, ১৭ই জুন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ (পৃঃ ২১৯)। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আছেন। ঠাকুর কথা শুরু করছেন আমাদের সেই প্রিয় বিষয়কে নিয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) —**সংসারে হবে না কেন? তবে বড় কঠিন**। প্রত্যেক জায়গায় বলবেন, হবে না কেন, কিন্তু বলেই বলবেন —তবে বড় কঠিন। **জনকাদি জ্ঞানলাভ করে সংসারে এসেছিলেন। তবুও ভয়**। এগুলো কথা-কাহিনী, কথা-কাহিনীর মাধ্যমে আমাদের কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষাটুকু নিতে হয়, কাহিনীকে অত দাম না দিলেও ক্ষতি নেই। বলছেন, **নিষ্কাম সংসারীরও ভয়। ভৈরবীকে দেখে জনক মুখ হেঁট করেছিল; স্ত্রীদর্শনে সঙ্কোচ হয়েছে**। এগুলো কাহিনী, রাজা জনকের আমরা যে কাহিনী পাই, উনি পরমহংস, ওনার আবার কিসের ভয়। **ভৈরবী বললে, জনক! তোমার দেখছি এখনও জ্ঞান হয় নাই; তোমার এখনও স্ত্রী-পুরুষ বোধ রয়েছে। কাজলের ঘরে যতই সেয়ানা হও না কেন, একটু না একটু কালো দাগ গায়ে লাগবে**।

সংসারে যাঁরাই আছেন, এই সংসারে বন্ধনে পড়ে যাওয়ার ভয় সবারই আছে। একমাত্র যিনি পরমহংস তাঁরই ভয় নেই। জনক রাজা একজন পরমহংস ছিলেন। কারণ তিনি সব কিছুর পারে। *তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্*, শুভ অশুভ যেমনটি আসার তেমনটি এলো, ঠিক আছে, এটাও ভাল ওটাও ভাল, বলে এগিয়ে চলে গেলেন। আমরা এভাবে নিতে পারিনা। পাপপূণ্য নিয়ে ঠাকুর পরে বলবেন, ওই জায়গাতে আমরা বিস্তারে বলব। পরমহংস যিনি সত্যিকারের আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি বা বস্তু যেমনটি তেমনটি দেখেন। সেখানে তিনি কোন কিছুতে জড়াবেন না। আপনি যত বড় পণ্ডিত হন, যত শাস্ত্র পড়ে থাকুন, আত্মজ্ঞান যদি না হয়ে থাকে, সংসারে থাকতে গেলে কোন না কোন বন্ধন আপনার হতে বাধ্য।

দেখেছি, সংসারীভক্ত যখন পূজা করছে গরদ পরে তখন বেশ ভাবটি। এমন কি জলযোগ পর্যন্ত এক ভাব। তারপর নিজ মূর্তি; আবার রজঃ তমঃ। মন্দিরে যখন আসছেন, তখন এক রকম; ভক্ত সম্মেলনে যখন যাচ্ছেন, তখন এক রকম থাকছেন। চারজন সত্যিকারের ভক্তসঙ্গে আছেন, সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আছেন, তখন এক রকম। এরপর যেমনি ওখান থেকে সরে এলেন, আবার যেই কে সেই। স্বাভাবিক, ছোট বাচ্চা পর্যন্ত যখন স্কুলে যায়, ম্যাডামের সামনে যখন থাকছে তখন এক রকম ব্যবহার। যেমনি স্কুল থেকে বেরিয়ে বন্ধুদের কাছে এলো, তারপর তার রূপটা দেখুন। আমরা যখন ধর্ম করি বা ভক্তি করছি তখন আমাদেরও তাই হয়।

সত্ত্বগুণে ভক্তি হয়। কিন্তু ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ, ভক্তির তমঃ আছে। ভক্তির সত্ত্ব, বিশুদ্ধ সত্ত্ব – এ-হলে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুতেই মন থাকে না; কেবল দেহটা যাতে রক্ষা হয় ওইটুকু শরীরের উপর মন থাকে।

প্রথম কথা হল, সত্ত্বগুণে ভক্তি হয়, সেই ভক্তি আবার তিন প্রকার। আসলে কি হয়, শুধু সত্ত্বগুণ তো থাকে না, সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ তিনটে কম-বেশি মিলিয়ে থাকে। ভক্তির আবার নিজস্ব সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ হয়। ভক্তির কখন সত্ত্ব হয়? একটা কথা বলি, এগুলোকে আপনারা ব্যক্তিগত ভাবে অন্যথা নেবেন না। আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, জন্মজন্মান্তর ধরে যখন একটু একটু করে বিভিন্ন পূণ্য সঞ্চিত হয়, তখন একটু সাধুসঙ্গ হয়, তখন একটু ধর্মকথা শুনতে ইচ্ছে হয়, এটা হল ভক্তি। কিন্তু ভক্তির উদয় হলেই যে তিনি শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবেন তা তো না, ভক্তির আবার সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ আছে। বেশির ভাগ ভক্ত ভক্তির তমঃ বা ভক্তির তমের তমঃ। ভক্তি লাভের জন্য কতটা খাটছে, সংসার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কতটা খাটছে, সেটা দিয়ে বোঝা যায়। যাদের সঙ্গে আছেন তাদের মত হয়ে গেলেন, তার মানে আপনার মধ্যে কিছু দোষ আছে। যখন আপনি ঠাকুরের মন্দিরে আছেন, তখন আপনার ভাব এক রকম। মন্দির থেকে বেরিয়ে আপনার ভাব আর-এক রকম। তার মানে গোলমাল আছে। বেশির ভাগ ভক্তকে দেখি, বক্তৃতা শুনছে তো শুনেই যাচ্ছে, আহা কি দারুন বলেন। মন্দিরে ঠাকুরের গান হচ্ছে, গান শুনে বলছে, আহা কি আনন্দ হল। কিসের আনন্দ, আসলে আপনি একটা তমোগুণী। আমার কথা না, ঠাকুরই বলছেন, ভক্তির তমঃ। যখন ভিতর থেকে সত্যিকারের চেষ্টা শুরু হয় তখন ভক্তির রজোগুণ আসে। এরপর যখন ঈশ্বর ছাড়া আর কোন কিছু চায় না, সব কিছু ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে, তখন এটাই হয়ে যায় ভক্তির সত্ত্ব। বলছেন, কেবল দেহটা যাতে রক্ষা হয় ওইটুকু শরীরের উপর মন থাকে। কারণ তাঁরা তো তখনও পরমহংস হয়ে যাননি।

পরমহংস তিনগুণের অতীত। তার ভিতর তিনগুণ আছে আবার নাই। এই টপিকটা অনেকবার এসেছে, আবারও আসবে। শরীর থাকলে তিনটে গুণ থাকবে, কিন্তু পরমহংসকে বন্ধনে রাখতে পারেনা। বালকের উদাহরণ দিচ্ছেন। **বালক, কোন গুণের বশ নয়। তাই ছোট ছোট ছেলেদের পরমহংস কাছে আসতে দেন, তাদের স্বভাব আরোপ করবে বলে**।

পরমহংস সঞ্চয় করতে পারে না। এটা সংসারীদের পক্ষে নয়, তাদের পরিবারদের জন্য সঞ্চয় করতে হয়।

পরমহংস সংসার করতে পারেন না, এটা সংসারীদের পক্ষে নয়। সংসারীরা যখন সন্ন্যাসীদের নকল করতে শুরু করে, তখন তাদের অনেক সমস্যা হয়ে যায়। আমরা অনেকবার বলেছি, আপনারা সংসারে আছেন, আপনাদের কর্ম করতে হবে, আপনার ও পরিবারের একটা সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সংসারে আছেন নিজের জন্য একটা উপলব্ধি করতে হয় যাতে মনে হয় একটা স্থিতি পেলাম, এবার সেখান থেকে উপরে উঠে যাওয়ার চেষ্টা। সংসারীদের পরিবারদের জন্য সঞ্চয় করতে হয়।

তান্ত্রিকভক্ত –পরমহংসের কি পাপ-পূণ্য বোধ থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ –কেশব সেন ওই কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। ঠাকুরের মনে আছে কে কবে কি জিজ্ঞাসা করেছিল, আর কাকে কি বলেছিলেন। **আমি বললাম, আরও বললে তোমার দল টল থাকবে না। কেশব বললে, তবে থাক মহাশয়**।

পাপ-পূণ্য কি জানো? পরমহংস অবস্থায় দেখে, তিনিই সুমতি দেন, তিনিই কুমতি দেন। তিতো মিঠে ফল কি নেই? কোন গাছে মিষ্ট ফল, কোন গাছে তিতো বা টক ফল। তিনি মিষ্ট আমগাছ করেছেন, আবার টক আমড়াগাছও করেছেন।

তান্ত্রিকভক্ত আবার পাহাড়ে গোলাপের ক্ষেত নিয়ে বললেন, তার জবাবে ঠাকুর বলছেন, **পরমহংস দেখে, এ-সব তাঁর মায়ার ঐশ্বর্য। সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্য। সব বড় দূরের কথা। সে অবস্থায় দল টল থাকে না**।

এখানে গুটি কতক খুব সহজ কথা বলি। পাপ-পূণ্য কি? আমাদের মনটা হল গ্রহণ-ধারণ; কোন কিছু গ্রহণ করার পর কিভাবে জিনিসটাকে ধরছি, কিভাবে আমরা জিনিসটাকে ধরে রাখছি বা ধরে রাখতে পারছি। যাদের ধরে নেওয়ার ক্ষমতা বিরাট, ধরের রাখার ক্ষমতা বিরাট, এদের আমরা বলি মেধাবী। বাচ্চা বয়স থেকে আমরা শুনে, দেখে, ঠকে কত কিছু অনুভব করেছি, কত কিছু শিখেছি। গুরুজনরা বলেছেন, মা-বাবা বলেছেন, স্কুলের শিক্ষকরা বলেছেন, বন্ধুরা বলেছেন, সব কথা শুনে শুনে আমাদের এক রকমের জ্ঞান তৈরী হয়ে আছে। তার সাথে কিছু কিছু জিনিসের অনুভূতি হয়েছে। যেমন বাচ্চাকে আগুন থেকে সাবধান করে বলা হয়, আগুনে হাত দেবে না। শুনে তার হয় না, কিন্তু একবার যদি আগুনে হাত লেগে যায়, জীবনের মত সে শিখে নেয় যে আগুনে হাত দিতে নেই। এই যে আপনার নানান রকমের অনুভব, তার সঙ্গে আপনি শুনে দেখে যেটা শিখেছেন; এই সমস্ত জিনিসকে মিলে একটা জিনিস তৈরী হয়, সেটাকে বলে বুদ্ধি। বুদ্ধি মনেরই একটা রূপ। এই বুদ্ধি দিয়েই আমাদের জীবন চলে। আমরা আমাদের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করি এটা পাপ, এটা পূণ্য।

তাহলে কি এটাই দাঁড়ায় যে, পাপ-পূণ্য হল পুরোপুরি মনের ব্যাপার? হ্যাঁ তাই। রসগোল্লা কি চকলেট একটা বাচ্চার কাছে খুব প্রিয় বস্তু, কিন্তু যার বয়স হয়েছে, যার ডায়বেটিস আছে তার কাছে দুটোই বিষতুল্য। কিছু কিছু ধর্মে বলে, মৃত্যুর পর যে স্বর্গে যাবে, সেই স্বর্গ হল land of milk and honey। একজন নিরাশাবাদী মৃত্যুর পর স্বর্গে গেল, সে সেখানে দুধ আর মধু দেখল না, দেখল ক্যালরি আর কোলোস্টরাল। যে স্বর্গকে একজন দুধ আর মধুর দেশ দেখছে, সেই স্বর্গকেই আর-একজন দেখছে ক্যালরি আর কোলোস্টরাল। এই বিচারটা কে করে? মন করে। বস্তু বস্তু, ব্যক্তি ব্যক্তি, নারী শরীর নারী শরীর, এই জিনিসটাকে দেখা ও বোঝা পরমহংস আর সাধারণ মানুষের দেখা ও বোঝা সব সময় ভিন্ন হবে। পরমহংস যখন নারী শরীর দেখবেন, ওখানেই সব শেষ; কামী পুরুষ যখন দেখবে, তখন সে নারী শরীরকে ভোগের জিনিস রূপেই দেখবে।

আমি তখন অদ্বৈত আশ্রমে ছিলাম। সেই সময় কলকাতায় বইমেলা চলছিল। অদ্বৈত আশ্রম থেকে সেখানে একটা স্টল দেওয়া হয়েছে। বড় বড় নেতাদের যারা চামচে হয়, এরা প্রত্যেক স্টলে গিয়ে খালি একটাই কথা বলবে –'আচ্ছা আপনাদের এখানে ফ্রীতে কি কি দিচ্ছেন? ডাইরি, ক্যালেণ্ডার দিলে আমাকেও দিন'। আমরা হাতজোড় করে বলে দিলাম, 'আমরা কিছুই দিচ্ছি না'। 'কিছুই দিচ্ছেন না'? এটা আমাদের একটা বিরাট বড় সমস্যা। যে লোভী পুরুষ সে সমস্ত কিছুতে লোভের জিনিস দেখে; কামী পুরুষ সমস্ত কিছুতে কামের জিনিস দেখে। বাচ্চা সমস্ত কিছুতে খেলার জিনিস দেখতে চায়। একমাত্র যিনি পরমহংস তিনি বস্তুকে বস্তু রূপে দেখেন, ব্যক্তিকে ব্যক্তি রূপে দেখেন। ফলে কি হয়, পরমহংসের মনে কোন ধরণের চাঞ্চল্য আসে না।

এই যে নিজের আমিত্বটাকে বাইরে এনে সেই আমিত্ব দিয়ে ভাল লাগা বস্তুকে বা ব্যক্তিকে ঘিরে ফেলে, তারপর সেটাকে চাটতে থাকা। আমরা ভালবাসি কাকে? যেখানে আমার মন বসছে। ভালবাসা মানে? ভাল যেখানে বাসা বেঁধেছে। আপনি নিজে নিজের থেকে বেরিয়ে এসে তাকে ঘিরে নিয়ে এরপর তাকে চাটতে শুরু করলেন। কিন্তু যে আপনাকে এ-রকম করে নিজেকে ঘিরে দিতে দিচ্ছে না, সেখানে চাটাচাটি হবে না। তখন আমরা নানা রকম কথা বলি। যিনি পরমহংস তিনি বলবেন, 'এগুলো সমস্ত কিছু হল মিথ্যা', বা বলবেন, 'ঈশ্বরই সব সৃষ্টি করেছেন, আমি এর কোন কিছুতে নেই'। তখন কার্য থাকে না, কাজ করা থাকে না, দায়ীত্ববোধ থাকে না; দল করতে হবে, এই করতে হবে, সেই করতে হবে; এসব কোন কিছুই থাকে না। আমাদের জন্য কি? এই যে পরমহংসের ভাব – বস্তু বস্তু, ব্যক্তি ব্যক্তি; এখানে আমিত্বটাকে জড়িয়ে সেটাকে ধরে নিজের কাছে নিয়ে আসা, এটা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা, এটাই জীবনের করণীয়।

তান্ত্রিকভক্ত –তবে কর্মফল আছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ –তাও আছে। ভাল কর্ম করলে সুফল, মন্দ কর্ম করলে কুফল, লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে না? এ-সব তাঁর লীলা-খেলা।

আগেও আমরা পাপ-পূণ্য নিয়ে বিস্তারে আলোচনা করেছি। কিছু ধর্ম তাদের ধর্মগ্রন্থকে মেনে চলেন। তাদের ধর্মগ্রন্থ যেটা বলেছে সেটা ঠিক, যেটা ভুল বলেছে সেটা ভুল। হিন্দুদের এভাবে হয় না। হিন্দুদের অনেক শাস্ত্র, বিভিন্ন শাস্ত্র বিভিন্ন ভাবে বলেছেন। সেইজন্য মহাভারতে খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা আছে –মহাজন অর্থাৎ মহাপুরুষরা যে পথে গেছেন, যিনি যাঁকে মহাজন মনে করেন, তাঁর জন্য ওনার আচরণটাই ঠিক। খুব সংক্ষেপে সহজ কথা হল –মানুষ যখন স্বার্থপর হয়, যখন আত্মকেন্দ্রিক হয়, নিজের ছাড়া আর কিছু বোঝে না; এটাই পাপ। এগুলোই আমাদের পাপের দিকে নিয়ে যায়, সংসারের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ যখন নিঃস্বার্থ হয়, সবাইকে যখন মানুষ নিজের মধ্যে নিয়ে নিতে চায়; এটাই পূণ্য। এগুলো আমরা আগে আগে আলোচনা করেছি, আবারও সুযোগ পেলে করা হবে।

এই যে ঠাকুর বলছেন –পরমহংস দেখে, এ-সব মায়ার ঐশ্বর্য; খুব সুন্দর এবং অত্যন্ত দামী কথা। মনের জগৎ মায়ার জগৎ। দেশ, কাল, কারণ এগুলো সব মায়ার জগতের জিনিস, মনের জগতের। যিনি মনের পারে চলে গেছেন, আত্মার সঙ্গে এক হয়ে গেছেন, তাঁরা দেখেন এগুলো সব বাচ্চাদের খেলা, মনের সাম্রাজ্যের খেলা, কিছুই না এগুলো। ছোটরা যেমন সব কিছুকে আলাদা আলাদা করে দেখে, বড়রা সেভাবে দেখেন না। ঠিক তেমনি যিনি আত্মজ্ঞানী তিনিও আলাদা করে দেখেন না।

ঠাকুর বললেন, সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্য। সব বড় দূরের কথা। সে অবস্থায় দল টল থাকে না। যাঁরা মন দিয়ে শুনছেন তাঁদের বলি, গীতাতে, উপনিষদে যে কথাগুলি রয়েছে, তার বেশির ভাগই ধারণা করা খুব কঠিন। খুব উচ্চমানের সাধুসঙ্গ করা যদি না থাকে, খুব ভাল সাধন-ভজন যদি না থাকে, গীতা-উপনিষদ ধারণা করা যায় না, উল্টে অনেক ভুলভাল ধারণা হয়ে যায়। ঠাকুরও তাই

বলছেন, সব বড় দূরের কথা। সাধারণ মানুষের জন্য এগুলো সব আছে, এগুলো নিয়ে কথা বলতে নেই। বলছেন, সে অবস্থায় দল টল কিছুই থাকে না।

তান্ত্রিকভক্ত কর্মফল নিয়ে প্রশ্ন করাতে ঠাকুর বলছেন, কর্মফল আছে। কর্মবাদ হিন্দুদের অবদান। অন্যান্য ধর্ম যেমন পাপ-পূণ্যকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, হিন্দু ধর্মে কিন্তু সেরকম কিছু বাড়াবাড়ি নেই। কিন্তু হিন্দুরা কর্মের উপর খুব জোর দেয়। হিন্দুরা বলে, তুমি যেমন কর্ম করবে সেই কর্মের ফল কিছুটা সরাসরি তোমার সামনেই দেখতে পাবে, কিছু কর্ম মনের উপর সংস্কার রূপে ছাপ ফেলবে, যেটা পরে তোমাকে ধীরে ধীরে অন্য রকম করে দেবে। শুভকর্ম ভাল বানিয়ে দেবে, অশুভ কর্ম খারাপ বানিয়ে দেবে।

ভাল কর্ম করলে সুফল, মন্দ কর্ম করলে কুফল, লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে না? এ-সব তাঁর লীলা-খেলা। জীবনকে ব্যাখ্যার করার একটা বিধি হল কর্মফল। কর্মফলের সব কিছু যে একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক হবে, তা না; আর কর্মফল যে একান্ত ভাবে অপরিহার্য, তাও না। সমাজে যেমন সব সময় দেখা যায় যে, যারা দুষ্টলোক তাদের ভাল হতে দেখতে পাই। আমরা তখন ভাবি, এত বদমাইশ লোক, এত বদ লোক, তাও এদের কেন এত ভাল হচ্ছে? অনেক সময় বলি, পরের জন্ম নিশ্চয় খারাপ হবে, আবার অনেক সময় বলি, গতজন্মের কিছু সুকৃতি আছে তাই ভাল হচ্ছে। এগুলো কিছু না। স্বামীজী যেটা বলেছেন সেটাই ঠিক –যেরকম কর্ম তুমি করবে তোমার মনে সেই রকম ছাপ পড়বে। মনে যখন ছাপ পড়ে তখন সেই কর্ম করার প্রবৃত্তি আরও বেড়ে যাবে। বাড়তে বাড়তে একটা সময় এমন হয় যে, এরপর সে বেচারা এমন জায়গায় গিয়ে ফাঁসবে, তখন আর বাঁচার কোন উপায় পাবে না। কর্মফল এভাবেই কাজ করে। কিন্তু আপনি আমাকে কষ্ট দিলেন ফলে আপনকেও একটা সময় কষ্ট পেতে হবে, না, জিনিসটা এভাবে হয় না। আমরা বলি ঠিকই, কিন্তু সব ক্ষেত্রে একই জিনিস হয় না। যেটা হয় তা হল, মনে সংস্কার রূপে একটা ছাপ ছাড়ে, সংস্কারের ছাপ পড়বেই। যখনই আমরা কোন কাজ করি, যেমন পড়াশোনা করছি, পড়াশোনা করলে জ্ঞান হয়; সেটা হল মনের ভিতরের ব্যাপার আর পড়াশোনা করলে পরীক্ষা নম্বর পাওয়া যায়, সেটা হল কর্মফলের বহিঃপ্রকাশ। আপনি পরীক্ষায় নম্বর বেশি নাও পেতে পারেন, ক্লাশে টপার নাও হতে পারেন; কিন্তু যদি পড়াশোনা করে থাকেন জ্ঞান আপনার হবেই। ঠিক তেমনি কাজ করলে কাজের ভাল-মন্দ ফল আসতে পারে, নাও আসতে পারে। কিন্তু সংস্কার সে ছাপ ফেলবেই ফেলবে।

তান্ত্রিকভক্ত –আমাদের উপায় কি? কর্মের ফল তো আছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ –থাকলেই বা। তাঁর ভক্তের আলাদা কথা।

এই যে ঠাকুর বলছেন, তাঁর ভক্তের আলাদা কথা, এই কথাটা এত সুন্দর একটি কথা যে এর ভাবার্থের তল খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভক্তদের উপরে কর্মফলের বিধি খাটে না। যিনি ভক্ত তাঁর উপর কর্মফল খাটে না, এই কথা আপনারা অনেকে শুনে অবাক হবেন, অনেকের ভাল লাগবে, অনেকে হয়ত বিশ্বাস করবেন না। কেন? ধরুন একটা বাজে কাজ আপনি করছেন, কিন্তু আপনি যেহেতু ভক্ত, তার সঙ্গে আপনি ঠাকুরকেও মনে করছেন; সেটাও একটা কর্ম যেটা বাইরে দেখা যাচ্ছে না; ফলে কি হয়, কর্মফলের যে তোড় আসছিল, যেখানে বৃশ্চিক দংশন হওয়ার কথা, সেটা একটা মশক দংশনের উপর দিয়ে চলে যাবে। শ্রীশ্রীমাও বলছেন, যেখানে ফাল লাগার কথা, সেখানে একটা ছুঁচ হয়ে বিধবে। এটা কেন হবে? ঠাকুর কি পক্ষপাত করছেন? না, ঠাকুর কখন কোথাও কোন রকম পক্ষপাত করেন না।

গীতার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, যাঁরা জ্ঞানের পথ নিয়ে নিয়েছেন, জ্ঞানের পথ ভক্তির পথ একই; যাঁরা ধর্মপথে চলতে শুরু করেছেন, তাঁদের ভিতরে চেতনা জেগে যায়। চেতনা জেগে যাওয়ার জন্য তাঁরা কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল বুঝতে পারেন। তখন তাঁরা ভুল কাজ করতে চান না।

কিন্তু তাঁর স্বভাব এমন, তাঁর সংস্কার এমন যে, অনেক সময় ভুল কাজ করে বসেন। তখন কিন্তু ওই ভুল কাজ করে সে আনন্দ পায় না। আপনাদের মধ্যে যাঁরা ঠিক ঠিক ভক্ত, যাঁরা নিজেদের ভক্ত বলে মনে করেন; সংসারে থেকে তাঁদেরও অনেক সময় এমন কিছু কাজ করতে হয়, যেটা করে তাঁর ভাল লাগে না। তখন হয়ত কারুর সঙ্গে তাঁকে মিথ্যা কথা বলতে হয়। কিন্তু মন তাঁর সব সময় খুঁতখুঁত করবে, কিছু ভাল লাগবে না। কেন ভাল লাগছে না? কারণ তিনি ধর্মপথে চলে গেছেন। এখন এমন একটা সংস্কার আছে, তার সঙ্গে এমন একটা পরিস্থিতি, যেখানে তাঁর ব্যক্তিত্ব সেই রকম শক্তিশালী না যে, তিনি ওটাকে নিজে আটকাতে পারবেন। কিন্তু ওই কাজ করে আপনি আনন্দ পান না। আমি বাস্তবিক অনেককে দেখেছি যে, যারা মিথ্যা কথা বলে আনন্দ পায়, অপরকে বোকা বানিয়ে আনন্দ পায়। ইদানিং দেখবেন কত সাইবার ক্রাইম হচ্ছে, কত রকম ভাবে ফ্রড করে ব্যাঙ্কের টাকা তুলে নিচ্ছে। তারা ওই কাজ করে আনন্দ পাচ্ছে, ওঃ কি দারুণ, আজকে এত লক্ষ টাকা একজনের ব্যাঙ্ক থেকে হাফিস করে দিলাম, আজকে এত মারলাম, কাল এত মারলাম, আনন্দ করেই বলছে। আগেকার দিনে চোর-ডাকাতরাও এভাবেই লোকের সর্বস্ব হরণ করে আনন্দ করত।

কিন্তু পরিস্থিতি বশাৎ আপনাকে যদি সে-রকম কিছু করতে হয় –হয়ত একটা মিথ্যা কথা বলতে হল, একটু চালাকি করতে হল, আপনি লজ্জায় মরে যাবেন। এই যে পাপবোধ, আমি ভুল কাজ করেছি, আমি মিথ্যা কথা বলেছি, আমি কি করব প্রভু, আমি আর এগুলো নিতে পারছি না; সেইজন্য ভক্তের কর্মফল লাগে না, হাল্কা করে একটু লাগবে, কিন্তু ধীরে ধীরে ওটাও নাশ হয়ে যায়। আপনাদের আমি একশ ভাগ সত্য বলছি –আপনার মনে যদি কোন দুর্বলতা থাকে, যে কোন দুর্বলতা, কামিনী-কাঞ্চন, নামযশ যেটাকে নিয়েই থাকুক। আপনি রোজ সকালে উঠে ঠাকুরের কাছে নিষ্ঠাপূর্বক বলুন, হে ঠাকুর, আমার এই দোষটা শুধরে দাও, এটা যেন চলে যায়; দেখবেন কিছু দিনের মধ্যে আপনার দোষটা চলে গেছে। আপনি নিষ্ঠাপূর্বক বলুন, হে ঠাকুর, সকালে উঠে আমার জপধ্যান হয় না। একটা কিছু করে দাও প্রভু। নিষ্ঠার সঙ্গে প্রার্থনা করে যান, এক বছর, দু বছর, তিন বছর; তারপর দেখবেন ধীরে ধীরে সকালে জপধ্যন করতে আপনার খুব ভাল লাগছে। এই যে পাপবোধের কথা বলা হয়, যদি কোথাও পাপবোধ থেকে থাকে, ঠাকুরের কাছে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রার্থনা করুন, দেখবেন আপনার মন থেকে পাপবোধটা কেটে যাচ্ছে।

কর্মের বিধানে কর্ম সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধন সৃষ্টি করে, ভক্তদের জন্য বন্ধন তৈরী করতে পারে না। সে ওই কাজ করতে চাইছে না, মন থেকে তার সায় দিচ্ছে না, কিন্তু কোন পরিস্থিতির জন্য তাকে করতে হচ্ছে। বন্ধন সেখানেই হয় যেখানে আপনি রস পাচ্ছেন। অনেক কথা-কাহিনীতে পাবেন যে, সে অমুক করল, তারজন্য অমুক ফল পেল; কিন্তু কথা-কাহিনী আবার অন্য রকমও আছে আবার চোখের সামনে আমরা অন্য রকম দেখছি; যারা চুরি-জোচ্চুরি করে বেড়াচ্ছে তারা দিব্যি বহাল তবিয়তে আছে। মহাভারতে এই প্রশ্ন অনেকবার এসেছে। শেষের দিকে দুর্যোধনের কি হল আর রাবণের কি হল? কিন্তু সবাইকে তো একদিন মরতেই হবে। দুর্যোধন ও রাবণও মারা গেল, কিন্তু সারা জীবন আনন্দ করেই তো মরল। সেইজন্য এগুলোর কোন উত্তর হয় না। উদ্দেশ্য এই সংসার থেকে বেরিয়ে আসা। ঠাকুরের প্রতি নিষ্ঠা থাকলে, ঠাকুরের প্রতি ভক্তি থাকলে, তখন পাপপূণ্য কোনটাই এসে আপনাকে বাঁধতে পারবে না।

ঠাকুর এবার গান করতে শুরু করেছেন –**মন রে কৃষি কাজ জান না**। কয়েকটা গান করে ঠাকুর আবার কথা বলছেন –**তাতে মগ্ন হলে আর অসদবুদ্ধি, পাপবুদ্ধি থাকে না**। এতক্ষণ আমরা যেটা ব্যাখ্যা করলাম, এই কথাতে ঠাকুর সেটাই বলছেন, পাপবুদ্ধি থাকে না। এমন কিছু দায়ে পড়ে, পরিস্থিতিতে আমাদের করতে হচ্ছে, কিন্তু বারবার এই বোধ হয় যে, হে প্রভু আমি এমন কাজ করতে চাইছি না। ঠিক তেমনি, যদি কেউ প্রার্থনা করে, হে ঠাকুর, এই পরিস্থিতি থেকে আমাকে বার করে আনো। এতে সময় একটু বেশি লাগে ঠিকই, কিন্তু তাও হয়ে যায়। কারণ ওখানে আর-একজনকেও পাল্টাতে হয়।

তান্ত্রিকভক্ত –আপনি যা বলেছেন "বিদ্যার আমি" থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ –বিদ্যার আমি, ভক্তের আমি, দাস আমি, ভাল আমি থাকে। বজ্জাত আমি চলে যায়। (হাস্য)

আমাদের সন্ন্যাসের সময় একজন খুব সিনিয়র মহারাজ আমাদের বারবার একটা কথা বলেছিলেন, দেখ, এই গেরুয়ার রংটা আগুনের রং, এই আগুন তোমাকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে। এই অগ্নি ত্যাগের বহ্নি, ত্যাগের এই বহ্নিশিখাকে সব সময় প্রজ্জ্বলিত করে রাখবে। ঠিক তেমনি, যাঁরা ভক্ত তাঁদেরকেও এই ত্যাগবহ্নিকে জ্বালিয়ে রাখতে হয় –আমি ভক্ত, সব কর্ম আমাকে নিষ্কাম ভাবে সম্পন্ন করতে হবে। আমার মনে কোন কামনা থাকবে না, আর আমাকে ধীরে ধীরে ত্যাগের দিকে এগোতে হবে। এই ভাবটাকে গৃহীভক্তদের জাগিয়ে রাখতে হয়, আর কোন কিছু লাগে না। এই যে ঠাকুর বলছেন বিদ্যর আমি, ভক্তের আমি; ভক্তের আমি কি জিনিস? আমার যত কাজকর্ম হবে সেখানে কোথাও আমার আমিত্বের ভাব থাকবে না। আমার এটা দায়ীত্ব, আমি এটা করব।

তান্ত্রিকভক্ত –আজ্ঞা, আমাদের অনেক সংশয় চলে গেল। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –আত্মার সাক্ষাৎকার হলে সব সন্দেহ ভঞ্জন হয়।

আপনি যত লেকচার শুনুন, যত শাস্ত্র পড়ুন; যতক্ষণ আত্মজ্ঞান না হয়, ততক্ষণ সন্দেহগুলো যায় না। লেকচার শুনে সব যদি পরিষ্কার হয় তাহলে বলবেন, বাঃ কি সুন্দর লেকচার, সব কেমন পরিষ্কার হয়ে গেল। পাঁচ মিনিট পর দেখবেন সেই সন্দেহগুলি আবার ফেরৎ চলে এসেছে। জ্ঞানের সাক্ষাৎ না হলে ঠিক ঠিক সন্দেহ ভঞ্জন হয় না। এখানে ব্যাপারটা খুব মজার। ঠাকুর তান্ত্রিকভক্তকে আত্মার সাক্ষাৎকারের কথা বলছেন, আর এরপরে দেখব ঠাকুর কিভাবে আনন্দে নৃত্য করছেন।

ভক্তির তমঃ আন। বল, কি! রাম বলেছি, কালী বলেছি, আমার আবার বন্ধন, আমার আবার কর্মফল! সেই কর্মফলের কথাই ঠাকুর আবার বলছেন, ভক্তের আবার কিসের কর্মফল! আমাদের ভিতর কত রকমের সংস্কার আছে, একটা পরিস্থিতি এসে গেল কিছু কর্ম করতে হল। ফাঁকা মাঠে দেখবেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম চারাগাছ গজায়। পরিস্থিতি যেমন অনুকূল হল, বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বড় হয়ে যায়। ঠিক তেমনি বাচ্চাদের ভিতর কামভাব থাকে না। যেমন যেমন সে বড় হয়, শরীরের বৃদ্ধি হয় আর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি জল দিচ্ছে, তাপ দিচ্ছে, কখন যে কামভাব এসে বাসা বাঁধে টেরও পাওয়া যায় না। এখন দেখতে হবে, ওটা কি আপনার খুব ভাল লাগে, না ওরকম করে আপনার মনে একটা গ্লানি বোধ হয়? যদি মনে গ্লানি আসে, তাহলে বুঝতে হবে, আর বেশি দেরী নেই ওই ভাবটা চলে যাবে। যদি মনে হয় ভাল লাগছে, তাহলে এখনও সময় লাগবে। তাই বলে ঠাকুরকে ছেড়ে দেবেন? না, ঠাকুরকে ধরে রাখতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে ওটাও ঠিক হয়ে যাবে।

আবার ঠাকুর বলছেন, **বিশ্বাস! বিশ্বাস! বিশ্বাস! গুরু বলে দিয়েছেন, রামই সব হয়ে রয়েছেন, 'ওহি রাম ঘট ঘট্‌মে লেটা'**। পওহারি বাবার গল্প বলছেন **–কুকুর রুটি খেয়ে যাচ্ছে। ভক্ত বলছে, 'রাম! দাঁড়াও, দাঁড়াও রুটিতে ঘি মেখে দিই' এমনি গুরুবাক্যে বিশ্বাস**। ঠাকুরই সব করাচ্ছেন, সহজে এই বিশ্বাস হয় না।

ঠাকুর বলছেন, **হাবাতেগুলোর বিশ্বাস হয় না! সর্বদাই সংশয়**। আমাদের সব মুখের কথা। মুখের কথা যখন হয়ে যায়, তখন কি সমস্যা হয়, দুদিক থেকে মার খায়। একদিকে বিশ্বাস এগোয় না, অন্য দিকে ঠাকুর বলছেন, নিজেকে ঠকায় পরকে ঠকায়। সেইজন্য মন, বুদ্ধি, বাক্য খুব পরিষ্কার রাখতে হয়। হাবাতেগুলোর সর্বদাই সংশয়; খালি প্রশ্ন করে যাবে। ধর্ম জিনিসটা অত সহজ না। তার

উপর আরও ভিতরে যখন ঢুকবেন, যেখানে অধ্যাত্ম আসে, সেটা আরও গভীর। **আত্মার সাক্ষাৎকার না হলে সব সংশয় যায় না**। আবার সেই একই কথা বলছেন। সংশয় আসবেই, সেইজন্য উপনিষদে বারবার বলছেন, আত্মার জ্ঞান হলে সমস্ত সংশয় চলে যায়, সমস্ত বন্ধন চলে যায় –*তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে*। তখন দেখেন সব কিছু তিনিই হয়ে রয়েছেন। এরপর আর কিসের ভাল, কিসের মন্দ।

শুদ্ধাভক্তি –কোন কামনা সংশয় থাকবে না, সেই ভক্তি দ্বারা তাঁকে শীঘ্র পাওয়া যায়। যখন ঠাকুরের জপধ্যান করা হয়, বা ঠাকুরের সামনে যখন বসছেন, ততটুকু সময় বলতে হয়, হে ঠাকুর শুদ্ধাভক্তি দাও।

অণিমাদি সিদ্ধি –এ-সব কামনা। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ভাই, অণিমাদি সিদ্ধাই, একটিও থাকলে ঈশ্বরলাভ হয় না, একটু শক্তি বাড়তে পারে। বর্তমান কালে আমাদের ভাষায় বলা যেতে পারে –টাকা-পয়সা, নামযশ এগুলো হলে ঈশ্বরের দিকে আর এগোন যায় না, খুব মুশকিল।

তান্ত্রিকভক্ত –আজ্ঞে, তান্ত্রিক ক্রিয়া আজকাল কেন ফলে না? ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –সর্বাঙ্গীন হয় না, আর ভক্তিপূর্বক হয় না –তাই ফলে না। আপনি তন্ত্রমতে যান, আপনি পুরাণ মতে যান, আপনি বেদ মতে যান, যে মতেই যান, নিষ্ঠা দরকার আর ভক্তি না হলে কোন জিনিসই ফল দেবে না। কত লোক হাজার হাজার জপ করছে, লক্ষ লক্ষ জপ করছে কিন্তু ফল দিচ্ছে না কেন? ভক্তি নেই। লেগে থাকতে থাকতে হয়ে যায়, সেইজন্য লেগে থাকাটা খুব দরকার।

এইবার ঠাকুর কথা সাঙ্গ করিতেছেন। বলিতেছেন, ভক্তিই সার, ঠিক ভক্তের কোন ভয় ভাবনা নাই। ভয়, ভাবনা তাঁর এই অর্থে হয় না; যখন তাঁর কোন সমস্যা হয়, তখন তিনি ওটাকে ঠাকুরের ইচ্ছা বলে মেনে নেন –এটা আমারই কোন পূর্বজন্মের ফল, তাই এই রকম হয়েছে। সেইজন্য কষ্টটা তিনি পান না। **মা সব জানে। বিড়াল ইঁদুরকে ধরে একরকম করে, কিন্তু নিজের ছানাকে আর-একরকম করে ধরে**। সংসারে যারা আছে মা তাদের এক রকম ভাবে চালান; কিন্তু যাঁরা মায়ের ভক্ত হয়ে গেছেন, ঈশ্বরের ভক্ত যাঁরা হয়ে গেছেন, তাঁদের আর-একরকম করে চালান। কথাগুলো মনে হবে যেন জ্ঞানমার্গের কথা, গীতার কথা। এখানেই আমরা এই অধ্যায়ের আলোচনার ইতি করছি।